বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন বসু রায় বি, এ,
শ্রীশ্যামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
এম, এ, সাহিত্য ভারতী

বুক কেবিন
পুস্তক বিক্রেতা
৪নং, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

নব জীবনের সঙ্কটপথে
হে তুমি অগ্রগামী,
তোমার যাত্রা সীমা মানিবে না
কোথাও যাবে না থামি।
শিখরে শিখরে কেতন তোমার
রেখে যাবে নব নব
দুর্গম মাঝে পথ করি দিবে
জীবনের ব্রত তব।

—রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

আজাদ-হিন্দ-ফৌজের কীর্ত্তি-কাহিনী প্রকাশিত হইবার সংগে সংগেই নেতাজীর সম্বন্ধে পুস্তক প্রকাশের হিড়িক পড়িয়া গেছে। অনেকেই নেতাজীর প্রতি জনসাধারণের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও নেতাজীর জীবন-কথা জানিবার জন্য তাহাদের আকুল আগ্রহের সুযোগ লইয়া স্বল্পতম পরিশ্রমেই এই শ্রেষ্ঠতম মহাপুরুষের জীবন-কাহিনী জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছেন। নব্য বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানের জীবন-কথা রচনায় বাঙ্গালী গ্রন্থকারদের এই মানসিক শৈথিল্য ও শ্রদ্ধার অভাব, বাজার দখলের জন্য প্রকাশক ও গ্রন্থকারদের এই অশোভন ক্ষিপ্রতা আমাদিগকে অত্যন্ত বেদনা দিয়াছে। নেতাজীর সম্বন্ধে এতাবৎ প্রকাশিত বহু পুস্তকই শিশু-সাহিত্যপদবাচ্য হইয়াছে ও প্রশস্তিবাচনমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ফলে, বাংলাভাষায় অদ্যাপি নেতাজীর পূর্বাপর চিন্তাধারা ও সাধনা-সম্বলিত একখানি নির্ভরযোগ্য পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিতের বিশেষ অভাব রহিয়াছে। এই বহু-অনুভূত অভাব পূরণের জন্য আমরা নেতাজীর জীবনী রচনায় প্রয়াসী হইয়াছি। নেতাজীর কর্মজীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন এমন কোন কৃতী সাহিত্যিক ও কর্মী এই কার্য্যের গুরু দায়িত্ব গ্রহণে অগ্রসর হইয়া আসিলেই প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করিব।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পুণ্য কীর্ত্তিকথা আজ আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র ভারতের পরম শ্রদ্ধা ও ধ্যানের সম্পদ হইয়াছে। তাঁহার বিমল যশোগাথায় সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত। ভারতের মুক্তিসাধনার সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তিনি বাঙ্গালীর আসন পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি অবাঙ্গালী ভারতবাসী, হিন্দু-মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ—

সকল জাতির সমরনায়কদের অকুণ্ঠ ও অপরিসীম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আনুগত্য-দর্শনে প্রত্যেক বাঙ্গালীই আজ গর্ব অনুভব করিতেছে। পরাধীন ভারতের মুক্তিপ্রচেষ্টায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র একাধারে গ্যারিবল্ডী, ওয়াশিংটন, লেনিন ও ডি, ভ্যালেরার স্থান অধিকার করিয়াছেন। এই বিশ্ব-বিশ্রুত-কীর্ত্তি মহামানব বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীকে বিশ্বজনসভায় অপূর্ব মহিমা ও প্রতিষ্ঠার আসন দান করিয়াছেন।

বিগত শতকে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে যে বিরাট জাগরণ ঘটিয়াছিল, জাতীয় জীবনের সর্বাবয়ব স্ফূর্ত্তি ও বিকাশের যে উৎসাহ ও উৎসবের সূচনা হইয়াছিল, যাহার ফলে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ মনীষী ও কর্ম্মবীরগণ ভারতীয় সংস্কৃতি ও চিন্তাধারায় অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র সেই জাগরণকালের বাঙ্গালী-প্রধানদের সাধনারই গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যবাহী শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী সন্তান। রাষ্ট্রীয় সাধনার ক্ষেত্রে বাঙ্গালী যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যোজ্জ্বল প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়া আসিয়াছে, নেতাজীর সাধনায়ও আমরা বাঙ্গালীর সেই স্বধর্মের পূর্ণ বিকাশই দেখিতে পাই।

সম্প্রতি কয়েক বৎসর যাবৎ এক ভয়াবহ জাতীয় দৌর্ব্বল্য বাঙ্গালীর জীবনে কৃষ্ণমেঘের সঞ্চার করিয়াছে। মহাজাতি গঠনের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে হইলে যে গণবুদ্ধি ও গণশক্তির অপরিহার্য্য প্রয়োজন বাঙ্গালীর জীবনে তাহার শোচনীয় অভাব দেখা গিয়াছে। বাঙ্গালীর চারিত্রিক দৃঢ়তা অপেক্ষা ভাবাবেগবিহ্বলতাই সমধিক—ইহারই ফলে বাঙ্গালী দীর্ঘকাল একাসনে কোন আদর্শের সাধনায় নিমগ্ন থাকিতে পারে নাই। বাঙ্গালী চরিত্রবলে ও কর্ম্মক্ষমতায় যেমন দুর্বল, মেধা ও মননশীলতায় তেমনই শক্তিমান—বাঙ্গালী কর্মজগতে যেমন অপটু, ভাবজগতে তেমনই কল্পনাকুশল। ইহারই ফলে বাঙ্গালী ব্যক্তিজীবনে ব্যক্তিত্বসাধনার ক্ষেত্রে

শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিলেও সমষ্টিজীবনে জাতীয়সাধনার ক্ষেত্রে তেমন সার্থকতা ও গৌরব অর্জ্জন করিতে পারে নাই।

এই দুর্গতির গাঢ় তমিস্রা ভেদ করিয়া নেতাজী জাতির সম্মুখে বিপুল আশা ও সম্ভাবনার আলোকবর্ত্তিকা হস্তে উপস্থিত হইয়াছেন। বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভ্রান্ত দৃষ্টি ও মৃত্যুঞ্জয় পৌরুষই সুভাষচন্দ্রকে বাঙ্গালী জাতির দেশনায়কের যোগ্যতা দান করিয়াছে। তাই বাঙ্গালীর জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে দেশনায়কের পদে বরণ করিয়া বলিয়াছেন—"নিজেদের মধ্যে দেখা দিয়েছে দুর্বলতা, বাইরে একত্র হয়েছে বিরুদ্ধশক্তি। আমাদের অর্থনীতিতে, কর্মনীতিতে, শ্রেয়োনীতিতে প্রকাশ পেয়েছে নানা ছিদ্র; আমাদের রাষ্ট্রনীতিতে হালে দাঁড়ে তালের মিল নেই। দুর্ভাগ্য যাদের বুদ্ধিকে অধিকার করে জীর্ণদেহে রোগের মতো, তাদের পেয়ে বসে ভেদবুদ্ধি……এই রকম দুঃসময়ে একান্তই চাই এমন আত্ম-প্রতিষ্ঠ শক্তিমান পুরুষের দক্ষিণ হস্ত, যিনি জয়যাত্রার পথে প্রতিকূল ভাগ্যকে তেজের সংগে উপেক্ষা কর্‌তে পারেন। সুভাষচন্দ্র, তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি…বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন। কর্ত্তব্যক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তার থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। তোমার এই চারিত্রশক্তিকেই বাঙ্গলাদেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর। নানা কারণে আত্মীয় ও পরের হাতে বাংলাদেশ যত কিছু সুযোগ থেকে বঞ্চিত, ভাগ্যের সেই বিড়ম্বনাকেই সে আপন পৌরুষের আকর্ষণে ভাগ্যের আশীর্ব্বাদে পরিণত করে তুলবে, এই চাই।……হিংস্র দুঃসময়ের পিঠের উপরে চড়েই বিভীষিকার পথ উত্তীর্ণ হোতে হবে। এই দুঃসাহসিক অভিযানে উৎসাহ দিতে পার্‌বে তুমি, এই আশা করে তোমাকে আমাদের যাত্রানেতার পদে আহ্বান করি।"

মহানায়কের যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা রবীন্দ্রনাথ অন্তর্দৃষ্টিবলে সুভাষচন্দ্রের সাধনায় দেখিতে পাইয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সেই আশা ব্যর্থ হয় নাই। নেতাজীর চারিত্রিক দৃঢ়তা, নৈতিকশুচিতা, সংগঠনপ্রতিভা ও শৃঙ্খলা-নৈপুণ্য আজাদ-হিন্দ-ফৌজ গঠন ও আজাদ-হিন্দ-গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠায় চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে।

এই পশুবৎ-নিগৃহীত, ধূলি-লুণ্ঠিত, আত্মচৈতন্যহীন ভারতীয় জনগণের সীমাহীন দুর্দ্দশাদর্শনে দেশপ্রেমের জীবন্তবিগ্রহ সুভাষচন্দ্রের হৃদয় গভীর মমতায় ও অপরিমেয় অনুকম্পায় আপ্লুত হইয়াছিল—সমগ্র জাতির মুক্তি-পিপাসা তাঁহার অন্তরতম চেতনাকে অধিকার করিয়া এক দুর্বার আকুলতার রূপ গ্রহণ করিয়াছে। মুক্তিসংগ্রামের নবজীবনযজ্ঞের উদ্গাতা নেতাজীর আহ্বানে তাই জাতিধর্মনির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিবিবর্জ্জিত হইয়া মুক্তিপতাকাতলে সমবেত হইয়াছিল।

আজ আমরা স্বাধীনতার তোরণদ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। দীর্ঘ দুইশত বৎসরের পরাধীনতার তমিস্রা সন্তরণ করিয়া স্বাধীনতাসূর্য্যের উদয়ালোকের অভ্রান্ত পদক্ষেপ আমরা শুনিতে পাইতেছি। জাতির এই নবজন্মক্ষণে মহামানব নেতাজী সুভাষচন্দ্রের তপঃশক্তি, সাধনা ও কর্মের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া বাঙ্গালী তাহার জাতীয়জীবনের, সমষ্টি-জীবনের সমস্ত আবিলতা ও দুর্বলতা দূর করিয়া মহাজাতিসৌধের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া গড়িয়া তুলিবে—সমস্ত বাঙ্গালীরই এই আকুল কামনা। "ভারতবর্ষের রাষ্ট্রমিলন-যজ্ঞে বাংলার সাধনা, আত্মাহুতি ষোড়শোপচারে সত্য হোক, ওজস্বী হোক, বাংলার আপন বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠুক"—রবীন্দ্রনাথের এই আকুতি বিফল হইবে না। তাই নেতাজীর পুনরাবির্ভাবের জন্য সমগ্র বাঙ্গালী অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

এই গ্রন্থরচনায় যে সব হিতৈষী বন্ধু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন এবং প্রয়োজনবোধে যে সকল গ্রন্থকর্ত্তা ও

প্রকাশকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি তাঁহাদের সকলকেই আজ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি।

এই গ্রন্থের মূল পরিকল্পনাটির জন্য আমরা বন্ধুবর শ্রীপ্রদ্যোৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট ঋণী। তিনি অযাচিতভাবে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাদিগের অশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

যে সকল গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের সাহায্য লওয়া হইয়াছে স্থানাভাব-বশতঃ তাহাদের সকলের নামের বিস্তৃত তালিকা দেওয়া সম্ভব হইল না। পরিশিষ্ট রচনায় বহুল পরিমাণে দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার সাহায্য লইয়াছি।

শ্রীহরিমঙ্গল মালাকার, শ্রীননীগোপাল মজুমদার ও শ্রীগৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রুফ্-দেখা ও অনুলিপির কাজে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও ছাপার ভুল রহিয়া গেছে।

বইটি সুখপাঠ্য ও তথ্যপূর্ণ করিতে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। আমাদের উদ্যম কতটা সার্থক হইয়াছে। সহৃদয় পাঠকবর্গ তাহা বিচার করিবেন।

বাঙ্গালার রাষ্ট্রীয় সাধনার মেরু-চূড়া সুভাষচন্দ্রের জীবন আলেখ্য-চিত্রণে নিরত থাকিয়া মহাপুরুষ-সঙ্গলাভে এতদিন নিজেদের ধন্য মনে করিয়াছি। আজ তাই গ্রন্থসমাপ্তি-মুহূর্তে মহাপুরুষের পবিত্র-সঙ্গ-বিচ্ছেদ-বেদনা অনুভব করিতেছি।

২১০।৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
জন্মাষ্টমী, ১৩৫৩।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রস্তাবনা

১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেস। কলিকাতাবাসী এরূপ দৃশ্য পূর্ব্বে কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। কংগ্রেস অধিবেশন সম্পর্কে এত উৎসাহ, এত উদ্দীপনা, এত সমারোহ আর কোনদিন হইয়াছে কিনা সন্দেহ। রাষ্ট্রপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলেন। ষ্টেশনের বাহিরে বিপুল জনতা—লক্ষ লক্ষ নরনারী, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই দেশ-নায়ককে সম্বর্দ্ধনা জানাইতে আসিয়াছে। রাষ্ট্রপতির শোভাযাত্রার জন্য রাজকীয় ব্যবস্থা হইয়াছে। বিংশতি অশ্ববাহিত শকটে সভাপতি অধিবেশন মণ্ডপের দিকে চলিলেন। অগণিত নর-নারী শোভাযাত্রার অনুগমন করিতেছে। এরূপ বিরাট শোভাযাত্রা কংগ্রেসের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব। শোভাযাত্রা কংগ্রেস মণ্ডপের দিকে চলিল। মণ্ডপের নিকট বিরাট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছে। বিশাল সভামণ্ডপে অধিবেশনের প্রতিনিধি এবং দর্শকদের বসিবার আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পণ্ডিত মতিলালকে লইয়া শোভাযাত্রা অধিবেশন মণ্ডপে উপস্থিত হইল। কিন্তু এই অপূর্ব্ব শোভাযাত্রাকেও যেন ম্লান করিয়া দিল পতাকা উত্তোলনের উৎসবে সামরিক কুচ-কাওয়াজ। কংগ্রেস অধিবেশন সম্পর্কে সহস্র সহস্র বাঙালী যুবক স্বেচ্ছাসেবকদলভুক্ত হইয়াছিলেন। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে অতি আড়ম্বরের সহিত নিখুঁতভাবে সামরিক কুচ-কাওয়াজ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। পণ্ডিত মতিলাল অগ্রসর হইয়া জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতেই আরম্ভ হইল অভিবাদন কুচ। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকগণ পতাকাকে অভিবাদন করিয়া 'মার্চ' করিয়া চলিয়াছে। পতাকার তলে কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি পরিয়া সামরিক কায়দায় অভিবাদনের ভঙ্গিতে

দাঁড়াইয়া। দক্ষিণ পার্শ্বে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন। সম্মুখে স্বেচ্ছাসেবকেরা 'মার্চ' করিয়া চলিয়াছে। সকলের পরিধানে খাকী খদ্দরের সামরিক পরিচ্ছদ—পায়ে সামরিক বুট। আকারে-প্রকারে, গঠন-প্রকরণে, শিক্ষায় ও সজ্জায়, কায়দায় ও ভঙ্গিতে সকলই পূর্ণাঙ্গ সামরিক বাহিনীর সমতুল্য। দলের পর দল নিখুঁত পদক্ষেপে চলিয়াছে। সমরবাদ্য তালে তালে বাজিতেছে। পদাতিক-বাহিনী চলিয়া গেল—অশ্বারোহী বাহিনী চলিল। অশ্বারোহী বাহিনীর পরে মোটর-সাইকেল বাহিনী চলিল। কোন পরাধীন দেশে জাতীয় পতাকাতলে এত বিরাট, এত নিখুঁত এবং অপূর্ব্ব সামরিক কুচ হইয়াছে কিনা সন্দেহ। আড়ম্বর, উদ্দীপনা ও সংগঠনে ইহা ভারতের ইতিহাসে অতুলনীয়।

সেইদিন পণ্ডিত মতিলালের বামপার্শ্বে দাঁড়াইয়া এক বলিষ্ঠদেহ, উন্নতকায় সৌম্যদর্শন যুবকও স্বেচ্ছাসেবকদের সামরিক অভিবাদন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই যুবক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক। এই অপূর্ব্ব শোভাযাত্রা, বিপুল সংগঠন, সামরিক শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার মূলে ছিল তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা, অদম্য উৎসাহ ও অদ্ভুত কর্ম্মক্ষমতা। এই যুবকের আপাদমস্তক সামরিক বেশভূষায় আচ্ছাদিত ছিল। তাঁহার সেদিনের সেই সমরনায়কের বেশ, তেজোব্যঞ্জক রূপ বাঙ্গালার তরুণের মানসপটে আপন গর্ব্ব-গৌরবে, আপনার মহিমায় আজিও অপরিম্লান ভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। হয়ত সেদিন সমর-শোভাযাত্রা পরিদর্শনকালে সেই যুবকের মানস-নয়নে এক অনুপম স্বপ্নচ্ছবি ভাসিয়া উঠিয়াছিল। হয়ত তিনি ভাবিতেছিলেন, একদিন আসিবে যেদিন এমনিভাবে জাতীয় পতাকাতলে সহস্র সহস্র ভারতবাসী মুক্তিফৌজ গঠন করিবে—আয়র্ল্যাণ্ডের মত ভারতেরও জাতীয় বাহিনী গড়িয়া উঠিবে। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মাহুতিদানের জন্য সকলে যোদ্ধবেশ ধারণ করিবে।

সেদিন কেহ ভাবে নাই যে এই যুবকের স্বপ্ন একদিন বাস্তবে মহনীয় রূপ পরিগ্রহ করিবে—তাঁহারই সংগঠনের যাদুমন্ত্রবলে চালিত হইয়া লক্ষ লক্ষ ভারতীয় তাঁহারই নেতৃত্বে স্বদেশের হৃত স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারকল্পে জাতীয় পতাকাতলে অস্ত্র ধারণ করিবে—সেদিন কংগ্রেসের অধিবেশন সংশ্লিষ্ট শোভাযাত্রা ও স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর আয়োজনে যে মহতী সম্ভাবনার অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল তাহাই একদিন পত্র-পুষ্প-সুশোভিত হইয়া মহা-মহীরুহে পরিণত হইবে। উত্তরকালে এই যুবক ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে সম্পূর্ণ এক অভিনব অধ্যায় রচনা করিয়াছেন। ইনিই আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্ব্বাধিনায়ক নেতাজী শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু। যে সংগঠনশক্তি আজ সমগ্র বিশ্বে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার অঙ্কুর আমরা দেখিতে পাই ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর গঠনে ও শোভাযাত্রায়। কলিকাতায় স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ ও শিক্ষাদানের কাজে তাঁহার যে সংগঠনশক্তি ও কর্ম্মক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, কালক্রমে তাহাই পূর্ণ বিকশিত হইয়া তাঁহাকে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সংগঠক-নেতা ও রণদক্ষ সর্ব্বাধিনায়ক করিয়া তুলিয়াছে। সেদিনের সমর শোভাযাত্রা অনেকেরই ঈর্ষ্যা ও বিদ্রূপের কারণ হইয়াছিল। অনেকেই তাঁহার প্রতি ব্যঙ্গ ও কটূক্তি করিতে ছাড়ে নাই। শত শত বৎসরের পরপদানত, শৃঙ্খলিত, নিরস্ত্র ও নিঃসহায়, মহাত্মা গান্ধীর অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত ভারতবাসী যে সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারে ইহা সেদিন স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

সেদিন সুভাষচন্দ্রের অন্তরে চিরজ্বলন্ত বহ্নির এই অভূতপূর্ব্ব প্রকাশকে ক্ষণস্থায়ী আলেয়ার দীপ্তি ভাবিয়া প্রবীণের দল অবিশ্বাস ও শ্লেষের হাসি হাসিয়াছিলেন। অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত কংগ্রেসের অধিবেশনে অনুষ্ঠিত এই রীতিমত সহিংস সামরিক কুচ-কাওয়াজকে ভাবালুতাপ্রসূত অবাস্তব

কল্পনা জ্ঞানে গান্ধীজীও সার্কাসের অভিনয়ের সহিত তুলনা করিতে তিলমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। বহুদিন পর্য্যন্ত যাহারা ব্যঙ্গভরে সুভাষচন্দ্রকে "জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং"এর সংক্ষেপিতরূপ 'গক' (G. O. C.) আখ্যায় আখ্যাত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারাও বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছেন। শৃঙ্খলিত ও পর-পদানত মাতৃভূমির বন্ধনমুক্তির অত্যুগ্র কামনাই এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে। সেদিন যাঁহারা উপেক্ষাভরে বক্রকটাক্ষ করিয়াছিলেন আজ সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁহাদের মস্তক আপনা হইতেই শ্রদ্ধানত হইয়া আসিবে। স্বদেশের মুখোজ্জ্বলকারী, সার্থকজন্মা বাঙলার এই বীর সন্তানের অপরিমেয় শৌর্য্য ও মনোবল, অভাবনীয় রণচাতুর্য্য ও সংগঠনশক্তি পশ্চিমের ধুরন্ধর সমর-নায়কদেরও ঈর্ষ্যার বস্তু হইয়াছে।

আজ সমগ্র বাঙলা তথা ভারতের অধিবাসী অন্তরের মণিকোঠায় পরমশ্রদ্ধাভরে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার ধ্যান করিতেছে। সুভাষচন্দ্রের অমরস্মৃতি ভারতবাসীর জপমালা হইয়াছে। এই বজ্রকঠোর ও কুসুমকোমল কর্ম্মবীরের পূত জীবন-কাহিনী জানিবার আকাঙ্ক্ষা সকলের হৃদয়েই অত্যুগ্র হইয়া উঠিয়াছে। দেশবাসীর এই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্যই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র

এক

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক মুক্তি সাধনার সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্রস্থল এই বাঙলাদেশ। যদিও বৃটিশরাজশক্তি সর্ব্বপ্রথম এই প্রদেশেই প্রতিষ্ঠিত হয় তথাপি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ হইতে ভারতবর্ষের মুক্তি সাধনার জন্য এই বাঙলাদেশই কঠিনতম সংগ্রাম ও দুঃখ বরণ করিয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষ যখন অন্ধকারযুগের অজগর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, মুক্তির বেগ তখন এই বাঙলাদেশকেই প্লাবিত করিয়াছিল। নবযুগের আহ্বানে সাড়া দিতে বাঙলাদেশ প্রথম হইতেই দ্বিধা করে নাই—তাই ভারতবর্ষে জাতীয়তার উন্মেষ সর্ব্বপ্রথম এই প্রদেশেই হয়। সেদিন বাঙলার দুঃখজয়ী বীর সন্তানেরা অসংখ্য বাধা বন্ধনের মুখে নির্ব্বিচারে ঝাঁপাইয়া পড়ে—তাহাদের কারাবরণ ও আত্মবলিদানেই ভারতবর্ষে মুক্তি আন্দোলনের দীপ অনির্ব্বাণ জ্বলিতে থাকে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত হইতেই যুগে যুগে সারা ভারত বাঙলার দিকে তাকাইয়াছে নূতন প্রেরণা ও নূতন নেতৃত্বের আশায়।

কেবল স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা ও অদম্য কর্ম্ম-প্রেরণা নহে, কেবল সহস্র সৈনিকের আত্মবলিদান নহে, বাঙলাদেশ ভারতবর্ষকে যাহা দিয়াছে তাহা আরও মহান ও গৌরবময়। বাঙলা ও বাঙালীর কাছে ভারতবর্ষ নবজাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছে। বাঙালীর মননশক্তি যুগসঞ্চিত সংস্কারের জড়তা ছিন্ন করিয়া নব নবোন্মেষের পথে প্রতিষ্ঠা

লাভ করিতে ছুটিয়াছে। ইউরোপের সংস্কৃতি সর্ব্বপ্রথম বাঙ্‌লাদেশেরই অন্তঃকরণে গভীর আলোড়ন আনে। বুদ্ধির সার্ব্বজনীনতা, দৃষ্টির ব্যাপকতা, বৃহত্তর জগত ও মানব সমাজের নবতর উন্নতি ও অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষণিকায় মানবধর্ম্মের উপলব্ধি সর্ব্বপ্রথম বাঙ্‌লাদেশেই ঘটে। মহামনীষী রাজা রামমোহন রায় ভারতের এই নবজাগরণের পথিকৃৎ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যজ্ঞেরও সর্ব্বপ্রথম পুরোহিত ভারতপথিক রামমোহন। রামমোহনের যুগ হইতে বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়া ভারতের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ প্রবল হইয়াই বিস্তারলাভ করিয়া চলিয়াছে। পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডার হইতে যুগোচিত শিক্ষা ও চিন্তাধারা আহরণ করিয়া রামমোহন ভারতবর্ষের সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থায় নূতন পরিবর্ত্তন সাধন করেন। তাঁহার নেতৃত্বে যে ব্রাহ্ম আন্দোলন গড়িয়া উঠে তাহার ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মতবাদ যাহাই হউক না কেন ভারতবাসীর আত্ম-জাগরণের সেই প্রথম স্ফুরণ, ভারতের রাজনৈতিক চেতনাবোধের উহাই সর্ব্বপ্রথম অভিব্যক্তি। ইহা আদৌ বিস্ময়কর নহে যে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রথম যুগের নেতৃবর্গের অধিকাংশই এই ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রভাবে বর্দ্ধিত।

রামমোহনের পরে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের উদ্‌গাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জাতির সম্মুখে স্পষ্টরূপে তুলিয়া ধরেন। বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম স্রষ্টা। ভারতের জাতীয় মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত এই মহাপুরুষের অক্ষয় অবদানের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

তখনকার যুগের কংগ্রেসী প্রবীণ নেতাদের আবেদন নিবেদনই ছিল জাতীয় আন্দোলনের মূল নীতি। বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা ও প্রচারের ফলেই সেযুগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক চিন্তাধারার মোড় ফিরিয়া যায়। তাঁহারা বুঝিল ভিক্ষানীতির দ্বারা দেশের মূল সমস্যার সমাধান হইতে

পারে না। দারিদ্র্য, অনশন, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, অত্যাচার ও লাঞ্ছনা যে পরাধীন জাতির নিত্য সহচর দেশবাসী তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিল। তাহারা বুঝিল দাসত্বের কলঙ্ক মুছিয়া না ফেলা পর্য্যন্ত জাতির ভাগ্যে সুখ ভোগ ঘটিতে পারে না। এই সময় বাঙলার বুকে এক তেজস্বী পুরুষের আবির্ভাব হয়। ইনি যুগাবতার স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ জাতিকে শিখাইলেন ত্যাগ ও সংগ্রামের সাধন মন্ত্র। শক্তি মন্ত্রের উপাসকের উদাত্ত কণ্ঠস্বর সারা ভারত প্রকম্পিত করিয়া ধ্বনিত হইল "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ, তোরা বীর হ', বীর হ', বল অভীঃ অভীঃ মাভৈঃ।" যে জাতি দাসত্ব শৃঙ্খলের ভার আপনার স্কন্ধে প্রতিনিয়ত অনুভব করিতেছে তাহার নিকট ত্যাগ ও শক্তির এই আহ্বান বিপুল জাগরণের সূত্রপাত করিল। দেশের যুব-সম্প্রদায় মাতৃভূমির মুক্তির জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া বিদেশী শাসকের অত্যাচার ও ফাঁসি কাঠকে উপেক্ষা করিয়া মরণ খেলায় মাতিয়া উঠিল। স্বামীজীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ভারতের সর্ব্বপ্রথম রাজনৈতিক আন্দোলন সুরু হইল বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদে। স্বামীজীর শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত শত সহস্র যুবক এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া মাতৃভূমির উদ্ধার কল্পে স্বাধীনতার সংগ্রামে সর্ব্বপ্রথম রক্তদান করিল।

পরবর্ত্তী অসহযোগ আন্দোলনে সর্ব্বত্যাগী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে বাঙলা মায়ের যে কয়জন সন্তান সাংসারিক সুখ-সম্ভোগ ও প্রতিপত্তির প্রলোভন ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট দেশ সেবার দীক্ষা গ্রহণ করেন সুভাষচন্দ্র তাহাদের অন্যতম। যাঁহাদের সাধনা ও মনাষা বলে যুগে যুগে বাঙালীর জীবন-যাত্রা ও সংস্কৃতি অপরূপ স্বকীয়তা অর্জ্জন করিয়াছে তাঁহাদেরই সাধনার নিরবচ্ছিন্ন ঐতিহ্য সুভাষচন্দ্রের মানসজীবন সমৃদ্ধ করিয়াছে—বাঙালীর সংস্কৃতি ও সাধনার ধারক ও বাহক সেই সব কর্ম্মবীর ও মনীষীদের সাধনার বরিষ্ঠ উত্তরসাধকরূপে সুভাষচন্দ্র তাঁহার জীবনে কর্ম্মপ্রতিভা ও মননশক্তির সার্থক সমন্বয় সাধন করিয়াছেন।

দুই

সুভাষচন্দ্রের পৈত্রিক নিবাস চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রামে। তাহার পিতা স্বর্গগত রায় জানকীনাথ বসু বাহাদুর শৈশবে ও যৌবনে নানা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া নিজের জীবনে উন্নতি সাধন—করেন। জানকীনাথ কটকের সরকারী উকিল ছিলেন। তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবি তৎকালে অল্পই ছিল। তিনি কটক 'বারের' নেতা ছিলেন। নিজের উদারতাগুণে কটকে তিনি অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেন ও সুদীর্ঘকাল কটক মিউনিসিপালিটি ও জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। সর্ব্বপ্রকার গণপ্রতিষ্ঠান ও সাধারণের কাজের সহিত তিনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মদক্ষতার পরিচয়ে সরকার তাঁহাকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। কিন্তু বিগত আইন অমান্য আন্দোলনে সরকার যে দমন-নীতি অবলম্বন করেন তাহার প্রতিবাদে তিনি অসঙ্কোচে রাজদত্তখেতাব পরিত্যাগ করিয়া দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন। যে দেশাত্মবোধ ও স্বাদেশিকতা সুভাষচন্দ্রকে বিশ্ববরেণ্য করিয়া তুলিয়াছে তাহা তিনি পিতা জানকীনাথের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্র যখন প্রথমবার কারাবরণ করেন তখন জানকীনাথ লিখিয়াছিলেন, সুভাষের জন্য আমরা গর্ব অনুভব করি (We are proud of Subhas !) জানকীনাথই সুভাষচন্দ্রকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। দেশবাসী তাঁহাকে চিরদিন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। সুভাষচন্দ্রের মাতা প্রভাবতী দেবীও একজন আদর্শ রমণী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় দানশীলা ও ধর্মপ্রাণা রমণী এ যুগে বিরল। তাঁহার ধর্ম্মভাব সুভাষচন্দ্রের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সহৃদয়, সরল ও অমায়িক স্বভাবের জন্য পারিবারিক জীবনে তিনি সকলের ভক্তি ও

শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। পিতার স্বাদেশিকতা ও তেজস্বিতা, মাতার ধর্ম্মপরায়ণতা ও পরদুঃখ কাতরতা সুভাষচন্দ্রের জীবন দেশপ্রেম ও ত্যাগ মাহাত্ম্যে অপূর্ব্ব মহিমামণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।

ইংরেজী ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী বাঙলা ১৩০৩ সালের ১১ই মাঘ শনিবার দিবা অনুমান ১২টা ১৫ মিনিটের সময় কটকে সুভাষচন্দ্রের জন্ম হয়। সুভাষচন্দ্র স্বর্গগত জানকী নাথ বসু মহাশয়ের ষষ্ঠ পুত্র। তাঁহার আট পুত্র ও ছয় কন্যার মধ্যে বর্ত্তমানে সাতজন পুত্র ও দুইটি মাত্র কন্যা জীবিত আছেন। জানকীনাথ সন্তানদের শিক্ষার জন্য প্রথম হইতেই বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই যথোপযুক্ত শিক্ষা পাইয়াছিলেন। ছেলেরা প্রথমে কটকে ইউরোপীয় স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন এবং পরে প্রায় সকলেই ইউরোপে গিয়া উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ব্যারিষ্টার এবং নেতা হিসাবে সকলেরই নিকট সুপরিচিত। দীর্ঘ কারাবাসের পর তিনি পুনরায় বাঙলার নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনিই বাঙলার একমাত্র অবিসংবাদী নেতা। ভাইদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র বসুই সুভাষচন্দ্রকে সমধিক ভালবাসিতেন। পরবর্ত্তী জীবনে কংগ্রেস-দলপতিদের সহিত অনিবার্য্য কারণে সুভাষচন্দ্রের যখন বিরোধ উপস্থিত হয় তখন শরৎ বাবুই সুভাষচন্দ্রের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু ও ডাঃ সুনীল চন্দ্র বসুর নামও অনেকেই জানেন। সুভাষচন্দ্রের অনুজ শৈলেশচন্দ্র গত অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাবরণ করেন। সুভাষচন্দ্রের সহিত তাঁহার আকৃতির আশ্চর্য্য সাদৃশ্য বিদ্যমান। এই সাদৃশ্য হেতু তাঁহাকে পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে।

তিন

১৯০৫ সালে যখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলিতেছিল সুভাষচন্দ্র তখন আটবৎরের বালক—কটকের প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ইউরোপীয়ান ইস্কুলের ছাত্র। বারবৎসর বয়স পর্য্যন্ত সুভাষচন্দ্র এই স্কুলেই শিক্ষালাভ করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি 'র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট' স্কুলে ভর্ত্তি হন। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে তিনি তাঁহার শ্রেণীতে সর্ব্বদা প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। এইজন্য তিনি শিক্ষকগণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সচ্চরিত্র ও মেধাবী ছাত্র বিদ্যালয়ের গৌরব স্বরূপ। বাল্যকাল হইতেই সুভাষ চিন্তাশীল ও মেধাবী ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী তাঁহার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। বালক সুভাষ বিবেকানন্দের আদর্শ চরিত্র অনুকরণ করিবার চেষ্টা করেন ও বিবেকানন্দের দরিদ্রনারায়ন সেবাকে নিজের জীবনের আদর্শ করিয়া লইবার সঙ্কল্প করেন। ধনীর ছেলে হইয়াও তিনি অত্যধিক ধর্ম্মপ্রবণ হইয়া পড়েন ও ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। কৈশোরের এই সঙ্কল্প ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা আজিও সম্পূর্ণ অটুট রহিয়াছে। তাঁহার চরিত্র, মনোবল ও ত্যাগ দেশবাসীর নিকট অত্যুজ্জ্বল আদর্শ হিসাবে বর্ত্তমান।

জোসেফ ষ্ট্যালিনের ন্যায় সুভাষচন্দ্রের বাল্যকালও ধর্মচর্চার পরিবেশের মধ্যে অতিবাহিত হয়। সুভাষচন্দ্র যখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়েন শ্রীযুক্ত বেনীমাধব দাস মহাশয় তখন ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়া আসেন। বেনীবাবুর আদর্শ চরিত্র দেবচরিত্র সুভাষকে অত্যন্ত মুগ্ধ করে। বেনীবাবুর চেষ্টাতেই তাঁহার ছাত্র শ্রীহেমন্তকুমার সরকারের সহিত সুভাষের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। এই সময় হইতে সুভাষের চরিত্রের অদ্ভুত বিকাশ হইতে থাকে। ইতিপূর্ব্বে সুভাষচন্দ্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ও স্বামীবিবেকানন্দের

গ্রন্থরাজি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পড়িতেন—ধ্যানধারণাও অভ্যাস করিতেন এবং অবসর সময়ে ধর্ম্মপ্রাণা জননীর সহিত ধর্ম্মবিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, এই ভাবেই তাঁহার অধিকাংশ সময় কাটিত। কিন্তু এখন যেন তাঁহার মনের সমস্ত বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। পরীক্ষার পড়ায় এখন আর মন বসে না। দরিদ্রনারায়নের সেবা, পীড়িতের শুশ্রূষা ও দীনদুঃখীর অভাব মোচন করিতেই সুভাষচন্দ্রের সময় কাটিতে লাগিল। তৎসত্ত্বেও ১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন—ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় সুভাষচন্দ্র কিরূপ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরেজী রচনা তিনি এত ভাল লিখিয়াছিলেন যে পরীক্ষক নিজেও অত ভাল লিখিতে পারিতেন না বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন।

এই বৎসরই সুভাষচন্দ্র সংস্কৃত, গণিত ও লজিক লইয়া কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে আই, এ ক্লাসে ভর্ত্তি হন। কলেজে পড়ার সময় সুভাষ ভবানীপুরে এলগিন রোডের বাড়ীতে থাকিতেন। ছেলেদের জন্য জানকীবাবুই এই বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দেন। এই সময় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি সপরিবারে পুরীতে বাস করিতেন। কলেজ জীবন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার একদলবন্ধু রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের উপদেশানুযায়ী নিজেদের জীবন গঠন করিবার সঙ্কল্প করেন। সুভাষচন্দ্র যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন সেই সময় ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জী ৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ মেডিক্যাল মেসে একটি দল গঠন করেন। ডাঃ ব্যানার্জ্জী তখন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন। কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া দেশের সেবা ও ধর্ম্মজীবন যাপন করাই এই দলের উদ্দেশ্য ছিল। বহু মেধাবী ছাত্র এই দলে যোগদান করিয়াছিলেন। এইখানেই ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও নৃপেন্দ্র নাথ বসুর সহিত সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা হয়। এই সময় ধর্ম্মভাবই সুভাষচন্দ্রের মনে

অধিকতর প্রবল ছিল। ধর্ম্মভাবাপন্ন কতিপয় ছাত্রের সান্নিধ্যে ইহা আরও বৃদ্ধি পায়। সন্ন্যাস গ্রহণের তীব্র ইচ্ছা সুভাষচন্দ্রের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। অবশেষে ধর্ম্ম জীবন যাপনের বাসনা তাঁহাকে এরূপ অভিভূত করে যে হঠাৎ একদিন তিনি গৃহত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়েন। উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে প্রথমে তিনি হরিদ্বারে আসেন। এখানে হেমন্তকুমারের সহিত মিলিত হন এবং উভয়ে হিমালয়ে যাত্রা করেন। এই উপলক্ষে তিনি দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী, গয়া প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। আগ্রাতে প্রেমানন্দ বাবাজী নামে এক উচ্চশিক্ষিত ও সদালাপী সন্ন্যাসীর সহিত তিনি পরিচিত হন। ইঁনি গৃহস্থাশ্রমীদের ন্যায় জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার এই জীবনযাত্রা-প্রণালী সুভাষচন্দ্রের মনঃপূত হইল না। তৎপর সুভাষচন্দ্র হেমন্তকুমারের সহিত বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলে স্বর্গতঃ বনমালীরায় বাহাদুর তাঁহাদের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। সেখানে সুভাষচন্দ্র বাবাজীদের সহিত বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরম সাধু রামকৃষ্ণদাস বাবাজী ইঁহাদের মনীষা ও ধাশক্তির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হন এবং বারানসীতে গিয়া জ্ঞানমার্গের চর্চ্চা করিতে পরামর্শ দেন। তদনুসারে বারানসীতে তাঁহারা কিছুদিন রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ ব্রহ্মানন্দস্বামী ওরফে রাখাল মহারাজের সহিত অবস্থান করেন। কলিকাতায় সুভাষচন্দ্র যখন দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড় যাতায়াত করিতেন সেই সময় হইতেই রাখাল মহারাজ তাঁহাকে চিনিতেন। এখন তিনি তাঁহাদিগকে উপদেশ দিলেন—তোমরা বাপ মাকে না বলিয়া পলাইয়া আসিয়াছ, বাড়ি ফিরিয়া যাও। সুভাষচন্দ্র তাঁহার বন্ধুর সহিত বারানসী ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ গয়ায় আসিয়া উপস্থিত হন।

বহু সাধু সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আসিয়া সুভাষচন্দ্রের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, সাধু সন্ন্যাসীদের অনেকেই নিছক বিলাসিতায় জীবন

যাপন করেন। সন্ন্যাসধর্ম্মের এই দুরবস্থা দেখিয়া সুভাষচন্দ্র বীতশ্রদ্ধ হইয়া গৃহে ফিরিলেন। সুভাষচন্দ্রের জীবনীকার লিখিয়াছেন, "মহাত্মা গান্ধী তখন পর্য্যন্ত কৌপিন মাত্র অবলম্বন করেন নাই—তরুণ ব্যারিষ্টার হইয়া অর্থোপার্জ্জনের স্বপ্ন দেখিতেছেন, যুবক জওহরলাল তখন হ্যারো এবং ক্যাম্ব্রিজে টেনিস খেলায় মত্ত, যমুনালাল বাজাজ তখনও রাও বাহাদুর উপাধি বর্জ্জন করেন নাই—তখনও তিনি অর্থ সঞ্চয়ের চিন্তায় মগ্ন—বাঙলার ছেলে সুভাষচন্দ্র ঠিক এই সময়ে সন্ন্যাসীর বেশে কী এক আধ্যাত্মিক প্রেরণায় নিরুদ্দেশের পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন!

বাপ মায়ের অঞ্চলের নিধি সুভাষচন্দ্র আবার গৃহে ফিরিলেন। আত্মীয় স্বজন সকলেই মহা উৎকণ্ঠিত। শত খোঁজখবর করিয়াও তাঁহার কোন সন্ধান পান নাই। পিতামাতার সহিত সুভাষচন্দ্রের পুনর্ম্মিলনের দৃশ্যটি অত্যন্ত করুন ও মর্ম্মস্পর্শী। এই সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের একখানি চিঠি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "ট্রাম হইতে নামিয়া বুক উঁচু করিয়া বাড়ীতে ঢুকিলাম। মামা ও অপর একজন পরিচিত ভদ্রলোকের সহিত বাহিরের ঘরে দেখা হয়। তাঁহারা একটু আশ্চর্য্য হইলেন। মার কাছে খবর গেল—অর্দ্ধেক পথে তাঁহার সঙ্গে দেখা। প্রণাম করিলাম—তিনি থাকিতে না পারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে এইমাত্র বলিলেন, "আমার মৃত্যুর জন্যই তোমার জন্ম!" বাবার সঙ্গে দেখা। তাঁহাকে প্রণাম করিলে পর তিনি আলিঙ্গন করিয়া নিজের ঘরের দিকে লইয়া চলিলেন। অর্দ্ধেক পথে কাঁদিয়া ফেলিলাম এবং বাবাও অনেকক্ষণ আমাকে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি শুইয়া পড়িলেন—আমি ধীরে ধীরে পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় গিয়াছিলাম। সমস্ত খোলাখুলি বলিলাম। কেবল বলিলেন, একখানা চিঠি দেও নাই কেন?"

সেদিন দুপুরে পিতাপুত্রে অনেক গভীর তত্ত্বের আলোচনা হইল। পিতা বুঝাইতে' চাহিলেন, সংসারে থাকিয়াও ধর্ম্মজীবন যাপন করা চলে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস ইঁহারা সংসার ধর্ম্মী ছিলেন, সংসারের প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব আছে তাহা পালন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। পুত্র যুক্তি দেখাইলেন, "সকলের পক্ষে এক ঔষধ নয়। কারণ, সকলের এক রোগ, এক সামর্থ্য নয়। কর্ত্তব্যটা Relative, higher call এলে lower call ভেসে যায়—জ্ঞান এলে কর্ম্মনাশ হয়। বিবেকানন্দের আদর্শই হচ্ছে আমার আদর্শ।" অবশেষে পিতা বলিলেন, 'আচ্ছা, যখন তোমার higher call আসিবে তখন আমরা দেখিব।' পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত পত্রাংশের উপসংহারে সুভাষচন্দ্র লিখিয়াছেন, 'Next timeএ চলিয়া গেলে বাবা বোধ হয় আর ফিরাইবার চেষ্টা ও সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবেন। মা বলেন, আবারও যদি যায়, আমি আর বাঁচিব না। তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা সফল হইবে না বলিয়া বোধ হয়। বাবাকে দেখিলাম খুব reasonable, যাই হোক ফিরিয়া আসায় ভাল হইয়াছে এখন দেখিতেছি।"

তপশ্চর্য্যা ও যোগসাধনার দ্বারা আত্মিক শক্তি বিকাশের উপর সুভাষচন্দ্রের বিশ্বাস চিরদিন অটুট থাকিলেও পরবর্ত্তী জীবনে তিনি সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণের ইচ্ছাকে সমাজ বিরোধী (anti-social) বৃত্তির প্রভাব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেবল ব্যক্তিত্বের বিকাশই নয়—সামাজিক বৃত্তির ও বিকাশ হওয়া চাই। ভারতবাসী যে আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতায় হারিয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছে তাহার প্রধান কারণ আমাদের সামাজিক বৃত্তির অভাব। এই সামাজিক বৃত্তির অভাব ঘটিয়াছে বলিয়াই আমরা সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ করিবার শক্তি ও অভ্যাস হারাইয়া ফেলিয়াছি। বৈরাগ্য সাধনের দ্বারা যে মুক্তি তাহা সমাজ ও রাষ্ট্রের সংগঠনকে দুর্ব্বল করে। এই প্রসংগে ১৯২৯ সালে যশোহর-খুলনা যুব সম্মিলনীতে

সভাপতির অভিভাষনে সুভাষচন্দ্র বলেন—"সন্ন্যাসের প্রতি আগ্রহ যেদিন আমাদের মধ্যে দেখা দিল সেই দিন সমাজেরও রাষ্ট্রের বন্ধন শিথিল হইতে আরম্ভ করিল এবং সমাজের বা রাষ্ট্রের উন্নতি অপেক্ষা নিজের মোক্ষ লাভই মানুষের নিকট অধিক শ্রেয়স্কর বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল।" এই যে সাধনা ইহা ব্যক্তিত্ব বিকাশের সাধনা—মোক্ষলাভ ও কৈবল্যের সাধনা—সমাজ ও রাষ্ট্রের বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভের সাধনা, এই সাধনা সমাজ ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর কল্যাণের পরিপন্থী। পৃথিবীর বুকে, মানুষের সমাজে যদি বাঁচিয়া থাকিতে চাই তবে সমষ্টিগতভাবে সমাজবদ্ধ হইয়াই বাঁচিতে হইবে। হুগলি জেলা ছাত্র-সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বলেন, "যেদিন ভারত পরাধীন হইয়াছে সেইদিন হইতে ভারত সমষ্টিগত সাধনা ভুলিয়া ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছে। ফলে শত শত মহাপুরুষ এইদেশে আবির্ভূত হইয়াছেন। অথচ তাঁহাদের আবির্ভাব সত্ত্বেও জাতি আজ শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। জাতিকে আবার বাঁচাইতে হইলে সাধনার ধারা আবার অন্যদিকে পরিচালিত করিতে হইবে। জাতিকে বাদ দিয়া ব্যক্তিত্বের সার্থকতা নাই—একথা আজ সকলকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।"

কিন্তু সন্ন্যাসের প্রতি বাল্যের এই আকর্ষণ পরবর্ত্তী কালের বিপুল কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যেও সময় সময় তাঁহাকে প্রবলভাবে পাইয়া বসিত। পঙ্কিল রাজনীতিক্ষেত্রে হৃদয়হীনতা, প্রভুত্বস্পৃহা ও স্বার্থদুষ্ট মনোভাবের পরিচয় পাইয়া স্বভাবতঃই তাঁহার চিত্ত কৈশোরের স্মৃতি-ঘেরা হিমালয়ের নির্জ্জনতার দিকে আকৃষ্ট হইত। ত্রিপুরী কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া জামাডোবায় রুগ্নশয্যা হইতে তিনি লিখিয়াছিলেন "যখন আমি জামাডোবায় রোগশয্যায় পড়িয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিলাম, তখন আমার মনে বার বার এই প্রশ্নই উদয় হইত যে, যখন আমাদের মধ্যে

দেশসেবার কার্য্যে নিযুক্ত উচ্চতম স্তরের লোকদিগের মধ্যেও সঙ্কীর্ণতা এবং প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি এত প্রবল তখন আমাদের রাজনৈতিক জীবনের পরিণাম কি? আমার চিন্তা স্বভাবতঃই আমার প্রথম জীবনের আকাঙ্ক্ষিত সন্ন্যাসের প্রতি আকৃষ্ট হইত। সময়ে সময়ে এই আকর্ষণ অতি প্রবল হইত।"

চার

এদিকে নানা অনিয়ম ও অত্যাচারের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। গৃহে ফিরিবার কিছুদিন পরেই তিনি টাইফয়েড্ জ্বরে আক্রান্ত হন ও দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী থাকেন। পূজার সময় বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য কার্শিয়াং গমন করেন। তথায় তাঁহার স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হয়। সেই বৎসরই ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র অল্পকয়েকদিন পড়িয়াই তিনি আই, এ, পরীক্ষা দেন ও বিশেষ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন—প্রথমবিভাগের উপরদিকেই তাঁহার নাম ছিল। সুভাষচন্দ্রের ছাত্র জীবনেই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের মহত্ত্বের অঙ্কুর দেখা গিয়াছিল। তাঁহার জীবনের যে বৃহত্তর লক্ষ্য আছে তাহা তিনি তখন হইতেই উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই উপলব্ধি ও সচেতনতাই সুভাষচন্দ্রকে তাঁহার লক্ষ্যপথে জীবনের মহত্তম পরিণতির দিকে পরিচালিত করিয়াছে—সাংসারিক প্রতিপত্তির কোন প্রলোভনই তাঁহাকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। এই সময়ে তিনি একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—"আমি এটা বেশ বুঝিতেছি যে আমার জীবনের একটা definite mission আছে—তারই জন্য শরীর ধারণ—and I am not to drift in the current of popular opinion—লোকে ভাল মন্দ বলিবে, জগতের এটা রীতি but my sublime self-consciousness consists in this that I am not affected by them.

যদি জগতের ব্যবহারে আমার attitude পরিবর্ত্তন হয় অর্থাৎ দুঃখ, নৈরাশ্য প্রভৃতি আসে, তাহা হইলে বুঝিব যে সে আমার দুর্ব্বলতা। কিন্তু আকাশের দিকে যার লক্ষ্য, সম্মুখে পর্ব্বত আসছে, কি কূপ আসছে তার সে জ্ঞান থাকে না—সেইরকম যার একমাত্র লক্ষ্য mission এর দিকে, আদর্শের দিকে, তার ওসব দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ নাই।”

আই, এ পাশ করিবার পর সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজেই দর্শন-শাস্ত্রে অনার্স লইয়া বি, এ, পড়িতে থাকেন এবং নিজের চরিত্রবলে স্বল্পকালের মধ্যে ছাত্রগণের নেতৃস্থানীয় হইয়া উঠেন। এই সময় প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন মিঃ ওটেন। উগ্র সাম্রাজ্যবাদ পুষ্ট সংস্কৃতির উদ্ধত প্রতিনিধি বলিতে যাহা বুঝায় তিনি ছিলেন ঠিক তাহাই। ভারতবাসীর প্রতি চরম অবজ্ঞাই ছিল তাঁহার প্রধান আনন্দ—তাঁহার ঔদ্ধত্যও ছিল অপরিসীম। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক মিঃ ওটেনের দুর্ব্ব্যবহারে কলেজের ছাত্রদের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয় ও ছাত্রেরা ধর্ম্মঘট করে। সুভাষচন্দ্র ধর্ম্মঘট-কারীদের নেতৃত্ব করেন। এই ঘটনার ঠিক একমাস পরে মিঃ ওটেন পুনরায় ছাত্রদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিলে ছাত্রেরা মিঃ ওটেনকে প্রহার করিয়া ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অধ্যাপককে প্রহারের অপরাধে কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ সুভাষচন্দ্র ও কতিপয় ছাত্রকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ‘রাসটিকেট’ করেন। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হইয়াই ছাত্ররা ওটেনের দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিশোধ লয়। কিন্তু ওটেনকে মারপিটের সময় প্রকৃতপক্ষে সুভাষচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি এই ব্যাপারে প্রত্যক্ষ-ভাবে জড়িত না থাকায় কলেজের অধ্যক্ষ জেমস সাহেব তাঁহাকে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করিয়া শাস্তি হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার পরামর্শ দেন। এমন কি বিচারে তাঁহাকে সন্দেহের অবকাশে মুক্তি দেওয়ারও প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু দায়িত্ব অস্বীকার

করিয়া সুভাষচন্দ্র নিজে শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইতে চাহিলেন না। অনুগত সঙ্গীদিগকে বিপদে ফেলিয়া নিজের পরিত্রাণলাভের এই হীন প্রস্তাবে তাঁহার বীর-হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তিনি স্বেচ্ছায়ই শাস্তি বরণ করিয়া লইলেন। এই ঘটনায় সুভাষ-চরিত্রের দৃঢ়তা, সহপাঠীদের প্রতি নিবিড় প্রীতি ও সহমর্মিতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং নির্ভরযোগ্য নেতাহিসাবে তাঁহার যোগ্যতা প্রমাণিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত হইয়াও সুভাষচন্দ্র তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের বিপুল সম্ভাবনা ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র হতাশ হন নাই; বরং তাঁহার উদ্যম ও চেষ্টা আরও বৃদ্ধি পায়। এই ঘটনার কিছুকাল পূর্বের একখানা চিঠিতে তিনি লিখেন, "উদ্যমশীল ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের পথ পৃথিবীতে চিরদিন উন্মুক্তই থাকে। যদি আমি 'রাসটিকেটেড্' হই তবে তাহার জন্য আমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই—আমি ইহার জন্য মোটেই দুঃখিত হইব না।" উক্ত পত্রে তিনি ইহাও উল্লেখ করেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যদি তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেয় তাহা হইলে তিনি আমেরিকা গিয়া অধ্যাপক Munsterberg এর নিকট Experimental Psychology অধ্যয়ন করিবেন।

'ওটেন' সংক্রান্ত ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের জীবনে এক আমূল পরিবর্ত্তন হয়। তিনি জাত্যাভিমানী শাসকশ্রেণীর অসঙ্গত ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। ১৯২৯ সালে মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ছাত্র সম্মেলনের সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্র যে অভিভাষণ প্রদান করেন তাহাতে ছাত্রজীবনের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, "ছাত্রজীবনের সচ্চরিত্রতার দিক হইতে বিচার করিলে, আমার নিজের ছাত্রজীবন নিষ্কলঙ্ক ছিল না। এখনও আমার সেদিনের কথা স্পষ্টই মনে হইতেছে, যেদিন প্রিন্সিপ্যাল সাহেব আমাকে ডাকাইয়া নিয়া আমার উপর দণ্ডাদেশ জারি করিয়াছিলেন—কলেজ হইতে আমাকে সস্পেণ্ড

করিয়াছিলেন। তাঁহার কথাগুলি এখনও আমার কানে বাজিতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন—"কলেজের মধ্যে তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা দুরন্ত ছেলে।"

আমার জীবনে সেই এক স্মরণীয় দিন। বলিতে গেলে, নানা দিক দিয়াই সেদিন হইতে আমার জীবনে সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছিল। সেদিনই আমি সর্ব্বপ্রথম অনুভব করিলাম—কোনও মহৎ কাজে নির্য্যাতন সহ্য করার মধ্যে একটা অনির্বচনীয় আনন্দ আছে। এই আনন্দের সহিত জীবনের আর কোন আনন্দেরই তুলনা হয় না। আর সমস্তই ইহার নিকট তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ। আমার জীবনে বাস্তবক্ষেত্রে এই প্রথম নীতি ও স্বাদেশিকতার অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গেল। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন বাহির হইলাম, তখন আমার ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মপন্থা চূড়ান্তরূপে নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে।"

কলেজ হইতে বিতাড়িত হওয়ার পর সুভাষচন্দ্র কটকে প্রায় বছর দুই কাটান। পরে ১৯১৭ সালে তদানীন্তন ভাইসচ্যান্সেলর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় তিনি পুনরায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার অনুমতি লাভ করেন এবং স্কটীশ চার্চ্চ কলেজে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স লইয়া তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সামরিক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে University Training Corps গঠিত হয়। সুভাষচন্দ্র এই ট্রেণিং কোরে যোগদান করেন। আজিকার আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্ব্বাধিনায়কের যুদ্ধবিদ্যায় ইহাই প্রথম হাতেখড়ি। ইহার পরে তিনি ভারতীয় রক্ষীবাহিনী বা Indian defence force-এ যোগদান করিয়া Captain Grayর নিকট সামরিক শিক্ষা লাভ করেন। সেদিন সুভাষচন্দ্র ভারতের মুক্তির জন্য সশস্ত্র সেনাদল গঠন করিবার সঙ্কল্প লইয়াই কি এত যত্নও আগ্রহের সহিত যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন!

স্কটিশচার্চ্চ কলেজ হইতেই সুভাষচন্দ্র বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি, এ অনার্স পরীক্ষায় তিনি দর্শনশাস্ত্রে দ্বিতীয়স্থান অধিকার করেন।

পাঁচ

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানে বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ ক্লাশে ভর্ত্তি হন। কিন্তু কয়েক মাস পরে হঠাৎ একদিন তাঁহার পিতা তাঁহার নিকট আই, সি, এস (ভারতীয় সিভিল সার্ভিস) পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করিবার জন্য বিলাত যাত্রার প্রস্তাব করেন। আই, সি, এস পড়িতে সুভাষচন্দ্রের মোটেই ইচ্ছা ছিল না—উহা দেশসেবার অন্তরায় হইবে কিনা, এই চিন্তা তখন তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। তখনকার রাজনৈতিক অবস্থাও ঘোর সঙ্কটময়। রাওলাট আইন পাশ হইয়াছে—দেশবাসীর ন্যায্য অধিকারের সংগ্রামকে রক্তস্রোতে প্লাবিত করিয়া দিয়া জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের মুসলমানেরাও তখন জাগ্রত। খিলাফৎ আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। দেশের সর্ব্বত্র দারুণ অসন্তোষ। এই অবস্থায় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য বিলাত যাওয়া সুভাষচন্দ্রের ন্যায় দেশপ্রেমিকের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি কিছুতেই রাজী ছিলেন না—তাঁহার বন্ধু বান্ধবেরা বুঝাইলেন বিদেশে শিক্ষা লাভের এই সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। একদিকে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের একান্ত ইচ্ছা, অন্যদিকে সিভিলিয়ান পদের প্রতি নিজের অশ্রদ্ধা—এই দোটানায় পড়িয়া সুভাষচন্দ্রকে কয়েকদিন "মানসিক ঝড়ের" মধ্যে কাটাইতে হইয়াছিল। যাহাই হউক, অবশেষে সুভাষচন্দ্র অগত্যা নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিলাত যাত্রায় মত দেন এবং ১৯১৯ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা পরিত্যাগ করেন। সুভাষচন্দ্র ভাবিয়াছিলেন যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে আই, সি, এস পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভবপর হইবে না, তাই কেম্ব্রিজের ডিগ্রী লইয়া আসিয়া তিনি শিক্ষাদান ব্রত গ্রহণ করিবেন। বিলাতে গিয়া কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করা তাঁহার নিজেরও একটা প্রাথমিক উদ্দেশ্য

ছিল। এইজন্যও তিনি বিলাত যাত্রার এই সুযোগ অবহেলা করা উচিত বিবেচনা করেন নাই।

কেম্ব্রিজ হইতে এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার মতলব আগামী বৎসর সিভিল 'সার্ভিস পরীক্ষা' দেওয়া এবং পাশ করি বা ফেল করি Moral Science Tripos এর পরীক্ষা দেওয়া। এখানকার ডিগ্রী আমাকে লইতেই হইবে—কারণ ভবিষ্যতে আমার বিশেষ কাজে লাগিবে।" 'সিভিল সার্ভিস' পরীক্ষা সম্বন্ধে অপর একখানি পত্রে তিনি লিখেন, "এখনও বুঝিতে পারি নাই, আদর্শভ্রষ্ট হইয়াছি কিনা। আমি আত্ম-প্রতারণা করিয়া নিজেকে বুঝাইতে চাই না যে সিভিল সার্ভিসের জন্য পড়াটা ভাল। চিরকাল ঐ জিনিষটাকে ঘৃণা করিতাম—এখনও বোধ হয় করি। এ অবস্থায় সিভিল সার্ভিসের জন্য চেষ্টা করা দুর্ব্বলতার নিদর্শন অথবা কোন দূরবর্ত্তী মঙ্গলের সূচক তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না।" সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা যে তাঁহার উদ্দেশ্য ও আদর্শের পরিপন্থী হইবে এই চিন্তা তাঁহাকে বস্তুতঃই ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। বিদেশে শিক্ষালাভের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি বিলাত গমনে স্বীকৃত হইয়াছিলেন—কিন্তু সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলে তাঁহার মূল উদ্দেশ্য যে পণ্ড হইয়া যাইবে, এই ভয় প্রথম হইতেই তাঁহার মনে ছিল। এই সম্পর্কে তিনি এক বন্ধুকে লিখেন, "তবে একটা গুরুতর মুস্কিল এই, যদি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ হইয়া যাই তাহা হইলে আমি উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হইব।"

বিলাতযাত্রার আট নয় মাস পরেই তিনি আই, সি, এস পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। এই পরীক্ষায় তিনি ইংরেজী রচনায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। পাশ করিয়া, তিনি তাঁহার বন্ধুকে লিখিলেন, "তুমি শুনে দুঃখিত হবে যে আমি আই, সি, এস পাশ করে ফেলেছি এবং চতুর্থস্থান অধিকার করেছি।

এখন উপায় ?” সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করিয়া তিনি সুখী হইতে পারেন নাই ; কেননা, তিনি জানিতেন এখন তাঁহার উপর চাকুরি গ্রহণের চাপ আসিবে এবং তাহা অগ্রাহ্য করাও শক্ত হইবে। অথচ সিভিল সার্ভিসে যোগদান করিলে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণযন্ত্রের অন্যতম চালক হইতে হইবে। পূর্ব্ব হইতেই বন্ধুর সঙ্গে কথা ছিল, যদি পাশ করেন তাহা হইলে I. C. S. পদ পরিত্যাগ করিয়া চাকুরিপ্রিয় বাঙালীর সম্মুখে নূতন আদর্শ স্থাপন করিবেন। তখন ১৯২০ সাল। নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। দেশ তখন আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সুভাষচন্দ্রের অন্তরেও এই আহ্বান পৌঁছিয়াছে। তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় তাঁহার সম্মুখে সিভিল সার্ভিসের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ—কিন্তু শৃঙ্খলিতা মাতৃভূমির আহ্বানে ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগুর অশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি সিভিল সার্ভিস পদে ইস্তফা দিলেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য সুভাষচন্দ্র আর কালবিলম্ব না করিয়া ভারতবর্ষে রওনা হইলেন। ইতিমধ্যে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনে অনার্স সহ বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আই, সি, এস, পদ ছাড়িবার পূর্ব্বেই তিনি দেশবন্ধুর সহিত পত্রালাপ করেন। দেশবন্ধু তাঁহাকে National College ও তাঁহার পরিচালিত সাময়িকপত্র পরিচালনার ভার দিবেন বলিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। ১৯২১ সালের ১৬ই জুলাই সুভাষচন্দ্র বোম্বাই পৌঁছিয়া মণিভবনে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। সুভাষচন্দ্র সিভিল সার্ভিস পদ পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে, একই সময়ে দুই প্রভুর অর্থাৎ বৃটিশ সরকার ও দেশের সেবা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না বিবেচনা করিয়াই তিনি ঐ পদে ইস্তফা দেন এবং জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার জন্য সত্বর ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ছয়

বিলাতে থাকিয়া সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের কথা ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার কলিকাতাস্থ বন্ধুদের নিকট পত্র লিখিয়া তিনি সর্ব্বদা দেশের খবর লইতেন এবং দেশসেবার কার্য্যে তাঁহাদের উৎসাহিত করিতেন। দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে তাহার কৌতূহলের সীমা ছিল না। বিলাতে ভারতীয়দের যেসব প্রতিষ্ঠান ছিল, সেই সব প্রতিষ্ঠানে তিনি নিয়মিত উপস্থিত থাকিয়া প্রবাসী ভারতীয়দের সহিত আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। মিঃ ওটেন সংক্রান্ত ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের যে পরিচয় পাইয়াছি এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। শাসক বলিয়া ইংরেজ জাতির যে মিথ্যা দম্ভ তাহা তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। পরাধীন হইলেও শিক্ষা-দীক্ষা, শৌর্য্য-বীর্য্য ও মনুষ্যত্বের দিক হইতে কোন ভারতীয় যে স্বাধীন দেশের যে কোন অধিবাসীর তুলনায় হীন নহে, সুভাষচন্দ্রের চাল-চলন, কথা-বার্ত্তা, আলাপ-ব্যবহার, আদব-কায়দা অনুক্ষণ এই কথাই স্মরণ করাইয়া দিত। ভারতবর্ষে ইংরেজের হৃদয়হীন শাসন, ভারতীয়ের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার, শ্বেতকায় বলিয়া অসঙ্গত অহমিকাবোধ পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে ইংরেজ জাতির প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ করিয়া তুলিয়াছিল। বিলাতের এক চিঠিতে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার সব চাইতে বেশী আনন্দ হয় যখন দেখি শ্বেতাঙ্গ আমার পরিচর্য্যা করিতেছে ও জুতা সাফ করিয়া দিতেছে।" দেশাত্মবোধ ও স্বজাতিগৌরবে সুভাষচন্দ্র আপন বৈশিষ্ট্য সযত্নে রক্ষা করিয়া চলিতেন। ভারতবর্ষের গৌরবময় ঐতিহ্য ও অতীত তাঁহার নিকট গর্ব্বের বস্তু ছিল—নিজের জীবনেও সুভাষচন্দ্র সেই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। বিলাতে কোন ভারতীয়ের সুখ্যাতির পরিচয় পাইলে তিনি গর্ব্ব অনুভব করিতেন। বিলাতের একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "সেদিন

ভারতীয় মজলিসের বাৎসরিক ভোজ হইয়া গেল। Mr. Horniman আমাদের অতিথি হইয়া আসিয়াছিলেন। এখানকার বিদেশীয় বন্ধুগণ কেহ কেহ আসিয়াছিলেন। মিসেস রায় গত রবিবারের মজলিসের সভায় Rights of the Indian Mother সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। বাস্তবিক কবে আবার ভারত-রমণীবৃন্দ সমাজের শিক্ষাদাত্রীরূপে আসন গ্রহণ করিবেন? না জাগিলে ভারত-ললনা, এ ভারত কভু জাগিবে না। যেদিন Mrs. Sarojinee Naidu এখানে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, সেদিন আনন্দে বুক দশ হাত ফুলিয়া উঠিয়াছিল। সেদিন দেখিলাম ভারতরমণীর আজও এমন শিক্ষা, দীক্ষা, গুণ, চরিত্র আছে যে পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আত্ম-পরিচয় দিতে পারেন।"

"লণ্ডনে মিসেস মিত্রের সঙ্গে আলাপ হয়। দেখিলাম মিঃ মিত্র (ডাঃ মৃগেন মিত্র) moderate in Politics (নরমপন্থী) কিন্তু মিসেস মিত্র Extremist (চরমপন্থী)। আনন্দে বুক ভরে গেল। মিসেস ধর ও Extremist। এসব দেখে মনে হয় যে, যে দেশে রমণীর আদর্শ এত উচ্চ, সে দেশের উন্নতি না হয়ে পারে না। এ দেশে যে সকল ভারত মহিলারা আসেন, আমার বিশ্বাস তাঁদের প্রাণে গভীর স্বদেশ-প্রেমের উদ্রেক হয়—কারণ মাতৃহৃদয় বড় গভীর ও কোমল।"

সাত

সুভাষচন্দ্র যেদিন বোম্বাই পৌছেন, সেইদিনই অপরাহ্নে 'মণিভবনে' গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল গান্ধীজীর নিকট হইতে তাঁহার পরিকল্পনা ও কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেন। একঘণ্টাকাল গান্ধীজীকে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি যে উত্তর পাইলেন তাহা তাঁহার মনঃপূত হইল না। গান্ধীজীর সহিত সুভাষচন্দ্রের

'টি বিউন' পাঠরত সুভাষচন্দ্র

এই প্রথম সাক্ষাৎকার মোটেই ফলপ্রসূ হয় নাই। সুভাষচন্দ্র হতাশ হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করেন। এই সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'আমার যুক্তি আমাকে বার বার বলিয়া দিতে লাগিল যে, মহাত্মা যে পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন তাহার মধ্যে সুস্পষ্টতার শোচনীয় অভাব রহিয়াছে। যে আন্দোলন বা সংগ্রাম আমাদিগকে আমাদের অভীপ্সিত উদ্দেশ্য স্বরাজলাভের দিকে লইয়া যাইবে সেই সংগ্রামের ক্রমবিকাশ বা বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে তাঁহার নিজেরই কোন স্পষ্ট ধারণা নাই।" যাহাই হউক, গান্ধীজীর পরামর্শে তিনি বাঙলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভারতের রাজনৈতিক গগনে দেশবন্ধু তখন মধ্যাহ্ন ভাস্করের তেজে জাজ্বল্যমান—সংগ্রামশীল কর্ম্মপন্থার জন্য সারাদেশ তখন দেশবন্ধুর দিকে চাহিয়া আছে। দেশবন্ধুর অপূর্ব্ব ত্যাগ ও দুঃখবরণ তখন জাতির আদর্শ। দেশবন্ধুর সান্নিধ্য লাভ করিয়াই সুভাষচন্দ্র বুঝিলেন, তিনি উপযুক্ত নেতা ও গুরু লাভ করিয়াছেন। সুভাষচন্দ্র সেইদিনই তাঁহার রাজনৈতিক গুরুকে কৃতজ্ঞচিত্তে অভিনন্দিত করিয়া লইলেন ও "দেশবন্ধুর কাজে" আত্মনিয়োগ করিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইলেন। দেশবন্ধুর সহিত সুভাষচন্দ্রের সম্বন্ধ লেনিনের সহিত ষ্ট্যালিনের সম্বন্ধের সহিত তুলনীয়।

১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গভর্ণমেণ্টের উপাধি ও চাকুরী ত্যাগের হিড়িক পড়িয়া যায়। সেই সময় গভর্ণমেণ্ট-পরিচালিত স্কুল কলেজ ত্যাগের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। এই অবস্থায় দেশের শিক্ষাবিস্তারে যাহাতে কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটিতে পারে তজ্জন্য কংগ্রেসের পরিচালনায় বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে থাকে। ১৯২১ সালের মে মাসে দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্রের হস্তে বাঙলাদেশের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় "গৌড়ীয় সর্ব্ববিদ্যায়তনে"র পরিচালনাভার অর্পণ করেন। এই সময় দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রের উপর

বাঙ্‌লার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রচার বিভাগের ভারও ন্যস্ত করেন। এই কার্য্যে সুভাষচন্দ্রকে অনেক বাধাবিঘ্ন ও অপ্রিয় সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

প্রচার বিভাগের কর্ত্তা হিসাবে গভর্ণমেণ্টের কংগ্রেসবিরোধী প্রচারকার্য্য ব্যর্থ করিতে তিনি যে দক্ষতা ও কর্মশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বিদেশী আমলাতন্ত্রকেও বিস্মিত করিয়াছে। বাঙ্‌লার কংগ্রেসী কার্য্যকলাপ ও কর্ম্মনীতি সম্বন্ধে তখন যে সমস্ত সমস্যা উঠিয়াছিল, সুভাষচন্দ্র কয়েকটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়া তাহাদের যে সমাধান করেন তাহাতে বিরুদ্ধ সমালোচকগণও নীরব হইয়া যান। সুভাষচন্দ্রের বিবৃতিসমূহ পাঠ করিয়া সরকারী মুখপত্র 'ভারতবন্ধু' ষ্টেটস্‌ম্যান্‌ মন্তব্য করিয়াছিল—"অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু Indian Civil Service ত্যাগ করিয়াছেন। বৃটিশ আমলাতন্ত্র একজন অসাধারণ প্রতিভাবান ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎবিশিষ্ট কর্ম্মচারী হারাইলেন এবং কংগ্রেস-আমলাতন্ত্র তাঁহাকে লাভ করিলেন।……ইস্তাহারপ্রচারবিদ্যায় শ্রীযুক্ত বসু সিমলাকেও হারাইয়াছেন।" এই সময় বাঙ্‌লাদেশে "স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলন" আরম্ভ হয়, সুভাষচন্দ্র এই আন্দোলনের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করেন, ইউনিভার্সিটি ট্রেণিং কোরে যোগদান করিয়া তিনি যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহা এখন বিশেষ কাজে লাগে। সঙ্ঘ-সংগঠনের কাজে তাঁহার বিশেষ প্রতিভার প্রমাণ, বাল্যকাল হইতেই পাওয়া যায়। ভবানীপুরে "দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতি" নামে একটি জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান ছিল। বাল্যকালে ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্মীরূপে সুভাষচন্দ্রের দেশসেবার কার্য্যে হাতেখড়ি হয়। প্রতি রবিবারে তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্য থ'লে কাঁধে করিয়া, বাড়ী বাড়ী মুষ্টি-ভিক্ষা আদায় করিতে যাইতেন। সেদিনের সেই সরল উদার সেবাব্রতী ভাবপ্রবণ বালকের সুকুমার চিত্তে সঙ্ঘ গড়িবার শক্তির যে ক্ষুদ্র বীজটি অঙ্কুরিত হইয়াছিল

তাহাই কালক্রমে বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়া সমগ্র পৃথিবীতে বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছে। জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদে থাকিয়া সুভাষচন্দ্র শিক্ষার্থীদের মানসক্ষেত্রে স্বদেশপ্রেমের বীজ বপন করেন ও সকলের মনে স্বাধীনতা অর্জ্জনের অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তোলেন। ফলে, এই জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ উত্তরকালে জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করিয়া তাঁহাদের আত্মত্যাগ ও কর্ম্মকুশলতায় স্বাধীনতা সংগ্রামকে যথেষ্ট শক্তিশালী করেন।

জাতীয় কলেজের পরিচালনায় ও কংগ্রেস সংগঠনে নিযুক্ত এই শক্তিশালী যুবক শীঘ্রই গভর্ণমেণ্টের দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া উঠিল। গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই বুঝিতে পারিল যে বেশীদিন ইঁহাকে স্বাধীনভাবে থাকিতে দেওয়া বিপজ্জনক। সুভাষচন্দ্রের কার্য্যকলাপ বন্ধ করিবার জন্য সরকার সুযোগের অপেক্ষায় রহিল। ১৯২১ সালে ১৭ই নভেম্বর যুবরাজের ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবার কথা ছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস ও বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে অপমানিত ও লাঞ্ছিত দেশবাসী যুবরাজের ভারত আগমন উপলক্ষে সর্বপ্রকার সম্মানপ্রদর্শন ও উৎসবের আয়োজন বর্জ্জন করিতে কৃতসংকল্প হইল। সেইদিন ভারতের সর্ব্বত্র হরতাল ঘোষিত হয়। ১৯২১ সালের ১৭ই নভেম্বর তারিখে বাঙলাদেশে যে হরতাল প্রতিপালিত হয় সুভাষচন্দ্রের নিপুণ পরিচালনায় তাহা অসামান্য সাফল্য অর্জন করে। ঐদিন কোলাহল-মুখর জনবহুল কলিকাতা মহানগরী জনমানবহীন শ্মশানপুরীর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। জনসাধারণ স্বেচ্ছায় এই হরতালে যোগদান করে। দেশের সর্ব্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থ কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ বিশেষ ব্যবস্থা করে। ১৭ই নভেম্বরের শান্তিপূর্ণ হরতালের ব্যাপকতা ও সাফল্য দর্শনে সরকারের গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। শাসকবর্গ ভারতবাসীর রাজভক্তির অভাব দেখিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে। ভবিষ্যতে যাহাতে যুবরাজকে এইরূপ অপ্রীতিকর পরিস্থিতির

সম্মুখীন হইতে না হয়, তজ্জন্য যুবরাজের কলিকাতা সফরের একমাস পূর্ব্বেই কংগ্রেস ও খিলাফৎ আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীগুলিকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। যুবরাজের কলিকাতা আসিবার কথা ছিল ২৫শে ডিসেম্বর। ১৯শে নভেম্বর তারিখে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার কলিকাতা ও শহরতলিতে জনসভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিবার এক আদেশ জারী করেন। কংগ্রেস ও খিলাফৎ প্রতিষ্ঠান সমূহকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়া যে আদেশ জারী করা হয় তাহার প্রতিবাদ-কল্পে কলিকাতার জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ও কর্মিগণ এক বিবৃতি প্রচার করিয়া প্রাদেশিক ও জেলা কংগ্রেস কমিটির সভ্যগণকে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীতে যোগদান করিতে নির্দ্দেশ দেন।

সরকারের দমননীতি নিরঙ্কুশভাবে চলিতে লাগিল। বাঙলায় কংগ্রেস ভলান্টিয়ার কোর বে-আইনী ঘোষিত; সরকারের উদ্দেশ্য ভলান্টিয়ার কোরের উচ্ছেদসাধন করিয়া কংগ্রেসকে ক্ষীণবল করা। দেশবন্ধু হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিয়া জেলখানাগুলি ভর্ত্তি করিয়া ফেলিবার আয়োজন করিলেন। দিনের পর দিন অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক কারাবরণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কলিকাতা ও মফঃস্বলের সমস্ত জেলখানা ভর্ত্তি হইয়া গেল। এই ঘটনা বাঙলার যুবকদের দেশপ্রীতি ও আত্মত্যাগের এক সার্থক নিদর্শন। দেশবন্ধুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। গভর্ণমেণ্ট স্থায়ী জেলখানায় স্থান সঙ্কুলান করিতে না পারিয়া খিদিরপুর ডকে সাময়িক জেলখানা স্থাপন করিলেন। এই স্বেচ্ছাসেবক দল সংগ্রহ ও পরিচালনার কার্য্যে সুভাষচন্দ্র অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন।

১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতৃবর্গ যুবরাজের কলিকাতা-আগমন-উৎসব বর্জন-আন্দোলন উপলক্ষ

গ্রেফতার হন। তথাপি সরকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। কলিকাতা মহানগরী সাফল্যের সহিত হরতাল প্রতিপালন করিল। যেদিন যুবরাজ হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌছেন, সেইদিন কলিকাতার দোকানপাট সমস্ত বন্ধ। বৃটিশসাম্রাজ্যের মহানগরী কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া ইংলণ্ডের যুবরাজ কৃষ্ণপতাকাদ্বারা অভ্যর্থিত হইলেন। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর তীব্র অসন্তোষ যুবরাজ নিজেই প্রত্যক্ষ করিলেন।

প্রায় তিনমাস হাজত বাসের পর দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদান করিয়া সুভাষচন্দ্রের এই প্রথম কারাদণ্ড ভোগ। বিচারকের দণ্ডাদেশ শ্রবণে সুভাষচন্দ্র সকৌতুকে বলিয়াছিলেন—"মাত্র ছয় মাস! আমি কি মুরগী চুরি করিয়াছি যে এত লঘু দণ্ড হইল? (Six months only! Have I robbed a fowl?)" জেলে অবস্থান কালে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান। জেলখানায় সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি দেশবন্ধুর প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজও করিতেন এবং সময়ে সময়ে দেশবন্ধুর শিক্ষকতা করিবার সৌভাগ্যও তাঁহার ঘটিত। ৺পৃথ্বীশচন্দ্র রায়ের Life and Times of C. R. Dass নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে কারাবাস কালে দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্রের নিকট নীতিশাস্ত্র ও তত্ত্ববিদ্যা অধ্যয়ন করিতেন। এই সময় সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর অধিক প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন।

আট

১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্র কারামুক্ত হইলেন। এই সময় উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা হয়। সহস্র সহস্র নরনারী গৃহচ্যুত হয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে এক রিলিফ কমিটি গঠিত হয়। কারা মুক্তির পরেই সুভাষচন্দ্র উত্তরবঙ্গের বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের নরনারীর দুর্দ্দশামোচনকল্পে এই রিলিফের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। উত্তরবঙ্গের বন্যায় রিলিফ কমিটির সম্পাদকরূপে তিনি অসাধারণ কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দেন। তদানীন্তন বাঙ্‌লার লাট লর্ড লিটন তাঁহার কর্ম্ম দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া শাস্তাহারে তাঁহাকে অভিনন্দন জানান।

এদিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্রের কারামুক্তির পূর্ব্বেই মহাত্মা গান্ধী গ্রেফতার হইয়া ছয় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। জেলে যাইবার পূর্ব্বে মহাত্মাজী চৌরীচৌরাতে অনুষ্ঠিত হিংসাত্মক কার্য্যের জন্য আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করিয়া দেন। ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গয়া কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হন। গয়া কংগ্রেস নানাদিক দিয়াই কংগ্রেসের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। গয়ার অধিবেশনে কাউন্সিল প্রবেশ ও বর্জ্জনের সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে। দেশবন্ধু বিশ্বাস করিতেন, কাউন্সিল বর্জ্জন অপেক্ষা কাউন্সিলে প্রবেশের দ্বারাই জাতীয় আন্দোলন অধিকতর শক্তি-শালী হইবে।:দেশবন্ধুর পক্ষে ছিলেন যুক্তপ্রদেশের বিখ্যাত নেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহ্‌রু। গয়া কংগ্রেসে যাঁহারা দেশবন্ধুর পক্ষ সমর্থন করেন তাঁহারা কংগ্রেসের অভ্যন্তরে 'স্বরাজ্যদল' নামে একটি দল গঠন করেন। কংগ্রেসের কর্মপন্থা সম্পর্কে মতভেদের ফলে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ইহাই প্রথম নূতন দল সৃষ্টি। গয়া কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্তাব সমর্থন করেন। সেই সময় হইতে দেশবন্ধুর সমস্ত

কাজেই সুভাষচন্দ্র তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। উত্তরবঙ্গ হইতে ফিরিয়াই সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর কাউন্সিল প্রবেশের প্রোগ্রামকে জনপ্রিয় ও কার্য্যকরী করিবার জন্য "বাঙ্‌লার কথা" নামে একখানা দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন ও অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত তাহার সম্পাদনা করেন। গয়া কংগ্রেসের পরেই স্বরাজ্যদলের মুখপত্র "ফরোয়ার্ড" পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা পরিচালনার ভারও সুভাষচন্দ্রের উপরই ন্যস্ত হয়। তাঁহার সম্পাদনা ও পরিচালনায় এই পত্রিকার খ্যাতি ও প্রচার বিশেষভাবে বিস্তৃতিলাভ করে। সেই বৎসর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার নির্ব্বাচনে স্বরাজ্যদলের সাফল্য সুভাষচন্দ্রের সংগঠনশক্তির শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এই নির্ব্বাচনে স্বরাজ্যদলের বিরাট জয়লাভ ভারতে রাজনৈতিক নির্ব্বাচনের ইতিহাসে একটি অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা। স্বরাজ্য-দলের অখ্যাত, অজ্ঞাত প্রার্থিগণ বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ মহারথিগণকে নির্ব্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত করিয়া রাজনৈতিক মহলে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। স্বরাজ্যদলের মত একটি অপরিচিত দলের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই এই যে বিস্ময়কর প্রতিষ্ঠালাভ ইহার কৃতিত্ব বহুলাংশে সুভাষচন্দ্রের প্রাপ্য। দেশবন্ধু ছিলেন এই দলের সার্ব্বভৌম নেতা ও সুভাষচন্দ্র উহার প্রাণশক্তি।

এই সময়ে সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। সুভাষচন্দ্র নিজে নির্ব্বাচনে দাঁড়ান নাই। কাউন্সিলের বাহিরে তখন যথেষ্ট কাজ ছিল। সুভাষচন্দ্রের কাজের একটী বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে তিনি "আদর্শ নীরব কর্ম্মী"র মত নিঃশব্দে জনতার অলক্ষ্যে অদৃশ্য ঐন্দ্রজালিকের মত কাজ করিয়া যাইতেন। জনসভায় শ্রোতৃবৃন্দের করতালি ও বাহবাধ্বনির প্রতি তাঁহার কোন আকর্ষণ ছিল না। সুভাষচন্দ্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য—তিনি সকলের সঙ্গে অমায়িকভাবে মেলামেশা করিতেন। অহঙ্কার বা আভিজাত্যের ভাব তাঁহার আচরণে

মোটেই ছিল না। অথচ সকলের সঙ্গে মিশিয়াও তিনি সকলের একজন ছিলেন না। তিনি সর্ব্বদাই স্বকীয়তার এক দুর্ভেদ্য বর্ম্ম পরিয়া থাকিতেন। তাহা ভেদ করিয়া কেহই তাঁহার অন্তরলোকে প্রবেশ করিতে পারিত না। একান্ত কাছে থাকিয়াও তিনি যেন স্বকীয় গাম্ভীর্য্য ও ব্যক্তিত্বগৌরবে দূরে দূরেই থাকিতেন। তিনি সকলের কাছে 'সুভাষবাবু' বলিযাই পরিচিত ছিলেন। কম লোকেই তাঁহাকে 'সুভাষদা' বলিয়া সম্বোধন করিতে সাহস করিত।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র দেশের যুব সম্প্রদায় ও কৃষক-শ্রমিকদের মধ্যে সংযোগস্থাপনোদ্দেশ্যে "ইয়ং বেঙ্গল পার্টি" প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রমিক-গণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধানের দিকে, এই বঙ্গীয় তরুণসঙ্ঘের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। শ্রমিকগণ যাহাতে অতিরিক্ত পরিশ্রমের হাত হইতে অব্যাহতি পায়, যাহাতে তাহাদের বেতনের নিম্নতম হার নির্দ্ধারিত থাকে এবং তাহাদের অসুস্থতাকালীন বেতন লাভের ব্যবস্থা হয়, তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা তরুণ সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল। এতদ্ব্যতীত শ্রমিকগণ যাহাতে বৃদ্ধ বয়সে পেন্সন এবং দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ পায়, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করাও এই দলের অভিপ্রেত ছিল। "Young Bengal Party"র অনুষ্ঠানপত্র হইতে দেখা যায়, পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতবাসীর লক্ষ্য বলিয়া সুভাষচন্দ্র সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কৃষকগণকে অন্ততঃ নিম্নলিখিত অধিকারগুলি দেওয়া সুভাষচন্দ্রের মত ছিল।

(ক) অন্যায় এবং বাজে আদায় বন্ধ করা।

(খ) সুদের একটা উচ্চতম হার নির্দ্ধারণ করা।

(গ) গাছ কাটা, ইঁদারা পুকুর কাটা এবং দালান ইমারত করার অবাধ অধিকার।

(ঘ) হস্তান্তরের অবাধ ক্ষমতা।

(ঙ) কৃষকের ভূমিতে স্বত্ব লাভ

১৯২৪ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচনে 'স্বরাজ্যদল' প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ফলে, সেই বৎসর কর্পোরেশনে 'স্বরাজ্যদলের' প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশবন্ধু বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরীর প্রথম নাগরিকের সম্মানলাভ করিয়া জগতের সমক্ষে স্বাধিকার লাভে ভারতের জনমত প্রতিষ্ঠা করেন। কর্পোরেশনে সুভাষচন্দ্র বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হন। প্রায় মাসাধিক কাল বিরোধিতা করিয়া গভর্ণমেণ্ট অবশেষে সুভাষচন্দ্রের নিয়োগ অনুমোদন করেন। সুভাষ-চন্দ্রের বয়স তখন মাত্র ২৭ বৎসর। পেট্রোগ্রাড্ সোভিয়েটের নির্ব্বাচনে লেনিন ও ষ্ট্যালিনের বিজয় ও শ্রমিকদলের নেতৃত্বলাভ স্বৈরাচারী 'জার' নিকোলাসের পতন ও বহুকালস্থায়ী জারতন্ত্রের অবসানের সূচনা করে—কলিকাতা কর্পোরেশনে গুরু-শিষ্য দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের পাশাপাশি অবস্থিতি ও প্রতিষ্ঠালাভেও সেইরূপ কলিকাতার পৌরশাসনে নাগরিকগণ বৈদেশিক আমলাতন্ত্র ও শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের রাহুগ্রাস হইতে বহুলাংশে মুক্তিলাভ করে।

এতদিন কলিকাতা সহরের তত্ত্বাবধান করিতেন, সহরের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা ও তাহাদের ভারতীয় চাটুকার দল। এই প্রথম জাতীয়তা-বাদী নিঃস্বার্থ দেশসেবকগণ কর্পোরেশনের পরিচালনার অধিকার লাভ করিলেন। প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার পদে কর্ম্মযোগী সুভাষচন্দ্র অধিষ্ঠিত হইলেন। ফলে, কলিকাতার যে অঞ্চল কোনদিন নগর-প্রধানদের দৃষ্টিগোচর হইত না, যে সব দরিদ্র ও অশিক্ষিত সহরবাসী এতদিন উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইয়া আসিয়াছে, সেই সব উপেক্ষিত অঞ্চলের উন্নতিবিধান ও দরিদ্র সাধারণের মঙ্গলসাধনই এখন কর্পোরেশনের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল। বস্তুতঃ দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র নূতন আদর্শে ও নূতন পরিকল্পনায় কর্পোরেশনকে সম্পূর্ণ নূতন রূপ দান করিলেন। প্রাথমিক শিক্ষাদানকল্পে বহু অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। দরিদ্র ও দুঃস্থ

নরনারীর চিকিৎসার জন্য বহু দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হইল। সহরের স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিচ্ছন্নতার উন্নততর ব্যবস্থা, দরিদ্র সহরবাসীকে বিনামূল্যে দুগ্ধ বিতরণ ব্যবস্থা, মাতৃমঙ্গল শিশুমঙ্গল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপন, এই সমস্ত জনহিতকর অনুষ্ঠান দ্বারা কর্পোরেশনকে একটি বৃহৎ সেবা-কেন্দ্র ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইল। দেশের খ্যাতনামা সন্তানদের নামে রাজপথের ও পার্কের নামকরণ হইতে লাগিল। কর্পোরেশনের কর্ম্মী ও সচিববৃন্দ জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান ও খদ্দর ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সর্ব্বপ্রকারে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও প্রচার তাঁহাদের ব্রত হইল। ফলে, স্বদেশী শিল্পের প্রসার ও প্রচার হইতে লাগিল। রাজকর্ম্মচারীদের স্থলে জন-নায়কগণ নাগরিক সম্বর্দ্ধনা ও সম্মান লাভের সুযোগ পাইলেন। এক কথায় কলিকাতা কর্পোরেশন অচিরেই দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতীকার স্থল হইয়া উঠিল। আজিকার এই স্বার্থদ্বন্দ্বকলুষিত দলাদলি ও পঙ্কিলতার মাঝে সেদিনকার কর্পোরেশনের কথা ভাবিতেও আনন্দ হয়। সেই কর্পোরেশন ছিল, জাতীয় জাগরণের বিজয়স্তম্ভ, জনগণের মঙ্গলকামী প্রতিনিধি, দেশসেবকগণের কর্ম্ম ও সাধনাস্থল। সে যুগের কলিকাতা কর্পোরেশনের এই বিপুল কীর্ত্তি সুভাষচন্দ্র ও দেশবন্ধুর ন্যায় সেবাব্রতী নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিকদের নিরলস সাধনারই ফল। প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার পদে কাজ করিয়া সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশনের সকল কর্ম্মচারী, কাউন্সিলার ও জনসাধারণের গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কলিকাতার মত মহানগরীর পৌরশাসনকার্য্যে তিনি যেরূপ দক্ষতা, কর্ম্মশক্তি ও সাধুতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা পৃথিবীর যে কোন লব্ধ-কীর্ত্তি দেশনায়কের পক্ষে গৌরব ও শ্লাঘার বিষয়। মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষ সকলেই এক বাক্যে তাঁহার কার্য্যের ও পরিচালনক্ষমতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হিসাবে তাঁহার

কীর্ত্তি ও কৃতিত্ব স্বদেশী ও বিদেশী সমালোচকদের মতে "Unique, splendid and unprecedented"; সুভাষচন্দ্র যখন চীফ এক্‌জিকিউটিভ্‌ অফিসারের পদগ্রহণ করেন তখন এই পদের মাসিক বেতন ছিল তিন হাজার টাকা। "অনাবশ্যক" বিবেচনায় তিনি ঐ পদের জন্য মাসিক দেড় হাজার টাকা গ্রহণ করিতেন। তাহাও দরিদ্র ছাত্রগণের পুস্তকাদি-ক্রয়ে বৃত্তি ও ভাতার ব্যবস্থায় ব্যয়িত হইত।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র এই পদে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন নাই। যে যুবকের উদ্যম ও প্রচেষ্টা-বলে দেশবাসীর মধ্যে শাসনকার্য্যে শক্তি ও যোগ্যতার অপূর্ব্ব বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল, তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে কাজ করিতে দেওয়া আমলাতন্ত্রের প্রভুত্ব রক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক বিবেচিত হইবে সন্দেহ নাই। কলিকাতা কর্পোরেশনে স্বরাজ্য দলের এই সাফল্য ভারতের বাহিরেও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। খ্যাতনামা ইংরেজ লেখক মিঃ এইচ, এন ব্রেইলস্‌ফোর্ড তাঁহার "বিদ্রোহী ভারত" (Rebel India) পুস্তকে এই কথা বিশেষ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।* ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ করিয়া সুভাষবাবুকে গেফ্‌তার করা হয়। সদ্যঃ বিধিবদ্ধ "বেঙ্গল অডিন্যান্স" বলে সন্ত্রাসবাদমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে সুভাষচন্দ্রকে বিনাবিচারে আটক রাখা হইল। কলিকাতা কর্পোরেশন কিন্তু প্রধান কর্ম্মসচিবের পদে সুভাষচন্দ্রকেই বহাল রাখিলেন। এই সময়ে সুভাষচন্দ্রকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে

* In spite of the official weakness, Indians are struggling hard to solve their own problems of health and education. The Calcutta Municipality, which has had some inspiring leaders, from the late Mr. Das to Sen Gupta and Subhas Bose has done marvels. If India governs herself in the spirit of constructive patriotism which Calcutta displays, one may think of her future with confidence.

—*Rebel India by H. N. Brailsford.*

আবদ্ধ রাখা হয়। জেলে থাকিয়াই তিনি কর্পোরেশনের কাজকর্ম্ম চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বেশী দিন সে সুযোগও দিলেন না। তাঁহাকে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হইল। সেখানে অল্প কিছুদিন রাখিবার পরেই সহসা একদিন তাঁহার উপর মান্দালয়ে নির্ব্বাসনের আদেশ জারি করা হয়। ১৯২৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী রাত্রির অন্ধকারে পুলিশরক্ষীদল পরিবেষ্টিত হইয়া সহকারী ইনপেক্টার জেনারেল মিঃ লোম্যান সুভাষচন্দ্র ও অপর সাতজন রাজবন্দীকে কয়েদীর গাড়ীতে তুলিয়া মান্দালয় অভিমুখে যাত্রা করেন। এই নিঃস্বার্থ, নির্ভীক দেশপ্রেমিক গভর্ণমেণ্টের এতই দুশ্চিন্তা ও ভয়ের কারণ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে ভারতের কারাগারে রাখাও নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। তাই সুদূর ব্রহ্মদেশের অস্বাস্থ্যকর ও কুখ্যাত মান্দালয় জেলই এই চিরবিদ্রোহী দেশকর্ম্মীর আবাসস্থল বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল। সুভাষচন্দ্রের গ্রেফ্‌তারে কর্পোরেশনের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। তাঁহাকে বিনাবিচারে কারারুদ্ধ করায় দেশব্যাপী প্রবল বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। সরকারের এই কার্য্যের প্রতিবাদে আহূত কর্পোরেশনের এক সভায় মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন জ্বালাময়ী ভাষায় বলেন, দেশপ্রেম যদি অপরাধ হয়, তবে শুধু প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাই নহেন, আমিও অপরাধী—এই কর্পোরেশনের মেয়রও সমান অপরাধে অপরাধী। বলা বাহুল্য, সুভাষচন্দ্রের গ্রেফ্‌তারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আঘাত পাইয়াছিলেন। জনৈক লেখক লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামচন্দ্রের অবস্থার সহিত দেশবন্ধুর সে সময়কার অবস্থার তুলনা করিয়াছেন।

নয়

সুভাষচন্দ্রের মান্দালয় জেলে অবস্থান একটি ঘটনার জন্য বিশেষ স্মরণীয়। ১৯২৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি সুভাষচন্দ্র ও অপর কয়েকজন রাজবন্দী অনশন ধর্ম্মঘট করেন। দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা ও অন্যান্য ধর্ম্মোৎসবের জন্য রাজবন্দীদিগকে কোনরূপ ভাতা দেওয়া হইত না। সেই বৎসর ২৫শে অক্টোবর দুর্গাপূজা। মান্দালয় জেলের রাজবন্দীরাও বাঙ্গালীর এই উৎসব উপলক্ষে অর্থসাহায্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেন। জেল সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট মেজর ফিল্‌লে রাজবন্দীদের দাবী পূরণ করিতে স্বীকৃত হইলেও সরকার তাঁহাদের প্রস্তাবে অসম্মত হন। সরকারের এই অনমনীয় মনোভাবের প্রতিবাদ কল্পে রাজবন্দীরা অনশন ধর্ম্মঘট করে। রেঙ্গুনের নাগরিকগণ জনসভা করিয়া অনশন ধর্ম্মঘটকারীদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। ২৪শে ফ্রেব্রুয়ারী তারিখের কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের নিন্দা করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২৫শে ফেব্রুয়ারী এই সম্পর্কে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি মুলতবী প্রস্তাব আনয়ন করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রেসিডেণ্ট উক্ত প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি প্রদান করেন না। অনশনকারী রাজবন্দীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ২৮শে ফ্রেব্রুয়ারী কলিকাতা সহরে পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয়। এইরূপে দিকে দিকে যখন বিক্ষোভের অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল তখন সরকার বাধ্য হইয়া বন্দীদের সমস্ত দাবী পূরণ করিতে স্বাকৃত হইলেন। সুভাষচন্দ্রের জীবনে এই প্রথম অনশন ধর্ম্মঘট। অনশন ধর্ম্মঘটের ফলে উদ্বুদ্ধ অন্তর্নিহিত আত্মশক্তির উপলব্ধিও সুভাষচন্দ্রের জীবনে এই প্রথম। দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতির সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র বিশ্বাসকে লিখিত একখানি পত্রে তিনি লিখেন

"আপনি বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছেন যে আমাদের অনশন ব্রত একেবারে নিরর্থক বা নিষ্ফল হয় নাই। গভর্ণমেণ্ট আমাদের ধর্ম্ম বিষয়ে দাবী স্বীকারকরিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং অতঃপর বাঙ্লাদেশের রাজবন্দী পূজার খরচ বাবদ বাৎসরিক ত্রিশটাকা allowance পাইবেন"। ত্রিশটাকা অতি সামান্য এবং ইহাদ্বারা আমাদের খরচ কুলাইবেনা; তবে যে Principle গভর্ণমেণ্ট এতদিন স্বীকার করিতে চান নাই তাহা যে এখন স্বীকার করিয়াছেন, ইহাই আমাদের সব চেয়ে বড় লাভ। টাকার কথা সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বকালে অতি তুচ্ছ কথা। পূজার দাবী ছাড়া আমাদের অন্যান্য অনেকগুলি দাবীও গভর্ণমেণ্ট পূরণ করিয়াছেন। বৈষ্ণবের ভাষায় বলিতে গেলে আমাকে কিন্তু বলিতে হইবে "এহবাহ্য"। অর্থাৎ অনশনব্রতের সব চাইতে বড় লাভ অন্তরের বিকাশ ও আনন্দ লাভ। দাবীপূরণের কথা বাহিরের কথা, লৌকিক জগতের কথা। Suffering ব্যতীত মানুষ কখন ও নিজের অন্তরের আদর্শের সহিত অভিন্নতা বোধ করিতে পারে না এবং পরীক্ষার মধ্যে না পড়িলে মানুষ কখনও স্থির নিশ্চিন্ত ভাবে বলিতে পারে না তাহার অন্তরে কত অপার শক্তি আছে। এই অভিজ্ঞতার ফলে আমি নিজেকে আরও ভালভাবে চিনিতে পারিয়াছি এবং নিজের উপর আমার বিশ্বাস শতগুণে বাড়িয়াছে।"

দুই বৎসর অতীত হইতে চলিল সুভাষচন্দ্রকে বিনা বিচারে ও বিনা অপরাধে আটক রাখা হইয়াছে। প্রকাশ্য আদালতে বিচারের জন্য বারংবার দাবী জানাইয়াও কোন সুফল হয় নাই। অবশেষে ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে বাঙ্লা কংগ্রেস এক অভিনব উপায় অবলম্বন করেন। এই মাসে ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর কলিকাতা অমুসলমান কেন্দ্র হইতে কংগ্রেস কমিটি কর্ত্তৃক সুভাষচন্দ্র ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদপ্রার্থী মনোনীত হন। এই প্রসঙ্গে উত্তর কলিকাতার অধিবাসিগণের উদ্দেশ্যে এক আবেদন পত্রে তিনি লিখেন "নিজের জীবন পূর্ণরূপে

বিকশিত করিয়া ভারত মাতার পদাম্বুজে অঞ্জলিস্বরূপ নিবেদন করিব এবং এই আন্তরিক উৎসর্গের ভিতর দিয়া পূর্ণতর জীবন লাভ করিব—এই আদর্শের দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম। স্বদেশসেবা বা রাজনীতির পর্য্যালোচনা আমি সাময়িক বৃত্তিহিসাবে গ্রহণ করি নাই। এই জন্য পরাধীন দেশে স্বদেশসেবকের জীবনে যে বিপদ ও পরীক্ষা, দুঃখ ও বেদনা অবশ্যম্ভাবী, তার জন্য কায়মনে প্রস্তুত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমি কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি কিনা অথবা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তার বিচার করিবেন আমার দেশবাসিগণ। আমার এই ক্ষুদ্র অথচ ঘটনাবহুল জীবনে যে সব ঝড় আমার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে বিঘ্নবিপদের সেই কষ্টিপাথর দ্বারা আমি নিজেকে সূক্ষ্মভাবে চিনিবার ও বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছি। এই নিবিড় পরিচয়ের ফলে আমার প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, যৌবনের প্রভাতে যে কণ্টকময় পথে আমি জীবনের যাত্রা সুরু করিয়াছি, সেই পথের শেষ পর্য্যন্ত চলিতে পারিব; অজানা ভবিষ্যৎকে সম্মুখে রাখিয়া যে ব্রত একদিন গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা উদ্‌যাপন না করিয়া বিরত হইব না। আমার সমস্ত প্রাণ ও সারা জীবনের শিক্ষা নিঙাড়িয়া আমি এই সত্য পাইয়াছি, পরাধীন জাতির সব ব্যর্থ—শিক্ষা, দীক্ষা, কর্ম্ম সকলই ব্যর্থ যদি তাহা স্বাধীনতা লাভের সহায় বা অনুকূল না হয়। তাই আজ আমার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে এই বাণী নিরন্তর আমার কানে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়?" আমি কৃতাঞ্জলিপুটে আপনাদের নিকট এই প্রর্থনা করিতেছি, আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, স্বরাজ লাভের পূর্ণ প্রচেষ্টাই যেন আমার জীবনের জপ, তপ ও স্বাধ্যায়, আমার সাধনা ও মুক্তির সোপান হয় এবং জীবনের শেষ দিবস পর্য্যন্ত আমি যেন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে নিরত থাকিতে পারি।" তাঁহার এই আবেদন পত্রখানি কর্ত্তৃপক্ষ আটক রাখিলেও উহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ

হয় নাই। দেশবাসী তাঁহাকে বিপুল ভোটাধিক্যে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া সুযোগ্য নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।

এদিকে সুভাষচন্দ্রের শরীরের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। মান্দালয়ের নির্জ্জন কারাবাসে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া গেল। ঐ স্থানের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ও নিরানন্দ নির্জ্জনতা তাঁহার শরীরে মারাত্মক ক্ষয়রোগ আনিয়া দেয়। তদুপরি তিনি অজীর্ণ রোগে বিশেষরূপে আক্রান্ত হইলেন। দেহের ওজন ৪০ পাউণ্ড কমিয়া যায়। এই অবস্থায় তাঁহাকে ইন্‌সিন্ জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতা ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসু ও সরকারী মেডিক্যাল অফিসার লেঃ কর্ণেল কেলসাল তাঁহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন এবং অবস্থা উদ্বেগজনক বলিয়া মত প্রকাশ করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকার পক্ষ হইতে স্বরাষ্ট্র-সচিব মিঃ মোবার্লী সুভাষচন্দ্রের নিকট স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সুইট্‌জারল্যাণ্ডে যাইবার প্রস্তাব করেন। সুভাষচন্দ্রকে এইরূপ সর্ত্ত দেওয়া হয় যে, তিনি কলিকাতা বা ভারতের অপর কোন বন্দরে পদার্পণ না করিয়া সরাসরি ইউরোপ যাত্রা করিবেন। সুভাষচন্দ্র এই প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। কারণ তাঁহার মতে "জন্মভূমি হইতে চিরকালের মত নির্ব্বাসন অপেক্ষা জেলে থাকিয়া মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়।" এই প্রসঙ্গে ইনসিন জেল হইতে তিনি তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে মিঃ মোবার্লীর প্রস্তাব সম্বন্ধে যে পত্র লিখেন তাহার প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "দেখা যাইতেছে, সরকার ছোটদাদার (ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসুর) প্রদত্ত রোগবিবরণ গ্রহণ করেন নাই, যদিও তাঁহার প্রদত্ত স্বাস্থ্য অর্জ্জন উপায় গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ মিঃ মোবার্লী স্পষ্টই বলিয়াছেন, "সুভাষচন্দ্র যে অত্যধিক পীড়িত হন নাই এবং একেবারে কর্ম্মশক্তিহীন হন নাই, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।" আমার জানিতে কৌতূহল হয়, সরকার কবে আমাকে "অত্যধিক পীড়িত"

বা "একেবারে কর্ম্মশক্তিহীন" মনে করিবেন। যেদিন সকল চিকিৎসক ঘোষণা করিবেন আমার রোগমুক্তি অসম্ভব এবং মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে মৃত্যু হইতে পারে, সেইদিন কি? তাছাড়া ছোট দাদার রোগ-বিবরণ যদি তাঁহারা স্বীকার করিতে রাজী না হন, তাহা হইলে যাহা মাত্র বাহ্যতঃ তাঁহার অনুমোদন তাহা গ্রহণ করিতেই বা সরকার এত ব্যস্ত কেন? ছোট দাদা এ অনুমোদন করেন নাই যে, আমাকে বাড়ীতে যাইতে দেওয়া হইবে না, বা বিদেশে যাইবার পূর্ব্বে আমি আমার আত্মীয়-স্বজনকে দেখিতে পাইব না। তিনি একথাও বলেন নাই যে, আমি যে জাহাজে যাইব তাহা কোন ভারতীয় বন্দরে নোঙর করিতে পারিবে না। তিনি একথাও বলেন নাই যে, যদি আমার নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার হয় তাহা হইলে যতদিন আর্ডিনান্স আইন থাকিবে ততদিন দেশে থাকিতে পারিব না। এই সকল দেখিয়া আমার সন্দেহ হয়, সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য আমার নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের ব্যবস্থা নয়।

মিঃ মৌবার্লী প্রকৃত পক্ষে বলিয়াছেন যে, দুইটি পথ অবশিষ্ট আছে, তাহা (১) জেলে বন্দী হইয়া অবস্থান কিংবা, (২) কোন বিদেশে যাইয়া স্বাস্থ্য অর্জ্জনের চেষ্টা ও অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অবস্থান। কিন্তু সত্যই কি এই দুয়ের মধ্যে অন্যকোন মধ্যপন্থা নাই? আমার তা মনে হয় না। সরকারের ইচ্ছা যে আমি অর্ডিনান্স আইন উঠিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত, অর্থাৎ জানুয়ারী ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত, বন্দী থাকি। কিন্তু এ আইন যে ১৯৩০ সালের পরও পুনরায় নূতন করিয়া প্রবর্ত্তিত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? গত অক্টোবর মাসে সি. আই. ডি পুলিসের কর্ত্তা মিঃ লোম্যানের সহিত এ প্রসঙ্গে আমার যে কথা হইয়াছিল তাহা একেবারেই আশাপ্রদ নয়। ১৯২৯ সালে যদি এই অর্ডিনান্স আইনকে চিরকালের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিবার আন্দোলন হয় তাহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইব না। তাহা হইলে আমাকে চিরস্থায়ীভাবে বিদেশে বাস করিতে হইবে এবং এইরূপ

নির্ব্বাসনের জন্য নিজেকেই দায়ী মনে করিতে হইবে। যদি এ সম্বন্ধে সরকারের সত্যই কোন স্পষ্ট ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে আমি কবে বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিতে পারিব, সে কথাও ঐ প্রস্তাবে উল্লিখিত থাকিত।

তারপর, প্রবাসে আমি কিরূপ স্বাধীনতা ভোগ করিতে পাইব তাহার কোনও স্পষ্ট আশ্বাস পাওয়া যায় নাই। সুইট্‌জারল্যাণ্ডে ঝাঁকে ঝাঁকে যে সকল সি. আই. ডি বিচরণ করে, ভারতসরকার কি আমাকে তাহাদের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন? একথা অস্বীকার করা যায় না যে আমি "রাজনৈতিক অপরাধের সন্দেহে" ধৃত এবং যতদিন না মত পরিবর্ত্তন করিয়া পুলিস গোয়েন্দা হইতেছি ততদিন সরকার আমাকে সন্দেহের চক্ষেই দেখিবেন এবং ইহা খুব সম্ভব যে এই সকল গোয়েন্দা আমাকে প্রতিপদক্ষেপে অনুসরণ করিয়া আমার জীবন দুর্ব্বিসহ করিয়া তুলিবে।

সুইট্‌জারল্যাণ্ডে শুধু বৃটিশ গেয়েন্দা নাই, তথায় বৃটিশ সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত সুইস, ইটালীয়, ফরাসী, জার্ম্মান ও ভারতীয় গোয়েন্দা আছে এবং কোনও কোনও উগ্র উৎসাহী গোয়েন্দা আমাকে যে সরকারের কাছে গভীর কালিমাময় করিবার জন্য মিথ্যা ঘটনার সুবিস্তৃত বর্ণনা দিবে না, তাহারই বা প্রমাণ কি? আমি গতবৎসর মিষ্টার লোম্যানকে বলিয়াছিলাম, গোয়েন্দাবিভাগ ইচ্ছা করিলে যে কোন লোকের বিরুদ্ধে কতকগুলি মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাহাকে কোনরূপ অর্ডিনান্সে বন্দী করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারে। ইউরোপ হইতে এরূপ করা আরও সহজ। বিদেশে যাহাদিগকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হইত, তাহাদিগকে ভারতে ফিরিতে কিরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। বিলাতের পার্লামেন্টের ও মন্ত্রিসভার কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা না করিলে লালা

লাজপৎ রায়ের স্থায় নেতাও দেশে ফিরিতে পারিতেন না। সরকার যখন আমাকে একবার সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছেন, তখন আমার ভবিষ্যৎ অবস্থা কিরূপ হইবে সহজেই অনুমান করা যায়।

আমি জানি পুলিসের গোয়েন্দারা এ বিষয়ে একটু অধিক কার্য্যতৎপরতা দেখাইয়া থাকেন। আমি ইউরোপে যত শান্তভাবে এবং সাবধানতার সহিত বাস করি না কেন, তাঁহারা ভারত সরকারের নিকট আমার বিরুদ্ধে অন্যায় রিপোর্ট পাঠাইবেন। আমি কিছু না করিলেও এবং খুব শান্তভাব থাকিলেও তাঁহারা আমাকে ভীষণ ষড়যন্ত্রের কর্ত্তা বলিয়া রিপোর্ট দিবেন। তাঁহারা কি রিপোর্ট দিতেছেন, তাহার কিছুই আমি জানিতে পারিব না। কাজেই কোন কালে সে সম্বন্ধে সত্য প্রকাশের বা আমার বিবরণ প্রদানের সম্ভবনা থাকিবে না। এইরূপ ভাবে ইহা খুব সম্ভব যে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা আমাকে একজন বড় বলশেভিক নেতা বলিয়া প্রচার করিয়া দিবেন এবং তাহার ফলে হয়ত আমার ভারতে প্রত্যাগমনের পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে; কারণ, ইউরোপের লোক বর্ত্তমানে এক বলশেভিকেই ভয় করে। এইজন্যই স্বেচ্ছায় আমি আমার জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইতে ইচ্ছা করি না। সরকার পক্ষও যদি আমার দিক হইতে একবার এ বিষয়ের আলোচনা করেন তাহা হইলে আমার যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

যদি আমার বলশেভিক এজেণ্ট হইবার ইচ্ছা থাকিত, তবে আমি সরকার বলিবামাত্র প্রথম জাহাজেই ইউরোপ যাত্রা করিতাম। তথায় স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্তির পর বলশেভিক দলে মিশিয়া সমগ্র জগতে এক বিরাট বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে প্যারিস হইতে লেনিনগ্রাড পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিতাম; কিন্তু আমার সেরূপ কোন ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা নাই। যখন শুনিলাম যে আমাকে ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে ফিরিয়া আসিতে দেওয়া হইবে না, তখন বার বার মনে মনে ভাবিলাম সত্যই কি আমি

ভারতে বৃটিশ শাসনরক্ষার পক্ষে এতই বিপজ্জনক যে, বাঙলাদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াও সরকার সন্তুষ্ট হইতে পারেন না, অথবা সমস্ত ব্যাপারটাই একটা বিরাট ধাপ্পাবাজি ? যদি প্রথম কথা সত্য হয়, তাহা হইলে ব্যুরোক্রেশীর নিকট সেরূপ ভয়ের কারণ হওয়া আমার পক্ষে শ্লাঘার কথা। কিন্তু পরক্ষণেই যখন আমি আমার নিজের জীবন ও কার্য্যাবলীর কথা মনে মনে চিন্তা করি, তখন বুঝিতে পারি যে একদল স্বার্থান্ধ হিংসাপরায়ণ লোক আমাকে যে ভাবে দেখিতেছেন আমি প্রকৃত সেরূপ নহি। আমি বাঙলার বাহিরে কোন রাজনৈতিক কার্য্য করি নাই এবং ভবিষ্যতে করিব বলিয়াও মনে করি না ; কারণ, বাঙলাকেই আমি আমার কার্য্যক্ষেত্র ও আদর্শের পক্ষে বিরাট বলিয়া মনে করি। বাঙলা সরকার ছাড়া অন্যকোন সরকারের আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। ছয় বৎসরের মধ্যে আমি কংগ্রেসে যোগদান ও পারিবারিক কারণব্যতীত অন্য কোনও কার্য্যে বাঙলার বাহিরে যাই নাই। তবে কেন আমাকে সমস্ত ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইতেছে ? সিংহল খাস বৃটিশ উপনিবেশ। ভারত সরকারের নিষেধ আজ্ঞা আইন অনুসারে তথায় খাটিবে কি না সন্দেহ।

বাঙলা সরকার এখন আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহেন। আমি যখন স্বাধীন ছিলাম, তখনই বা আমার কি গতিবিধি ছিল ? ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর পর্য্যন্ত একবৎসরের মধ্যে আমি মাত্র দুইবার কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলাম। প্রথম খুলনা জেলা কনফারেন্সে যোগদান করিবার জন্য এবং দ্বিতীয় নদীয়া জিলার কাউন্সিল নির্ব্বাচনে একজন সভ্যপদ প্রার্থীর পক্ষে বক্তৃতা করিবার জন্য। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী হইতে অক্টোবরের মধ্যে আমি একবারও কলিকাতার বাহিরে যাই নাই। আমাকে সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সের সহিত জড়াইবার নানারূপ চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু সে কনফারেন্সের সময় আমি কলিকাতা কর্পোরেশনের

চীফ একজিকিউটিভ অফিসাররূপে মিউনিসিপ্যাল কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম ; ঠিক কনফারেন্সের সময় কলিকাতায় ঝাড়ুদারদিগের ধর্ম্মঘটের সম্ভাবনা হওয়ায় আমার পক্ষে একমিনিটের জন্যও কলিকাতা ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মে হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত আমি যাহা করিয়াছি তাহা সকলেই অবগত আছেন। সে সময় আমার সর্ব্বপ্রকার গতিবিধির কথা সরকার জানিতেন। আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করাই যদি আমাকে গ্রেফ্‌তার করার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমি বলিব, আমাকে গ্রেফ্‌তার করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

মিঃ মোবার্লী একটি বিষয়ে বিশেষ হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছেন। সরকার জানেন যে প্রায় আড়াই বৎসরকাল আমি নির্ব্বাসিত আছি। এই সময়ের মধ্যে আমি আমার কোন আত্মীয়, এমন কি পিতা-মাতার সহিতও সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। সরকার প্রস্তাব করিয়াছেন, আমাকে আরও আড়াই বা তিন বৎসরকাল বিদেশে থাকিতে হইবে, সে সময়েও তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের কোন সুবিধা হইবে না। ইহা আমার পক্ষে কষ্টদায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু যাঁহারা আমাকে ভালবাসেন, তাহাদের পক্ষে আরও অধিক কষ্টদায়ক। প্রাচ্যের লোকেরা তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনের সহিত কিরূপ গভীর স্নেহের বন্ধনে জড়িত থাকেন, তাহা পাশ্চাত্ত্য দেশীয় কাহারও পক্ষে অনুমান করাও সম্ভব নহে। আমার মনে হয়, এই অজ্ঞতার জন্যই সরকার এইরূপ হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য দেশীয়েরা মনে করেন, যেহেতু আমার বিবাহ হয় নাই, অতএব আমার পরিবার থাকিতে পারে না এবং কাহারও প্রতি আমার ভালবাসাও থাকিতে পারে না।

গত আড়াই বৎসর আমাকে কিরূপ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে, সরকার বোধ হয় তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। আমিই কষ্ট পাইয়াছি, তাঁহারা নহেন। বিনা কারণে তাঁহারা এতদিন ধরিয়া আমাকে আটক রাখিয়াছেন।

আমাকে তবু বলা হইয়াছিল, যে অস্ত্র-শস্ত্র ও বিস্ফোরক প্রভৃতি আমদানী সরকারী কর্ম্মচারী হত্যা প্রভৃতি ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আমি অপরাধী। ঐ সম্বন্ধে অনেকে আমার বক্তব্য জানাইতে বলিয়াছিলেন। আমি উত্তরে জানাইতেছি যে, আমি নির্দ্দোষ। আমার বিশ্বাস, পরলোকগত স্যার এডওয়ার্ড মার্শাল হল বা স্যার জন সাইমন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু বলিতে পারিতেন না। দ্বিতীয়বার অভিযোগগুলি আমার নিকট উপস্থিত করা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এত লোক থাকিতে পুলিস আমাকে ধরিল কেন? আমার মনে হয়, উহাই সন্তোষজনক উত্তর। আমার গ্রেফ্তারের পর হইতে বাঙ্লা সরকার আমার অধীন ব্যক্তিদিগকে প্রতিপালনের জন্য বা আমার গৃহাদি রক্ষার জন্য কোনরূপ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন নাই। ঐ বিষয়ে আমি বড়লাটের নিকট আবেদন করিলে বাঙ্লা সরকার সে আবেদন চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। তারপর আবার আমাকে তিন বৎসর বিদেশে থাকিতে বলা হইতেছে। ইউরোপে নির্ব্বাসনের সময় আমার নিজের খরচ নিজেকে যোগাইতে হইবে। এ কিরূপ যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব, তাহা বুঝিতে পারি না। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে আমার যেরূপ স্বাস্থ্য ভাল ছিল, আমাকে অন্ততঃ সেইরূপ স্বাস্থ্যবান করিয়া সরকারের মুক্তি দান করা উচিত। কারাবাসের জন্য আমার স্বাস্থ্যহানি হইলে সরকার কি তাহার ক্ষতিপূরণ দিবেন না? ইউরোপে যতদিন হৃতস্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত না হই ততদিন আমার সকল খরচ সরকারের বহন করা উচিত। কতদিন সরকার এই সকল বিষয়ে অনবহিত থাকিবেন? সরকার যদি ইউরোপ যাইবার পূর্ব্বে আমাকে একবার বাড়ী যাইতে দিতেন, যদি ইউরোপে আমার সকল ব্যয়ভার বহন করিতেন ও রোগমুক্তির পর আমাকে বিনা বাধায় দেশে ফিরিতে দিতেন, তাহা হইলে এই দান সহৃদয়তার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতাম।”

দশ

সুভাষচন্দ্রের জীবন সংশয়াপন্ন; অথচ বিনাসর্ত্তে মুক্তি ভিন্ন অন্য কিছুতেই তিনি রাজী নহেন। অবশেষে সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুর দায়িত্ব এড়াইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৯২৭ সালের ১৫ই মে রেঙ্গুন হইতে কলিকাতায় লইয়া আসেন। ডায়মণ্ড হারবারের সন্নিকটে জাহাজ থামাইয়া লাট বাহাদুরের লঞ্চে সুভাষচন্দ্রকে তুলিয়া লওয়া হয়। লঞ্চে ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, লেঃ কর্ণেল স্যাণ্ডস্ ও গভর্ণরের চিকিৎসক হাংষ্টন তাঁহাকে পরীক্ষা করেন। পরদিন প্রাতে ১৬ই মে গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান কর্ত্তা সুভাষচন্দ্রের হস্তে ভগ্নস্বাস্থ্যবশতঃ বিনা-সর্ত্তে মুক্তিদানের আদেশপত্রখানি অর্পণ করেন। যখন তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করা হয় তখন তিনি স্বাস্থ্যবান, বলবান ও অক্লান্ত পরিশ্রমী যুবক ছিলেন আর এখন তিনি মুক্তিলাভ করিলেন অস্থিচর্মসার রোগজীর্ণ দেহ লইয়া।

মান্দালয়ের জেলখানায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ভগ্নস্বাস্থ্য হইলেও সুভাষচন্দ্রের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস অটুট ছিল। "দেশমাতৃকার উদ্ধার সাধনের যে মহৎ ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন সেই ব্রত উদ্‌যাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে অবিরাম সংগ্রাম করিয়া যাইতে হইবে। ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে।" কারামুক্তির পর তিনি লিখিয়াছিলেন, "দেশান্তরে কারাবাসে মাসের পর মাস যখন কাটিয়েছি তখন প্রায়ই এই প্রশ্ন আমার মনে উঠ্‌ত, কিসের জন্য, কিসের উদ্দীপনায় আমরা কারাবাসের চাপে ভগ্নপৃষ্ট না হয়ে আরও শক্তিমান হয়ে উঠছি? নিজের অন্তরে যে উত্তর পেতাম তার মর্ম্ম এই :—

ভারতের একটা Mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে; সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির

ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখকষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্ত্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।" দক্ষিণ কলিকাতার সেবক সমিতির সহসম্পাদক অনাথবন্ধু দত্তকে লিখিত এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "জেলে আছি তাতে দুঃখ নাই। মায়ের জন্য দুঃখভোগ করা সেত গৌরবের কথা!"

মান্দালয়ে অবস্থান সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বলিয়া ছিলেন, "আমার স্পষ্ট মনে আছে, এই সেই বন্দীখানা যেখানে প্রথমে লোকমান্য তিলককে ছয় বৎসরের জন্য ও পরে লালালাজপৎ রায়কে প্রায় এক বৎসরের জন্য বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। ইহা চিন্তা করিয়া আমরা সান্ত্বনা পাইতাম ও গর্ব্ব অনুভব করিতাম যে আমরা তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি সুভাষচন্দ্র যতদিন আলীপুর জেলে আবদ্ধ ছিলেন ততদিন কর্পোরেশনের কাজকর্ম্ম তিনি নিজেই দেখিতেন। মান্দালয়ে আসিয়াও তিনি তাঁহার নিজ হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান গুলির কথা এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া থাকিতে পারেন নাই। বিশেষ করিয়া 'দক্ষিণ কলিকাতা সেবা সমিতির' চিন্তা অহরহই তাঁহার মনে উদয় হইত। সেবা সমিতির কর্ম্মীদিগকে তিনি সর্ব্বদা উৎসাহ ও উপদেশ দিয়া পত্র লিখিতেন। সমাজ-সেবা ও কুটির-শিল্প সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র ও সেবা সমিতির কর্ম্মীদের মধ্যে যে পত্রালোচনা হইত তাহা সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লব্ধ গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক।

একে ত জেলখানার আবহাওয়াটাই সাধারণতঃ এইরূপ যে মানুষকে তাহা অমানুষ করিয়া ফেলে। বদ্ধ, নিরানন্দ কারাজীবনে আত্ম-শক্তিতে আস্থা কমিয়া আসে। আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও অনুরক্তি শিথিল হইয়া যায়—চরিত্র-বল নষ্ট হয়। তাহার উপর মান্দালয় কারাগার সে যুগের

জঘন্যতম কারাগারসমূহের অন্যতম। শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায়কে এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার বিশ্বাস দীর্ঘ মেয়াদী বন্দীর পক্ষে সব চেয়ে বড় বিপদ এই যে আপনার অজ্ঞাতসারে তাকে অকালবার্দ্ধক্য এসে ধরে ; তুমি ধারণাই করতে পারবে না কেমন করে মানুষ দীর্ঘকাল কারাবাসের ফলে ধীরে ধীরে দেহে ও মনে অকালবৃদ্ধ হয়ে যেতে থাকে।" মান্দালয়ের অভিজ্ঞতা সুভাষচন্দ্রকে এরূপ বিচলিত করে যে ভবিষ্যতে তিনি ভারতীয় বন্দীশালার অবস্থা ও শাসন প্রণালীর উন্নতি বিধান করিতে চেষ্টা করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করেন। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়কে উক্তপত্রে তিনি লিখেন, "এতদিন জেলে বাস করার পর কারাশাসনের একটী অমূল্য সংস্কারের একান্ত প্রয়োজনের দিকে আমার চোখ খুলে গেছে এবং ভবিষ্যতে কারাসংস্কার আমার একটী কর্ত্তব্য হবে।" তিনি আরও লিখেন, "যতদিন জেলের মধ্যে স্বাস্থ্যকর ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার বন্দোবস্ত না হয় ততদিন কয়েদীর সংস্কার হওয়া অসম্ভব এবং ততদিন জেলগুলি আজকালকার মত নৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর না হয়ে অবনতির কেন্দ্র হয়েই থাকবে।"

সুভাষচন্দ্র নীরবে ও নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করিয়া যাইতে ভালবাসিতেন। তাঁহার সহকর্ম্মীদের ও তিনি নিষ্কাম সেবাব্রতে দীক্ষা দিয়াছিলেন। আদর্শনিষ্ঠা সুভাষচন্দ্রের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সুভাষচন্দ্র বলিতেন, "যে জাতির idealism (আদর্শ প্রীতি) আছে সে জাতি তার আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য যন্ত্রণা ক্লেশ সানন্দে বরণ করিয়া লইতে পারে। আদর্শের প্রতি আমাদের তেমন শ্রদ্ধা নাই বলিয়াই আমরা দলগত ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া মাতিয়া থাকি—স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মকলহে প্রবৃত্ত হই।" দেশের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মতবিরোধ—কর্ম্মীদের মধ্যে প্রভুত্ব বা নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব সুভাষচন্দ্রকে বড় বেশী আঘাত দিত। দক্ষিণ কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিকট এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—"আজ বাঙ্‌লার সর্ব্বত্রই কেবল দলাদলি ও ঝগড়া এবং যেখানে কাজকর্ম্ম যত কম, সেখানে ঝগড়া তত বেশী···আমি শুধু এই কথা ভাবি—ঝগড়া করিবার জন্য এতলোক পাওয়া যায়—কিন্তু মিলাইতে পারে, মীমাংসা করিয়া দিতে পারে—এরকম একজন লোকও আজ সারা বাঙ্‌লার মধ্যে পাওয়া যায় না?·· আজ বাঙ্‌লার সর্ব্বত্র কেবল ক্ষমতার জন্য কাড়াকাড়ি চলিতেছে। যার ক্ষমতা আছে—সেই ক্ষমতা বজায় রাখিতেই সে ব্যস্ত। যার ক্ষমতা নাই, সে ক্ষমতা কাড়িবার জন্য বদ্ধপরিকর। উভয় পক্ষই বলিতেছে—দেশোদ্ধার যদি হয় তবে আমার দ্বারাই হউক। নয় তো হইয়া কাজ নাই। এই ক্ষমতা-লোলুপ রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের ঝগড়া বিবাদ ছাড়িয়া নীরবে আত্মোৎসর্গ করিয়া যাইতে পারে, এমন কর্ম্মী কি বাঙ্‌লায় আজ নাই?"

"আজ বাঙ্‌লার অনেক কর্ম্মীর মধ্যে ব্যবসাদারী ও পাটোয়ারী বুদ্ধি বেশ জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহারা এখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, "আমাকে ক্ষমতা দাও—কর্ম্মচারীর পদ দাও—অন্ততঃপক্ষে কার্য্যকরী সমিতির সভ্য করিয়া দাও—নতুবা আমি কাজ করিব না।" আমি জিজ্ঞাসা করি নরনারায়ণের সেবা ব্যবসাদারীতে, contract এ কবে পরিণত হইল? আমি ত জানিতাম সেবার আদর্শ এই :—

"দাও দাও ফিরে নাহি চাও
থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।"

যে বাঙালী এত শীঘ্র দেশবন্ধুর ত্যাগের কথা ভুলিয়াছে—সে যে কতদিনের আগেকার স্বামী বিবেকানন্দের 'বীরবাণী' ভুলিবে—ইহা আর বিচিত্র কি? দুঃখের কথা, কলঙ্কের কথা, ভাবিতে গেলে বুক ফাটিয়া যায়। প্রতিকারের উপায় নাই—করিবার ক্ষমতা নাই—তাই অনেক সময় ভাবি চিঠি পত্র লেখা বন্ধ করিয়া বাহ্যজগতের সহিত সকল সম্বন্ধ শেষ

করিয়া দিই। পারিতো দেশবাসীর পক্ষ হইতে আমরা লোকচক্ষুর অন্তরালে তিলে তিলে জীবন দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাইব। তারপর মাথার উপরে যদি ভগবান থাকেন, পৃথিবীতে যদি সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তবে আমাদের হৃদয়ের কথা দেশবাসী একদিন না একদিন বুঝিবেই বুঝিবে। দেশের নামে এতবড় একটা প্রহসনের অভিনয় দেখিব—বিংশ শতাব্দীর বাঙ্‌লা দেশে যে 'Nero is fiddling while Rome is burning' কথার একটী নূতন দৃষ্টান্ত চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিবে ইহা কোনও দিন ভাবি নাই।"

"অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম—হৃদয়ের আবেগ চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। আপনাদের নিতান্ত আপনার বলিয়া মনে করি, তাই এত কথা বলিতে সাহস করিলাম। আপনারা গঠনমূলক কাজে ব্যাপৃত—আশাকরি, আপনারা এই দলাদলির পঙ্কিল আবর্ত্তে আকৃষ্ট হইবেন না।"

কাজ করিবার আগ্রহ যেখানে কম, কলহ সেখানেই বেশী। মূল লক্ষ্যের প্রতি স্থির দৃষ্টির অভাব হইলেই পথের পার্থক্য বড় হইয়া দেখা দেয়। এই জন্যই নিছক রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সুভাষচন্দ্র গঠনমূলক কর্ম্মের উপরও জোর দিতেন। "দক্ষিণ কলিকাতা সেবা সমিতি"কে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। উল্লিখিত পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমি কংগ্রেসের কাজ ছাড়িতে পারি তবুও সেবাশ্রমের কাজ ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব। দরিদ্রনারায়ণের সেবার এমন প্রকৃষ্ট সুযোগ আমি কোথায় পাইব?" সেবা সমিতির অন্যতম কর্ম্মী শ্রীমান হরিচরণ বাগ্‌চীকে এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "রাজনীতির স্রোত ক্রমশঃ যেরূপ পঙ্কিল হইয়া আসিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, অন্ততঃ কিছু কালের জন্য রাজনীতির ভিতর দিয়া দেশের কোনও বিশেষ উপকার হইবে না। সত্য, ত্যাগ এই দুইটি আদর্শ রাজনীতিক্ষেত্রে যতই লোপ পায়, রাজ-নীতির কার্য্যকারিতা ততই হ্রাস পাইতে থাকে। রাজনৈতিক আন্দোলন

নদীর স্রোতের মত কখনও স্বচ্ছ কখনও পঙ্কিল; সবদেশেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। রাজনীতির অবস্থা এখন বাঙ্‌লাদেশে যাহাই হোক না কেন, তোমরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সেবার কাজ করিয়া যাও।"

বাঙ্‌লাদেশকে তিনি যে কত গভীরভাবে ভালবাসিতেন মান্দালয় জেল হইতে লিখিত পত্র পড়িলেই তাহা সম্যক অনুভব করা যায়। বাঙ্‌লার প্রতিটি ধূলি-কণাকে তিনি নিজের জীবনের চেয়েও অধিক ভালবাসিতেন। কারবাসকালে বাঙ্‌লার নিরুপম সৌন্দর্য্য তাঁহার কবি-চিত্তে অপূর্ব্ব মনোরম হইয়া ফুটিয়া উঠিত। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্তের এক পত্রের উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আপনি লিখেছেন, "দেশ ও কালের ব্যবধান আপনাকে বাঙ্‌লা দেশের নিকট আরও প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে।" কিন্তু দেশের ও কালের ব্যবধান সোনার বাঙ্‌লাকে আমার কাছে কত সুন্দর, কত সত্য করে তুলেছে তা আমি বলতে পারি না। ৺দেশবন্ধু তাঁর বাঙ্‌লার গীতিকবিতায় বলেছেন, বাঙ্‌লার জল, বাঙ্‌লার মাটির মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। এ উক্তির সত্যতা কি এমনভাবে বুঝতে পারতুম, যদি এখানে এক বৎসর না থাকতুম? "বাঙ্‌লার ঢেউ-খেলানো শ্যামল শস্যক্ষেত্র, মধু-গন্ধবহ মুকুলিত আম্রকানন, মন্দিরে মন্দিরে ধূপ-ধুনা-জ্বালা সন্ধ্যার আরতি, গ্রামে গ্রামে ছবির মত কুটীর প্রাঙ্গন" এ সব দৃশ্য—কল্পনার মধ্যদিয়াও কত সুন্দর। প্রাতে অথবা অপরাহ্নে খণ্ড খণ্ড শুভ্রমেঘ যখন চোখের সামনে ভাসতে ভাসতে চলে যায়, তখন ক্ষণেকের জন্য মনে হয় মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মত তাদের মারফৎ অন্তরের কথা কয়েকটি বঙ্গ-জননীর চরণপ্রান্তে পাঠিয়ে দিই। অন্ততঃ বলে পাঠাই, বৈষ্ণবের ভাষায়—

'তোমারই লাগিয়া কলঙ্কের বোঝা
বহিতে আমার সুখ।'

সন্ধ্যার নিবিড় ছায়ার আক্রমণে দিবাকর যখন মান্দালয় দুর্গের উচ্চ-প্রাচীরের অন্তরালে অদৃশ্য হয়, অস্তগমনোন্মুখ দিনমণির কিরণজালে যখন পশ্চিমাংশ সুরঞ্জিত হয়ে উঠে এবং সেই রক্তিম রাগে অসংখ্য মেঘ-খণ্ড রূপান্তর লাভ ক'রে দিবালোক সৃষ্টি করে—তখন মনে পড়ে সেই বাঙ্‌লার আকাশ, বাঙ্‌লার সূর্য্যাস্তের দৃশ্য। এই কাল্পনিক দৃশ্যের মধ্যে যে এত সৌন্দর্য্য রয়েছে তা কে পূর্ব্বে জানত!

প্রভাতের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা যখন দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত ক'রে এসে নিদ্রালস নয়নের পর্দ্দায় আঘাত করে বলে, 'অন্ধ জাগো'—তখনও মনে পড়ে আর একটা সূর্য্যোদয়ের কথা, যে সূর্য্যোদয়ের মধ্যে বাঙ্‌লার কবি, বাঙ্‌লার সাধক বঙ্গজননীর দর্শন পেয়েছিল।"

পরলোকগত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এক পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, "এখানে না এলে বোধ হয় বুঝতুম না সোনার বাঙ্‌লাকে কত ভালবাসি। আমার সময়ে সময়ে মনে হয়, বোধ হয় রবিবাবু কারারুদ্ধ অবস্থা কল্পনা করেই লিখেছেন,—

"আমার সোনার বাঙ্‌লা! আমি তোমায় ভালবাসি,—
"চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী"

যখন ক্ষণেকের তরে বাঙ্‌লার বিচিত্ররূপ মানস চক্ষের সম্মুখে ভেসে উঠে, তখন মনে হয় অন্ততঃ এই অনুভূতির জন্যও কষ্ট করে মান্দালয় আসা সার্থক হয়েছে। কে আগে জানত 'বাঙ্‌লার মাটি, বাঙ্‌লার জল' বাঙ্‌লার আকাশ, বাঙ্‌লার বাতাস এত মাধুরী আপনার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে।"

সুভাষচন্দ্র লিখিয়াছিলেন "সাধারণতঃ একটা দার্শনিক ভাব বন্দীদশায় মানুষের অন্তরে শক্তির সঞ্চার করে।" কারাবাসের দীর্ঘ দুই বৎসরকাল তিনি নিজকে ভবিষ্যতের কঠিনতর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন,

আত্ম-শক্তির উদ্বোধন করিয়া তিনি অজেয় হইয়া উঠিয়াছেন। দুঃখের অন্তরে যে শক্তির উৎস সেই উৎস হইতেই তিনি শক্তি সংগ্রহ করিয়াছেন। জেলের নির্জ্জনতার মধ্যে তিনি এই শক্তির সাধনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্তকে ১৯২৬ সালের ডিসেম্বরে এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার প্রার্থনা শুধু এই—'তোমার পতাকা যারে দেও, তারে বহিবারে দাও শকতি।' যখনই জেল হইতে মুক্তির কল্পনা করি তখন আনন্দ যত হয়, তার চাইতে বেশী হয় ভয়। ভয় হয়, পাছে প্রস্তুত হতে না হতে কর্ত্তব্যের আহ্বান এসে পৌছায়। তখন মনে হয়, প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত যেন কারামুক্তির কথা না উঠে। আজ আমি অন্তরে—বাহিরে প্রস্তুত নই, তাই কর্ত্তব্যের অহ্বান এসে পৌছায় নাই। যেদিন প্রস্তুত হব সেদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমাকে কেহ আটকে রাখতে পারবে না।"

১৯২৭ সালের ৬ই এপ্রিল ইন্‌সিন্ জেল হইতে "আত্মশক্তি" সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপাল লাল সান্যালকে লিখেন, "জীবন প্রভাতে এই প্রার্থনা বুকে লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, 'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।' ভবিষ্যতের কথা মানি না, তবে এখন পর্য্যন্ত ভগবান সে প্রার্থনা সফল করিয়া আসিতেছেন। তাই আমি বড় সুখী—সময়ে সময়ে মনে হয়, আমার মত সুখী জগতে আর কয়জন আছে? এখন এই বৃত্তাকার উন্নত প্রাচীরের বাহিরে যাইবার আশা যে পরিমাণ সুদূরপরাহত হইতেছে, সেই পরিমাণে আমার চিত্ত শান্ত ও উদ্বেগশূন্য হইয়া আসিতেছে। অন্তরের মধ্যে বাস করা ও অন্তরের আত্মবিকাশের স্রোতে জীবনতরী ভাসাইয়া দেওয়ার মধ্যে পরম শান্তি আছে এবং বেশী দিন কারারুদ্ধ অবস্থায় বাস করিতে হইলে অন্তরের শান্তিই একমাত্র সম্বল, তাই সুদীর্ঘ কারাবাসের সম্ভাবনায় আমি এক অপূর্ব্ব শান্তি পাইতেছি। Emerson বলিয়াছেন, "We must

live wholly from within"—একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং এই সত্যের উপর আমার বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ়তর হইতেছে।"

সুভাষচন্দ্রের মান্দালয় বাসকালে বাংলাদেশকে অন্ধকার করিয়া ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন বাঙলার গৌরব-রবি দেশবন্ধু অস্তমিত হন। এই উপলক্ষে সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সুভাষচন্দ্রের যে পত্র বিনিময় হয়, তাহা হইতে দেশবন্ধুর প্রতি সুভাষচন্দ্রের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচয় পাই। "দেশবন্ধু করিতেন দেশের কাজ, আমরা করিতাম দেশবন্ধুর কাজ। দ্বিধাবিহীন চিত্তে কায়মনোবাক্যে তাঁহার আদেশ পালন করিয়া যাওয়াই ছিল আমাদের একমাত্র কাজ।" দেশবন্ধুর মৃত্যুতে সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্র মাসিক বসুমতীতে 'স্মৃতিকথা' লিখেন। শরৎচন্দ্রের স্মৃতি কথা পড়িয়া সুভাষচন্দ্র তাঁহাকে লিখেন, "যাঁহারা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিল তাঁদের মনের মধ্যে কতগুলি গোপন ব্যথা রয়ে গেল। আপনি সে গোপন ব্যথার কয়েকটির উল্লেখ করে শুধু যে সত্য প্রকাশ করবার সহায়তা করেছেন তা নয়, আপনি আমাদের মনের বোঝাটাও হালকা করেছেন। বাস্তবিক "পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে মুক্তি সংগ্রামে বিদেশীয়দের অপেক্ষা দেশের লোকদের সঙ্গেই মানুষকে লড়াই করিতে হয় বেশী।" এই উক্তির নিষ্ঠুর সত্যতা তাঁর অনুগামী কর্ম্মীরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে এবং এখনও বুঝছে।" আপনি এক জায়গায় লিখেছেন— "লোক নাই, অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজ নাই, অতি ছোট যাহারা তাহারাও গালিগালাজ না করিয়া কথা কহে না। দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা!" সেদিনকার কথা এখনও আমার মনে স্পষ্ট অঙ্কিত আছে। আমরা যখন গয়া কংগ্রেসের পর কলিকাতায় ফিরি তখন নানা-প্রকার অসত্যে এবং অর্দ্ধসত্যে বাঙ্লার সংবাদপত্রগুলি ভরপুর। আমাদের স্বপক্ষে ত কথা বলেই নাই, এমন কি আমাদের বক্তব্যও তাদের কাগজে স্থান দিতে চায় নাই। তখন স্বরাজ্য-ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ। যখন

অর্থের খুব প্রয়োজন তখন অর্থ পাওয়া যায় না। যে বাড়ীতে একসময়ে লোক ধরত না, সেখানে কি বন্ধু, কি শত্রু কাহারও চরণধূলি আর পড়ে না। কাজেই আমরা কয়েকটী প্রাণী মিলে আসর জমাতুম। পরে যখন সেই বাড়ীর পূর্বগৌরব ফিরে এল, বাহিরের লোক এবং পদপ্রার্থীরা যখন এসে আবার সভাস্থল দখল করল, তখন আমরা কাজের কথাও বলবার সময় পাই না। কত পরিশ্রমের ফলে, কি রকম হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে ভাণ্ডারে অর্থ সঞ্চয় হল, নিজেদের ঘরের কাগজ প্রকাশিত হল এবং জনমত অনুকূলদিকে ফেরানো হল তা বাহিরের লোক জানে না, বোধ হয় কোনদিন জানবেও না। কিন্তু এই যজ্ঞের যিনি ছিলেন হোতা, ঋত্বিক, প্রধান পুরোহিত, যজ্ঞের পূর্ণ সমাপ্তির আগেই তিনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ভিতরের আগুন, বাহিরের কর্ম্মভার এই দুয়ের চাপ তাঁর পার্থিব দেহ আর সহ্য করতে পারল না।” দেশবন্ধুর জীবন-চরিত প্রণেতা শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে তিনি লিখেন, “মন্ত্রং বা সাধয়েয়ম্ শরীরং বা পাতয়েয়ম্” এই বাণী দেশবন্ধুর হৃদয়ের মধ্যে গাথা ছিল। তিনি দুর্ব্বার বিক্রমে যখন যে পথে চলিতেন কেহ তাঁহাকে রোধ করিতে পারিত না। সমুদ্রের তরঙ্গায়িত জলরাশির ন্যায় সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনার বেগে আপন আদর্শের পানে ছুটিতেন। প্রিয়জনের আর্ত্তনাদ অথবা অনুচরবর্গের সাবধান বাণীও তাঁহাকে ফিরাইতে পারিত না। এই দিব্যশক্তি দেশবন্ধু কোথা হইতে পাইলেন ? সে শক্তি কি সাধনার দ্বারা লভ্য ?

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দেশবন্ধু শক্তির সাধক হইলেও তিনি তন্ত্রমতে শক্তির সাধনা করেন নাই। তাঁহার প্রাণ ছিল বড়; আকাঙ্ক্ষা ছিল বড়। ‘যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি” এই কথা যেন তাঁহার অন্তরের বাণী ছিল। তিনি যখন যাহা চাহিতেন সমস্ত প্রাণ মন বুদ্ধি দিয়া চাহিতেন। তাহা পাইবার জন্য একেবারে পাগল হইয়া যাইতেন।

পর্ব্বত প্রমাণ অন্তরায় ও তাঁহাকে ভীত বা পশ্চাৎপদ করিতে পারিত না। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট যেরূপ এক সময়ে তাঁহার সম্মুখে আল্‌পস্‌ পর্বত দেখিয়া বলিয়াছিলেন "There shall be no Alps"—আমার সম্মুখে আল্পস পর্ব্বত দাঁড়াইতে পারিবে না, দেশবন্ধুও সেইরূপ সকল বাধা-বিঘ্নকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। কি সম্বল লইয়া তিনি 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা প্রকাশে ও কাউন্সিলজয়ের চেষ্টায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, এ সংবাদ যিনি জানেন তিনিই এই উক্তি সমর্থন করিবেন। আমরা কোনও প্রকার অসুবিধা বা বাধার কথা তুলিলে তিনি ধমক দিয়া বলিতেন—তোমরা একেবারে Pessimist (নৈরাশ্যবাদী)। আমারও কাজ ছিল যেখানে কোন বিপদ বা অসুবিধার আশঙ্কা—সেই কথাটি তুলিয়া ধরা, তাই তিনি প্রায়ই বলিতেন,—"you young old men"—ওহে অকালবৃদ্ধ যুবকবৃন্দ। যাঁহারা মনে করেন যে, দেশবন্ধু অন্তরে নরমপন্থী ছিলেন কেবল যুবকদের পাল্লায় পড়িয়া তিনি ইচ্ছার বিরুদ্ধে চরমপন্থীর ন্যায় কাজ করিতেন, তাঁহারা তাঁহার স্বভাব ও প্রকৃতির সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন চিরতরুণ। তিনি তরুণদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারিতেন, তাঁহাদের সুখ-দুঃখ অনুভব করিতে পারিতেন। তিনি তরুণদের সঙ্গ ভালবাসিতেন, তাই তরুণরাও তাঁহার পার্শ্ব ছাড়িতে চাহিত না। এই সব কারণে আমি পূর্ব্বে দেশবন্ধুকে "তরুণের রাজা" বলিয়াছি।"

এগার

সুভাষচন্দ্রের মুক্তিতে সমগ্র দেশ আনন্দ-চঞ্চল হইয়া উঠে। মুক্তিলাভের পর রোগশয্যা হইতে সুভাষচন্দ্র দেশবাসীর নিকট বাণী প্রদান প্রসঙ্গে বলেন, *"এখন আমি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। যাহাতে আমি শীঘ্র কার্য্য* আরম্ভ করিতে পারি তজ্জন্য এখন আমার প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য হইবে পূর্ব্বস্বাস্থ্য লাভের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা... .. আমি আশা করি, আমি দ্রুত নিরাময় হইয়া উঠি আমার দেশবাসী ইহাই কামনা করিবেন। কারণ তাহা হইলে আমি সকল অভীষ্টকার্য্যে পুনরায় মন-প্রাণ নিয়োগ করিতে পারিব।" তাঁহার মুক্তিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে যে সমস্ত আনন্দ-সূচক পত্র আসিতে থাকে তদুত্তরে সংবাদ পত্রের মারফৎ তিনি বলেন, "সম্মুখে কিছুকাল বিশ্রাম ও অবসরের যে সময় রহিয়াছে সে সময় আমি অহর্নিশি ভগবানের চরণে এই প্রার্থনাই করিব যে, দেশবাসী আমার প্রতি যে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভালবাসা অর্পণ করিয়াছেন, আমি যেন কিয়দংশেও তাহার যোগ্য হইতে পারি। এখন আমার প্রধান কাজ হইবে, আমাদের সম্মুখে যে সমস্যা রহিয়াছে, তাহার সমাধান কল্পে আমি যেন নিভৃতে প্রস্তুত হইতে পারি।"

"চতুর্দ্দিকেই নবজাগরণের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। পূজনীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের আকস্মিক মহাপ্রয়াণের পর যে ঘনান্ধকার আমাদিগকে আবৃত কারয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ অপসারিত হইতেছে—যাহা এখনও আছে. তাহার মধ্যেও নবপ্রভাতের নবীন সূর্য্যের তরুণ আভা দেখা যাইতেছে।"

"সময় নিকট হইলে, কর্ম্মের আহবান আসিলে যেন আমরা সকলেই একাগ্রচিত্তে পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করিতে পারি—আজ ইহাই আমার

একান্ত প্রার্থনা।" কিন্তু বিশ্রাম গ্রহণ তাঁহার স্বাস্থ্যের দিক হইতে অবশ্য কর্ত্তব্য হইলেও বিশ্রাম গ্রহণ আর হইয়া উঠিল না। অন্তরে যাঁহার কর্ম্মোন্মাদনা, দেশের ডাক যাঁহার কানে পৌছিয়াছে, সে কি ঘরে বসিয়া বিশ্রাম করিতে পারে? পাটনায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের অসুস্থ থাকা সাজে না।" তিনি পুনরায় কর্ম্মসাগরে ঝাঁপ দিলেন।

দেশবন্ধুর পরলোকগমনে বাঙলার রাজনীতির তরণী কর্ণধারবিহীন হইয়া পড়ে। দেশবন্ধুর শূন্য আসন পূর্ণ করিবার মত নেতা একমাত্র সুভাষচন্দ্রই। সুতরাং বাঙলাদেশবাসী তাঁহাকেই প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতিপদে বরণ করিলেন। সেই হইতে সুভাষচন্দ্রের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ হয়। মুক্তির ছয়মাসের মধ্যেই মাদ্রাজে ডাঃ আনসারীর সভাপতিত্বে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সেখানে বাঙলার প্রতিনিধি দল দেশবন্ধুর যোগ্য উত্তরাধিকারীর নেতৃত্বে উপস্থিত হন। মাদ্রাজ অধিবেশনে পণ্ডিত জওহরলালের সহিত সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী পদে নির্ব্বাচিত হন।

১৯২৮ সাল কংগ্রেস আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরনীয় হইয়া আছে। এই বৎসর কংগ্রেসের অভ্যন্তরে তরুণ ও প্রবীনদলের মধ্যে বিশেষ বিরোধ উপস্থিত হয়। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে সভাপতি করিয়া "নেহরু কমিটি" গঠিত হইল। এই কমিটি এক বৎসরের মধ্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন দাবী করিলেন। তরুণ দল পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী। তাঁহারা 'নেহরু কমিটির' সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। পণ্ডিত জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র এই তরুণ দলের অবিসম্বাদী নেতা। এই পর্য্যন্ত কংগ্রেসের মধ্যে এই দুইজন নেতা—বিশেষ করিয়া সুভাষচন্দ্রই—অগ্রগামী চিন্তা ও কর্মপন্থা প্রবর্ত্তনের জন্য সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন।

এই বৎসরই স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে বিলাতের "সাইমন কমিশন" ভারত পরিদর্শনে আসেন। এই "সাইমন কমিশন" বিলাতের কয়েকজন ইংরেজ সদস্য লইয়া গঠিত হয়। একজন ভারতীয়কেও এই কমিশনে গ্রহণ করা হয় নাই। ইহাতে ভারতের সর্ব্বত্র তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। *১৯২৭ সালের মাদ্রাজ কংগ্রেসেই "সাইমন কমিশন" নিয়োগে গভর্ণমেণ্টের* কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিয়া গৃহীত এক প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয়—"This congress resolve that the only self-respecting course for India to adopt is to boycott the Commission at every stage and in every form." ৩রা ফেব্রুয়ারী "সাইমন কমিশন" বোম্বায়ে পদার্পণ করেন। ঐ দিন সমগ্র ভারতে "সাইমন ফিরিয়া যাও" বলিয়া তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় ও সর্ব্বত্র হরতাল প্রতিপালিত হয়। মাদ্রাজ, কলিকাতা, লাহোর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে বিক্ষোভকারীদের উপর লাঠি চার্জ্জ ও গুলীচালনা হয়। অবশেষে ৩১শে মার্চ্চ "সাইমন কমিশন" বোম্বাই পরিত্যাগ করেন। বাঙ্‌লাদেশে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বয়কট আন্দোলন সাফল্যের সহিত পরিচালিত হয়।

এই উপলক্ষে দেশের সর্ব্বত্র বিরাট উদ্দীপনা ও সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি পরিলক্ষিত হয়। এই বৎসর মে মাসে পূণাতে মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে গিয়া সুভাষচন্দ্র দেশের যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ, উদ্দীপনা ও কর্ম্মচাঞ্চল্য প্রত্যক্ষ করেন। এই সম্মেলনে তিনি যুবসম্প্রদায় ও কংগ্রেসকর্মীদিগকে কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করিবার নির্দ্দেশ দেন; ব্যাপক ছাত্র-আন্দোলনের জন্য তিনি ছাত্রসমাজকে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার পরামর্শ দেন। কৃষক-শ্রমিক-যুবক-তরুণ দলকে নিয়া ব্যাপক গণ-আন্দোলনের এই নবতর কর্মপন্থা প্রচারেই তিনি এই সময়ে বিশেষ ভাবে নিযুক্ত থাকেন। বিখ্যাত মার্কিণ সংবাদিক ডরথি টমসন তাঁহার হিটলার

সম্বন্ধীয় এক প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন, 'হিটলারকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখাই এক মারাত্মক ভুল হইয়াছে, কারণ এই কারাগৃহেই তিনি জার্মেনীর জন্য লেবেনসরম (Lebensaraum) বা পর্য্যাপ্তবাসভূমি দাবী করার বিষয় চিন্তা করেন এবং উত্তরকালে জার্মানদের উপযুক্ত বাসস্থানের জন্যই হিট্‌লার সমগ্র বিশ্বকে জার্মেনীর করতলগত করিতে চাহিয়াছিলেন।' নাৎসীনায়ক হিটলারের সহিত সুভাষচন্দ্রের তুলনা না করিয়াও বলা চলে, যে সুভাষচন্দ্রকে মান্দালয়ে বন্দী করিয়া কর্তৃপক্ষ মহাভুলই করিয়াছিলেন। কেননা এই মান্দালয় কারাগৃহে বসিয়াই তিনি দেশের যুবক, শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের কথা ভাবিতে আরম্ভ করেন এবং কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যুবক শ্রমিক ও কৃষকদের সংঘবদ্ধ করিয়া একটি সংগ্রামশীল 'বামপক্ষ' গঠনের সঙ্কল্প করেন। মান্দালয় জেলে উদ্ভাবিত এই কর্মপন্থাই তিনি মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে দেশবাসীর নিকট ঘোষণা করেন।

এদিকে সর্দ্দার প্যাটেলের নেতৃত্বে বার্দ্দোলির কিষাণেরা খাজানা দিতে অস্বীকার করিয়া এক আন্দোলন সুরু করে। সুভাষচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল এই সুযোগে দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনের সৃষ্টি করা। কিন্তু কংগ্রেসের প্রবীন নেতারা তখনও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে পা বাড়াইতে নারাজ। কলিকাতায় নিখিল ভারত যুব-সঙ্ঘের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে তিনি সর্ব্বপ্রথম গান্ধী-নীতির সমালোচনা করেন ও দেশবাসীর নিকট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আদর্শ প্রচার করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন "There is absolutely no doubt that if the Congress Working Committee had taken courage in both hands, they could have anticipated the movement of 1930 by two years and the appointment of the Simon Commission could have made the starting point of such movement."

এই সময়েই সুভাষচন্দ্র বাঙলায় "স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলন" আরম্ভ করেন। ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশন উপলক্ষে সেচ্ছা-সেবক-বাহিনা গঠনে তিনি অনন্যসাধারণ কর্ম্ম-কুশলতার পরিচয় প্রদান করেন। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক রূপে তিনি সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে বিরাট সমারোহের সহিত সম্বর্দ্ধনা করেন। সভাপতির সম্বর্দ্ধনা কালে যে বিরাট শোভাযাত্রার আয়োজন হইয়াছিল ভারতের জাতীয় ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। জাতীয় পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানও মহাড়ম্বরে নিষ্পন্ন হয়। কলিকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র "নেহরু কমিটি"র প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, "এই প্রস্তাবের অর্থ এই যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যদি নেহেরু কমিটি রচিত শাসনতন্ত্র ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বা তৎপূর্ব্বে মানিয়া লয় তাহা হইলে কংগ্রেস উহা গ্রহণ করিবে এবং তদ্দ্বারা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনই স্বীকার করিয়া লইবে। কিন্তু আমরা কখনও সেই অবস্থা মানিয়া লইতে পারি না। 'স্বাধীনতা' আমরা চাই—এই 'স্বাধীনতা' আমাদের সুদূর ভবিষ্যতের আদর্শ নহে—স্বাধীনতা বর্ত্তমানেই আমাদের দাবী।"* পণ্ডিত মতিলালের

* সুভাষচন্দ্র ও পণ্ডিত জওহরলাল উভয়েই নেহরু কমিটিতে ছিলেন—এমন কি নেহরু রিপোর্টে তাঁহারা স্বাক্ষরও করিয়াছিলেন। পরে কংগ্রেসের অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রকে নেহরু রিপোর্টের বিরোধিতা করিয়া এক সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে দেখিয়া তাঁহার এইরূপ বিসদৃশ আচরণে অনেকেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্র ইহার যে কৈফিয়ত দেন তাহা এই:—"I have been asked by my friends why I, being a signatory to the Nehru Report, have stood up to speak for independence. I would only refer to the statement made in the body of the report where it is said that the principles of the constitution which we have submitted in the report can be applied in all the entirety to a coustitution of independence. I do not think that in moving this amendment my action can be construed as in any way inconsistent."

সমর্থকেরা কিন্তু নেহেরু কমিটির সুপারিশ হইতে অধিকদূর অগ্রসর হইতে চাহিলেন না। অধিবেশন মণ্ডপে জওহরলালের সহিত মতিলালের বাগবিতণ্ডা হইয়া যায়। শেষ পর্য্যন্ত গান্ধীজী উভয়দলকে সন্তুষ্ট করিয়া এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব আনয়ন করেন যে, বৃটিশ পার্লামেণ্ট যদি ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে নেহেরু কমিটির সুপারিশ না মানিয়া লয় তবে কংগ্রেস অহিংস অসহযোগ সংগ্রাম সুরু করিবে। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের মতে "The maximum concession which they could make fell short of the minimum demand of the left wingers." সুভাষচন্দ্র পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করিয়া এক সংশোধন প্রস্তাব আনয়ন করেন। তাঁহার প্রস্তাবটি এই :—"কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতা ভারতীয় জনগণের আদর্শ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। কংগ্রেস সেই পূর্ব্ব সিদ্ধান্তে অটল থাকিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, ব্রিটেনের সহিত সম্পূর্ণ ভাবে সম্পর্কচ্ছেদ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব।" এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া তিনি বলেন, "হয়ত আপনারা বলিবেন যে স্বাধীনতার এই প্রস্তাব করিয়া আমাদের কি লাভ হইবে? ইহার উত্তরে আমি বলিব, ইহা দ্বারা আমাদের এক নূতন মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠিবে। রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ কি? আমাদের বর্ত্তমান মনোবৃত্তিই উহার কারণ। এই হীন মনোবৃত্তির কোনরূপ পরিবর্ত্তন যদি আপনাদের কাম্য হয়, তাহা হইলে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের আদর্শ দেশবাসীর মনে সঞ্চার করিতে হইবে। যদি ইহাও ধরিয়া লওয়া হয় যে, আমরা কার্য্যতঃ পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ অনুসরণ করিব না সত্য, কিন্তু দেশবাসীর নিকট অকপট ভাবে এই আদর্শ প্রচার করিব তাহা হইলেও আমরা এক নূতন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত তরুণ সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিব। আমি আপনাদিগকে জানাইতেছি যে, আমরা হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিব না। দেশের তরুণেরা তাহাদের

দায়িত্ব বুঝিয়াছে, কাজের জন্যও প্রস্তুত হইয়াছে। আমাদের কর্ম্মপন্থা আমরা নিজেরা স্থির করিব এবং যাহাতে আমাদের প্রস্তাব উপেক্ষাভরে আবর্জ্জনাপাত্রে নিক্ষিপ্ত না হয়, এজন্য আমরা যথাশক্তি ঐ কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিয়া কাজ করিব। আপনারা ইহা নিশ্চয়ই জানেন যে বাঙ্‌লাদেশে জাতীয় আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত হইতেই আমরা স্বাধীনতা অর্থে পূর্ণ স্বাধীনতা বুঝিয়াছি। উহার অর্থ আমরা কখনও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বুঝি নাই। আমাদের দেশের শত শত শহিদের আত্ম-বিসর্জ্জনে, কবির বাণীতে আমরা পূর্ণ স্বাধীনতারই স্বপ্ন দেখিয়াছি। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথায় আমাদের দেশবাসীর অন্তঃকরণে বিশেষ করিয়া তরুণদের চিত্তে এতটুকুও উৎসাহের সৃষ্টি হইবে না। আজ তরুণদের কথাই বিশেষ করিয়া ভাবিতে হইবে—ইহারাই দেশের ভবিষ্যৎ।”* এই সংশোধন প্রস্তাবের সমর্থনে পণ্ডিত জওহরলাল এক ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সুভাষচন্দ্রের সংশোধন প্রস্তাবটি ১৩৫০-৯৭৩ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। জাতীয় মহাসভার অধিবেশন শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় “হিন্দুস্থান সেবাদল” সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেন। তিনি বলেন, পৃথিবীর সবদেশের ইতিহাসেই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী

* প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র যে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন তাহার প্রারম্ভেই তিনি বলেন, "I am sorry that I have to rise to move an amendment to a resolution moved by Mahatma Gandhi and which has the support of some, if not many, of our elder leaders. The fact that I rise to-day to move the amendment is a clear indication of a cleavage, the fundamental cleavage between the elder school and the new school of thought in the Congress (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

জাতীয় সংগ্রামে মুক্তিফৌজের কাজ করে—ভারতবর্ষে তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। ইহার পরেই সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল ও শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রমুখ পূর্ণ-স্বাধীনতাবাদী নেতৃবর্গ কংগ্রেসের অভ্যন্তরে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ প্রচারের জন্য "স্বাধীনতা সঙ্ঘ" গঠন করেন।

১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে বাঙ্‌লার গভর্ণর হঠাৎ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ভাঙ্গিয়া দিলেন। তাঁহার এইরূপ আচরণের দ্বারা তিনি স্বরাজ্যদলকে শক্তি পরীক্ষায় আহ্বান করিতেছেন বুঝা গেল। সুভাষচন্দ্রও অসীম সাহস ও ঐকান্তিক দৃঢ়তার সহিত এই আহ্বান গ্রহণ করিলেন। ১৯২৯ সালের জুনমাসে যে নির্ব্বাচন হইল তাহাতে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীরাই বিপুল ভোটাধিক্যে নির্ব্বাচিত হইলেন। এই বৎসর আগষ্ট মাসে "নিখিল ভারত লাঞ্ছিত রাজনৈতিক কর্মী দিবস" পালন উপলক্ষে দক্ষিণ কলিকাতায় এক শোভাযাত্রা পরিচালন করিতে গিয়া সুভাষচন্দ্র রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। যখন গ্রেফ্‌তারী পরওয়ানা জারী হয় সুভাষচন্দ্র তখন পাঞ্জাবে ছিলেন। পাঞ্জাব হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে উপস্থিত হইলেন। মামলার বিচারসাপেক্ষ তাঁহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। তখন হইতে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশন পর্য্যন্ত তিনি জামিনে মুক্ত ছিলেন।

১৩ই সেপ্টেম্বর লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী যতীন দাস লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে ৬৩ দিন অনশনের পর প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃতদেহ কলিকাতায় আনীত হইলে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে যে শোভাযাত্রা বাহির হয়, দেশবন্ধুর শবযাত্রা ছাড়া সেরূপ বিরাট শব শোভাযাত্রা আর হয় নাই। ২৯শে সেপ্টেম্বর সুভাষচন্দ্র হাওড়া রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯শে অক্টোবর তিনি লাহোরে পাঞ্জাব ছাত্র সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন। তিনি অভিভাষণে বলেন, "আজিকার ছাত্র আন্দোলন দায়িত্বহীন যুবক

যুবতীর একটা লক্ষ্যহীন অভিযান নহে। দায়িত্বশীল কর্ম্মক্ষম যে সকল যুবক-যুবতী চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন করিয়া দেশের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে চান, ইহা তাহাদেরই অন্দোলন।" "স্বাধীনতার কোনও সহজ নিরাপদ পথ নাই। স্বাধীনতার পথে যেমন আঘাত-বিপদ আছে, তেমনি গৌরব ও অমরত্বও আছে। প্রাচীনের যাহা কিছু শৃঙ্খলের মত আমাদের চলাকে প্রতিপদে প্রতিহত করিয়া আসিতেছে, আজ তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তীর্থযাত্রীর মত দলে দলে স্বাধীনতার লক্ষ্যপথে যাত্রা করিতে হইবে। স্বাধীনতাই জীবন; স্বাধীনতার সন্ধানে জীবনদানে অবিনশ্বর গৌরব। আসুন আজ আমরা সম্মিলিত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করি—সেই উদ্যমে জীবনপাত করিয়া আমরা মৃত্যুঞ্জয়ী যতীন্দ্রনাথের স্বদেশবাসী হইবার যোগ্যতা লাভ করি।" তিনি আরও বলেন, "জীবনের একটি মাত্র উদ্দেশ্য আছে। তাহা হইল সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি। স্বাধীনতার জন্য উদগ্র আকাঙ্ক্ষাই হইতেছে জীবনের মূল সুর। সদ্যোজাত শিশুর প্রথম ক্রন্দনধ্বনিই তো বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণা। আপনাদের নিজেদের প্রাণের এবং দেশবাসীর প্রাণে স্বাধীনতার এই তীব্র আকাঙ্ক্ষাটী জাগাইয়া তুলুন। তাহা হইলে ভারতবর্ষ অল্পদিনের মধ্যেই স্বাধীনতা লাভ করিবে।"

"ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবেই, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। রাত্রির পর যেমন দিন আসিবেই তেমনি ইহাও আসিবে। ভারতবর্ষকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে, এমন কোনও শক্তি এ পৃথিবীতে আজ নাই। কিন্তু আসুন এমন মহীয়সী ভারতের ধ্যানচিত্র আজ আমরা গড়িয়া তুলি, যাহার জন্য জীবনসর্ব্বস্বধন বলি দিয়া আমরা ধন্য হইতে পারি।" "স্বাধীনতা বলিতে আমি বুঝি সমাজ ও ব্যক্তি, নর ও নারী, ধনী ও দরিদ্র সকলের জন্য স্বাধীনতা। শুধু ইহা রাষ্ট্রীয় বন্ধন মুক্তি নহে, ইহাতে অর্থের সমান

বিভাগ, জাতিভেদ ও সামাজিক অবিচারের নিরাকরণ ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামী বর্জ্জনও বুঝায়।”

১লা ডিসেম্বর অমরাবতীতে সুভাষচন্দ্র মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ছাত্র-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলেন, “আমরা যে নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিতে চাই সেই সমাজের গোড়ার কথা হইবে—সকলের জন্য সমান অধিকার, সমান সুযোগ, ঐশ্বর্য্যের উপর সকলের সমান অধিকার, বৈষম্যমূলক সামাজিক বিধানের উচ্ছেদ, জাতিভেদ প্রথার বিলোপ এবং বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্তি।”

“আমি যে স্বপ্ন ভালবাসি সে হইতেছে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন; আপনার প্রভায় গৌরবান্বিত সমুজ্জ্বল ভারতের স্বপ্ন। আমি চাই—এই ভারত তাহার নিজ সংসারের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী হউক, তাহার ভাগ্যনিয়ন্ত্রনের ভার তাহারই হস্তগত হউক। আমি চাই এদেশে একটা স্বাধীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হউক। তাহার সৈন্য, তাহার নৌবল, তাহার বিমান পোত, তাহার সমস্তই স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র হউক। আমি চাই পৃথিবীর স্বাধীনদেশ সমূহে স্বাধীন ভারতের দূত প্রেরণ করা হউক। আমি দেখিতে চাই—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যাহা কিছু মহত্তর তাহারই গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া এই ভারত-মাতা, সমগ্র জগতের সমক্ষে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনীরূপে দণ্ডায়মান হউক। আমি চাই—এই ভারত দেশে দেশে পরিপূর্ণ সত্যের বাণী, সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার বাণী প্রেরণ করুক।”

বার

সুভাষচন্দ্রের সমগ্র জীবন আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, তিনি যৌবন-শক্তির মূর্ত্ত প্রতীক—অজানার সন্ধানে 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' করিয়া বাহির হইয়া পড়া, পুরাতনকে ধ্বংস করিয়া নূতনের প্রতিষ্ঠা করা ও উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সমস্ত বাধা-বিঘ্ন চূর্ণ করিবার দুর্জ্জয় সংকল্প লইয়া জীবনপথে অগ্রসর হওয়া—ইহাই যদি যৌবনের ধর্ম হয়, তবে সুভাষচন্দ্রের জীবনে যৌবনের এই রূপ পূর্ণভাবে মূর্ত্ত হইয়াছে নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে হইবে। কর্মক্ষেত্রে ও দেখিতে পাই, তরুণ ও যুব সম্প্রদায়ের সহিত আজীবন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া যুব সম্প্রদায়কে মহৎ আশা ও আকাঙ্ক্ষায় তিনি যেভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, সমসাময়িক অন্য কোন জননায়কের জীবনে সেইরূপ দৃষ্ট হয় না। ভারতব্যাপী যুব-আন্দোলনের সর্ব্বভারতীয় নেতা হিসাবে যদি কাহারও নাম করিতে হয়, তবে সুভাষচন্দ্রের নামই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। তরুণ সমাজের এই আদর্শ নেতা সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারা ও পথনির্দ্দেশ ভারতের যুব আন্দোলনের প্রসার ও অগ্রগতির পথে বিশেষ সহায়ক হইবে ও প্রবর্ত্তনা যোগাইবে। তাই ছাত্র ও যুব আন্দোলন সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের বাণী, নির্দেশ ও মতামত আলোচনা করিয়া তরুণের চলারপথ যথোপযুক্তভাবে নির্দ্দিষ্ট করা আজিকার দিনে বিশেষ প্রয়োজন।

১৯২৯-৩০ সালে সুভাষচন্দ্র ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু ছাত্র ও যুব সম্মেলনে সভাপতি হইয়া ভারতবর্ষের ছাত্র ও যুব আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হন। সে সময় তিনি নিখিল ভারত জাতীয় মহাসমিতির সাধারণ সম্পাদক ও নিখিল ভারত ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। দেশের যুব-শক্তি সুভাষচন্দ্রের সঞ্জীবনী বাণীর দুর্বার

উদ্দীপনায় প্রাণ-চঞ্চল হইয়া উঠিল—এই বিপ্লবী নেতার চিন্তা ও কর্মে দেশের যুবক সম্প্রদায় সত্যিকারের পথনির্দ্দেশ পাইল। যুব-অন্দোলন কেবল স্বাধীনতা-সংগ্রামেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না। রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইলেই যুব আন্দোলনের প্রয়োজন নিঃশেষ হইবে না। যুব আন্দোলনের কাজ জাতি গঠনের কাজ—বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্রের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যষ্টির জীবনকে আদর্শানুগ ও সমাজনিষ্ঠ করিয়া গঠন করা—কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, চরিত্রবত্তা ও আত্মত্যাগের মহণীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত সুস্থ ও বলিষ্ঠ সমাজ-জীবন গড়িয়া তোলা। যুব আন্দোলন কেবল রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার বন্ধন হইতেই মুক্তি দিবে না—ব্যক্তি ও সমাজকে সর্বপ্রকার বাঁধা-বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া আত্মবিকাশ ও সার্থকতার পথে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে। জাতীয় জীবনে যুব আন্দোলনের প্রয়োজন অপরিসীম। ইহা তথাকথিত রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে স্বতন্ত্র—ইহার বিশেষ আদর্শ আছে, স্বতন্ত্র কর্মপ্রণালী আছে। ইহার সমগ্রতার মধ্যে জীবনের সকল ভিন্ন ভিন্ন দিক-গুলিই রহিয়াছে। যে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন আমরা দেখি, সেখানে সকলেই মুক্ত—ব্যক্তি মুক্ত, সমাজ মুক্ত, সেখানে মানুষ রাষ্ট্রীয় বন্ধন হইতে মুক্ত, সামাজিক বন্ধন হইতে মুক্ত, অর্থনৈতিক বন্ধন হইতে মুক্ত। কাব্য, সাহিত্য, শিল্পকলা, দর্শন, বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যায়াম-ক্রীড়া, সমাজ ও রাষ্ট্র—এই সবের মধ্যে দিয়া জাতীয় জীবনের বিকাশ হইয়া থাকে। এই সবের ভিতর দিয়াই তরুণ-প্রাণের আত্ম-প্রকাশ ঘটে। প্রাণ যখন জাগে তখন সহস্রধারায় নিজেকে প্রকাশ করে। শরীরে স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিলে প্রত্যেক অঙ্গে যেরূপ অপূর্ব্বশ্রী ফুটিয়া ওঠে তেমনি মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যখন জাতির অন্তরে জাগিয়া উঠে তখন তাহা সব দিক দিয়াই ফুটিয়া বাহির হয়। কংগ্রেস মূলতঃ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ইহার উদ্দেশ্য সংকীর্ণ না হইলেও সীমাবদ্ধ। তাই যাহারা জীবনকে সমগ্ররূপে দেখিতে চায় তাহারা কংগ্রেসের ন্যায় শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে

পারিবে না। যুব-আন্দোলন এই অভাব পূর্ণ করিবে। যুব-আন্দোলনের বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য এখানেই।

যুব-আন্দোলনের পরিধি জীবনের মতই ব্যাপক। শরীরকে সঞ্জীবিত করিতে হইলে আমাদিগকে ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যায়াম করিতে হইবে—হৃদয়কে মুক্ত ও নবশিক্ষাদ্বারা উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে নূতনতর সাহিত্য, উচ্চতর ও উৎকৃষ্টতর শিক্ষাপ্রণালী ও সুদৃঢ় নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—সমাজকে নবজীবন দান করিতে হইলে চিরাচরিত আচার ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করিয়া নূতন সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও বলিষ্ঠ ভাবধারার প্রবর্তন করিতে হইবে। যুগোচিত আদর্শের আলোকে বর্ত্তমান সামাজিক ও নৈতিক ব্যবস্থা ও বিধানসমূহ যাচাই করিয়া লইতে হইবে—এইরূপ নৈতিক ও সামাজিক আদর্শের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে যাহা ভবিষ্যতের পথকে সুনির্দ্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত করিবে।

যুব-অন্দোলন বর্ত্তমানের প্রতি অসন্তোষের প্রতীক। যুগ-সঞ্চিত সংস্কারের মোহবন্ধন, পথনিরোধকারী আচার ও বিধানের নাগপাশ, স্বেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইহা একটি বিশিষ্টরূপ। সকল শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানবের অফুরন্ত সৃজনীশক্তির স্বাভাবিক বিকাশ লাভের সহজ পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া মানব জাতির জন্য নূতনতর জগতের প্রতিষ্ঠাই ইহার লক্ষ্য। অতীতের ও বর্ত্তমানের দুর্লঙ্ঘ্য বাঁধা অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতের পানে, সম্মুখের দিকে ছুটিয়া চলা, সুদূরের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করা—ইহাই যৌবন-ধর্ম। যুব-আন্দোলনের প্রকৃতিগত এই বৈশিষ্ট্যটি না থাকিলে কেবলমাত্র যুবক-যুবতীর সংঘ হইলেই কোন প্রতিষ্ঠান যুবক-সমিতি আখ্যা পাইতে পারে না। যুব-সমিতিকে সেবা-সমিতির নামান্তর বলিয়া মনে করিলেও ভুল হইবে—কংগ্রেস কমিটির নাম ও label পরিবর্ত্তন করিয়া যুব-সমিতি গঠন করিলে চলিবে না। যুব-আন্দোলন দায়িত্বজ্ঞানহীন যুবক-যুবতীর লক্ষ্যহীন

অভিযান নহে। দায়িত্বশীল কর্মক্ষম যে সকল তরুণ-তরুণী চরিত্র সুগঠিত করিয়া দেশের কাজে নিজেকে বিলাইয়া দিতে চায়, ইহা তাহাদেরই আন্দোলন। নূতন সমাজ, নূতন রাষ্ট্র, নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা, মানুষের মধ্যে নূতন ও উচ্চতর আদর্শনিষ্ঠা জাগাইয়া তোলা যুব অন্দোলনের উদ্দেশ্য। এই অশান্ত, অসন্তুষ্ট, বিদ্রোহী মন যার আছে, যে ব্যক্তি বর্ত্তমান ও বাস্তবের অবগুণ্ঠন সরাইয়া মহত্তর ও সমৃদ্ধতর জীবনের দৃষ্টি ও আস্বাদ পাইয়াছে, সেই ব্যক্তিই যুব-অন্দোলনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে এবং যুবক সমিতি গঠনের অধিকারী হইয়াছে। যে প্রতিষ্ঠান বা অন্দোলনের মূলে স্বাধীন চিন্তা বা নূতন প্রেরণা নাই তাহা তরুণের প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলন বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না।

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শরীরগত ও শিক্ষাদীক্ষাগত—যুব-আন্দোলনের এই পাঁচটি দিক। এই আন্দোলনের লক্ষ্য দ্বিধা-বিভক্ত। একটি ধ্বংস ও বিদ্রোহের দিক—অপরটি সৃষ্টি ও গঠনের দিক। চিন্তাজগতে একটা ভাব-বিপ্লব আনিতে হইবে। ভাল ও মন্দ সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে তাহার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। সকল মিথ্যা মাপকাঠি চূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়া নূতনভাবে জীবনের মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে। এইভাবে ধ্বংস ও সৃষ্টির কাজ একসঙ্গে চলিবে। ধ্বংস ভাল নয়, গঠনই ভাল এবং ধ্বংস না করিয়া গঠন করা সম্ভব একথা মনে করিলে অত্যন্ত ভুল করা হইবে। আবার ধ্বংসই ধ্বংসের লক্ষ্য একথা মনে করাও ভুল। জীবনের কোন একটি ক্ষেত্রে নব সৃষ্টির পত্তন করিতে গেলেই অনেক জিনিস ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। অসত্য, কপটতা ও ভয়-বন্ধনকে কোনমতেই মানিয়া চলা যায় না। যখন আমাদের কর্ত্তব্য শুধু সম্মুখে অগ্রসর হওয়া, তখন পশ্চাতের মুখ চাহিয়া পিছনে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। সৃষ্টির দেবতা ভাঙ্গনের মহারথে বিজয় কেতন উড়াইয়া প্রবল ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়াই অগ্রসর হয়।

(ক) ব্যায়াম সমিতি, ব্যায়ামাগার, পাঠচক্র, আলোচনা-বৈঠক, সাময়িকপত্র পরিচালনাসংঘ, জাতীয় সংগীত সমাজ, সমাজকল্যান সংঘ, পল্লীমঙ্গল সমিতি ইত্যাদি স্থাপন করিতে হইবে।

(খ) নব্যপ্রণালীতে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করিতে হইবে। Volunteer organization এর ফলে তরুণ সমাজ নির্ভীক ও শ্রমসহিষ্ণু হইবে—শৃঙ্খলাও আজ্ঞানুবর্ত্তিতা শিক্ষা করিবে, ছাত্র ও যুবক সমাজে প্রীতি ও সহযোগিতার মধ্য দিয়া সংহত শক্তির উদ্ভব হইবে এবং class patriotism এর সৃষ্টি হইবে।

(গ) যুব সংঘগুলি এক একটি করিয়া যৌথ স্বদেশী ভাণ্ডার খুলিবে। ইহাতে তাহারা অল্প-মূল্যে স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করিতে পারিবে ও গৃহশিল্পের উন্নতি ও প্রসারে উৎসাহ বর্দ্ধন করিবে। যৌথ কারবার চালাইবার অভিজ্ঞতা হইতে সামাজিক বৃত্তি ও সঙ্ঘ-সংগঠন-প্রতিভার উন্মেষ হইবে।

(ঘ) ভাবের দৈন্য ঘুচাইবার জন্য নূতন চিন্তাধারার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। যাহারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্টির কার্য্যে ব্যাপৃত আছে তাহাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান যাহাতে হয় তাহার জন্য League Of Young Intellectuals গঠন করা আবশ্যক। সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক-সৃষ্টিধর্মীসকলেই এই লীগের সভ্য হইবে। সময়োপযোগী সংগীত রচনা, সাহিত্যরচনা, পতাকাসৃষ্টি, মুখপত্রপরিচালনা, অভিনয় কলার অনুশীলন প্রভৃতি এই লীগের কার্য্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(ঙ) দেশের মধ্যে যতগুলি যুবকসমিতি ও যুবকদের আন্দোলন আছে সে সকলের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করিতে হইবে। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যুবক ও তরুণদের প্রাণ এক সুরে বাঁধিতে হইবে। এই সংহত যুবশক্তির সম্মুখে কোনও বাধা-বিঘ্ন দাঁড়াইতে পারিবে না। জাগ্রত যৌবনশক্তি সকল বন্ধন হইতে স্বদেশ ও স্বজাতিকে মুক্ত

করিয়া স্বাধীন ভারত সৃষ্টি করিবে—বিশ্বের দরবারে ভারতবাসীর গৌরবময় আসন প্রতিষ্ঠা করিবে। যুবকদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা যাহাতে ভিন্নমুখী ও পরস্পরবিরোধী না হয়, এবং যাহাতে সকল চেষ্টা সংযত ও কেন্দ্রীভূত হইয়া একই আদর্শের দিকে পরিচালিত হয় তদুদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন করা আবশ্যক।

দুঃখের বিষয়, আজিকার ছাত্র ও যুব প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলন সমূহ স্বদেশের সম্পদশালী ঐতিহ্যকে, স্বকীয়তাকে, দেশের বিশেষ সমস্যা ও ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে উপেক্ষা করিয়া বিদেশ হইতে আমদানি-করা মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। ফলে, এই সকল আন্দোলনগুলি দেশ ও কালের উপযোগী কর্ম্মপন্থা হারাইয়াছে—বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ মতবাদের সংঘর্ষে ঐক্য নষ্ট হওয়ায় যুব-অন্দোলনের মধ্যে দলাদলি প্রবেশ করিয়াছে। অন্য দেশের আদর্শ অন্ধভাবে অনুকরণ করা আত্মপ্রবঞ্চনার সামিল। প্রত্যেক দেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয় সেই দেশের ইতিহাসের ধারা, ভাব, আদর্শ এবং নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের প্রয়োজন হইতে। কোন প্রতিষ্ঠান গড়িতে হইলে ইতিহাসের ধারা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বর্ত্তমানের সমস্যাকে অগ্রাহ্য করা চলে না। পরদেশের চিন্তা, ভাব, প্রতিষ্ঠান বা আদর্শের হুবহু অনুসরণ বা অনুকরণ করার প্রচেষ্টা বাতুলতা মাত্র। পরাধীন দেশের যদি কোনও "ism" কে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহা "nationalism"

নিজের দেশের ইতিহাসের ধারা ও বিশিষ্ট সমস্যাগুলিকে অস্বীকার করিলে চলিবে না—কিন্তু তাই বলিয়া যেন মনে করা না হয় যে ছাত্র বা যুবসমাজের দৃষ্টি কেবল নিজদেশেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। দেশের যুব-আন্দোলনকে সে দেশের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া বিশ্ব যুব-আন্দোলনের সহিত যুক্ত হইতে হইবে। যুব-আন্দোলনের দুইটি দিক আছে আন্ত-

র্জাতিকতার দিক ও জাতীয়তার দিক। আন্তর্জাতিকতার দিক হইতে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য বিশ্বের যুব সমাজকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা। সকল দেশে সকল যুগে তরুণ ও যুবজনের আদর্শ, প্রেরণা, সাধনা ও অনুভূতি মূলতঃ একই। বিশ্বের তরুণ ও যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে এই আত্মীয়তা ও অভেদাত্মকভাব প্রবলতর হইলে মানবকল্যান ও মানবমুক্তির পথ প্রশস্ত হইবে।

আজ আমরা যে শুধু পরাধীন তাহাই নয়—বিদেশী সভ্যতার কুহকাচ্ছন্ন হইয়া আমরা আমাদের প্রাণধর্ম হারাইয়াছি। আমাদের দেশ, ব্যক্তি ও জাতির জীবনে নূতন কিছু করিবার উৎসাহ ও প্রেরণা (initiative) লোপ পাইয়াছে। আমরা বাধ্য না হইলে বা কশাঘাত না খাইলে সহজে কিছুই করিতে চাহি না। বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করিয়া ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়া যে অনেক সময় অনেক কাজ করা দরকার এবং বাস্তবের দৈন্য ও গ্লানি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আদর্শের প্রেরণায় জীবনটাকে অনেক সময় যে হাসিতে হাসিতে বিলাইয়া দেওয়া প্রয়োজন—একথা আমরা কার্য্যতঃ মানিয়া চলি না। এইজন্য প্রেরণা বা initiative এর অভাবে ব্যক্তি বা জাতির ইচ্ছাশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। ব্যক্তির ও জাতির জীবনে ইচ্ছাশক্তি পুনরায় জাগাইতে না পারিলে মহৎ কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। শুধু আদর্শের প্রেরণায়ই ইচ্ছাশক্তি জাগরিত হয়। আমরা আদর্শ ভুলিয়াছি বলিয়াই আমাদের ইচ্ছাশক্তি আজ এত ক্ষীণ। বর্ত্তমানের ভাব-দৈন্য বিদূরিত করিয়া নিজ নিজ জীবনে আদর্শের প্রতিষ্ঠা না করিতে পারিলে আমাদের প্রেরণা ও উদ্দীপনা-শক্তি জাগিবে না—এবং প্রেরণাশক্তি না জাগিলে চিন্তাশক্তি ও কর্মপ্রচেষ্টা পুনরুজ্জীবিত হইবে না। তাই আদর্শবাদই যুব-আন্দোলনের প্রাণ। আদর্শের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে—ঐ আদর্শের অনুসরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে হইবে। আদর্শের চরণে আত্মবলিদান করিতে

পারিলে মানুষের চিন্তা, কথাও কার্য্য এক সুরে বাঁধা হইবে—ভিতর বাহির এক হইয়া যাইবে। আদর্শের পশ্চাতে সারাটি জীবন অনুধাবনের ক্ষমতা, এই tenacity of purpose আমাদের নাই। আমরা অন্তরের সংগে দেশকে ভালবাসি না। তাই আমরা করি গৃহবিবাদ—তাই আমাদের মধ্যে জন্মায় মিরজাফর, উমিচাঁদ। আমরা যদি দেশকে একান্তরূপে ভালবাসিতে শিখি তাহা হইলে আত্মবলিদানের ক্ষমতা লাভ করিব, আমাদের চরিত্রে অবিরাম অশ্রান্ত পরিশ্রমের ক্ষমতা tenacity of purpose ফিরিয়া আসিবে। এই দুইটি বল tenacity of purpose বা moral stamina কোথায় পাইব? পাইব নিষ্কাম কর্মের মধ্যে জীবন ঢালিয়া দিলে—অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত হইলে।

আমরা যদি হৃদয়ের গভীর অন্তঃস্থল হইতে দেশকে ভালবাসি, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করিতে চাই—তাহা হইলে আমাদিগকে দাসত্বের বেদনা ও বন্ধনের দুঃখটিকে মর্মে মর্মে অনুভব করিতে হইবে। এই অনুভূতি যখন তীব্র হইবে তখন আমরা একথা উপলব্ধি করিব যে স্বাধীনতাহীন হইয়া বাঁচিয়া থাকার কোন মূল্য নাই এবং এই অভিজ্ঞতা বাড়িয়া চলার সংগে সংগে এমন দিন আসিবে, যেদিন আমাদের সকল প্রাণ স্বাধীনতা-তৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিবে।

স্বাধীনতার কোনও সহজ নির্বিঘ্ন পথ নাই। স্বাধীনতার পক্ষে যেমন আঘাত বিপদ আছে, তেমনি গৌরব ও অমরত্ব আছে। প্রাচীনের যাহা কিছু শৃঙ্খলের মত আমাদের চলাকে প্রতিপদে প্রতিহত করিতেছে আজ তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তীর্থযাত্রীর মত দলে দলে স্বাধীনতার লক্ষ্যপথে যাত্রা করিতে হইবে। স্বাধীনতাই জীবন। স্বাধীনতার সন্ধানে জীবনদানে অবিনশ্বর গৌরব।

দেশে দেশে যুগে যুগে নির্ভীক তরুণ ও যুবকদলই মুক্তির আলোক-বর্তিকাটিকে উচ্চে তুলিয়া ধরিয়াছে। আজ ভারতবর্ষের ভাগ্য ভারতের

যৌবনের হস্তে ন্যস্ত। আমরা পরাধীন হইয়া জন্মিয়াছি একথা সত্য কিন্তু স্বাধীন দেশে মরিব। দেশকে মুক্ত করিয়া মরিব—আসুন আমরা এই প্রতিজ্ঞা করি। আর যদি বা জীবনে মুক্ত ভারতবর্ষের রূপ দেখিতে নাও পারি তবে যেন ভারতবর্ষকে মুক্ত করিতে জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারি। মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি—মানুষের মত বাঁচিতে চাই। পরাধীনতাই মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রধান অন্তরায়। মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র উপায় মনুষ্যত্ব বিকাশের সকল অন্তরায় চূর্ণ করা। যেখানে যখন অত্যাচার অবিচার ও অনাচার দেখিব সেইখানে নির্ভীক হৃদয়ে শির উন্নত করিয়া প্রতিবাদ করিব এবং নিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব। অত্যাচার দেখিয়াও যে ব্যক্তি তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করে না সে নিজের মনুষ্যত্বের অবমাননা করে। যে ব্যক্তি অনাচার নিবারণের প্রচেষ্টায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিপন্ন হয়, কারারুদ্ধ হয় অথবা লাঞ্ছিত হয় সে সেই ত্যাগ ও লাঞ্ছনার ভিতর দিয়াই মনুষ্যত্বের গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতের তরুণও যুবসমাজকে সুভাষচন্দ্র যে ভাব ও চিন্তাধারায়, যে আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে চাহিয়াছেন, তরুণ সম্প্রদায়কে যে স্বপ্নের নেশায় মাতাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন, যে নূতনের সন্ধানে যুবচিত্তকে আহ্বান করিয়াছেন সুভাষচন্দ্রের নানা ভাষণ ও বাণী হইতে তাহারই কিঞ্চিৎ আভসে উপরে দেওয়া হইল।

তের

১৯২৯ সালের ২৫শে ডিসেম্বর লাহোরে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হয়। সেবারকার কংগ্রেসে বামপন্থীদের উদ্যোগ-আয়োজন দেখিয়া গান্ধীজিও দক্ষিণপন্থী নেতারা কংগ্রেসের সভাপতি মনোনয়নে এমন কূটনৈতিক চাল চালিলেন যে তাহার ফলে বামপন্থীদল দুর্বল হইয়া

পড়ে। সভাপতি পদের জন্য গান্ধীজির নাম প্রস্তাবিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে সভাপতি মনোনীত করেন। এইভাবে বামপন্থীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠনেতাকে দক্ষিণপন্থীদল স্বপক্ষে আনিতে সক্ষম হয়। এই সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

"বাম পক্ষের বিরোধিতাকে পর্য্যুদস্ত করিয়া কংগ্রেসে অপ্রতিহত প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে হাত করা মহাত্মাজির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। ......এই কাজে (সভাপতি মনোনয়নে) মহাত্মাজি বিশেষ চাতুর্য্যের পরিচয় দেন। কিন্তু বামপন্থীদলের পক্ষে এই নির্বাচন দুর্ভাগ্যের সূচনা করে। কারণ এই ঘটনা হইতেই মহাত্মাজি ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মধ্যে অধিকতর মতসামঞ্জস্য ও ঘনিষ্ঠতা পরিলক্ষিত হয় ; এবং কংগ্রেসে বামপক্ষ ও নেহরুর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। কংগ্রেস-সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর হইতেই জনসেবার ক্ষেত্রেও পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর জীবনে সম্পূর্ণ এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয় ; তদবধি একান্ত নিষ্ঠার সহিত পণ্ডিত নেহরু মহাত্মাজিকে সমর্থন করিয়া আসিতেছেন।"

এদিকে কলিকাতা কংগ্রেসে যে চরমপত্র দেওয়া হইয়াছিল তাহার মেয়াদ উত্তীর্ণপ্রায়। দেশবাসী পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে আগ্রহান্বিত। অবশেষে ৩১শে অক্টোবর তদনীন্তন বড়লাট লর্ড আরউইন ঘোষণা করিলেন যে, ১৯১৭ সালের ঘোষণায় ভারতের 'শাসন-তান্ত্রিক প্রগতি' ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। বড়লাটের এই ঘোষণার পর গান্ধীজী, মতিলাল, মালব্য, ডাঃ আনসারী, মুঞ্জে, প্যাটেল, শ্রীযুক্তা নাইডু এমন কি জওহরলালেরও স্বাক্ষরযুক্ত এক ঘোষণা প্রকাশিত হয়—তাহাতে সরকারের আন্তরিকতার প্রশংসা করা হয় এবং ভারতের জন্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে এক শাসন-

বিধি প্রনয়ন করিতে সরকারকে অনুরোধ করা হয়। সুভাষচন্দ্র এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হন এবং কংগ্রেসদলপতিদের ঘোষণার প্রতিবাদে একটি স্বতন্ত্র ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। অমৃতসরের ডাঃ সফিউদ্দিন কিচ্‌লু ও পাটনার অধ্যাপক আবদুল বারি শেষোক্ত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন। এই সময় গান্ধীজী ও মতিলাল বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই সাক্ষাৎকরের কোনই ফল হয় নাই। ফলে, লর্ড আরউইনের ঘোষণার দুইমাস পরে (২৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৯) লাহোর অধিবেশনের কালে দলপতিদের ক্ষীণ আশার শেষ রশ্মিটুকুও নিবিয়া যায়—তাঁহারা শূন্যহস্তে অধিবেশনে যোগদান করিলেন। কংগ্রেসের লক্ষ্য হিসাবে পূর্ণ স্বাধীনতা গৃহীত হইল কিন্তু বোমার আক্রমন হইতে জীবন রক্ষা হওয়ায় বড়লাট বাহাদুরকে যে অভিনন্দন জানান হইয়াছিল সেই অভিনন্দন প্রস্তাব বর্জ্জন করার দাবী জানান সত্বেও সেই প্রস্তাব বর্জন করা হইল না। পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য কংগ্রেসের কি কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করা উচিত নিখিল ভারতীয় নেতারা সে বিষয় কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। আন্দোলনের পথ নির্দ্দেশ ও আন্দোলন পরিচালনার ভার গান্ধীজীর উপর ন্যস্ত করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন। একমাত্র সুভাষচন্দ্রই সেদিন কংগ্রেসের সম্মুখে একটি কর্মপন্থা উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। এক সংশোধন প্রস্তাব তুলিয়া তিনি বলিলেন যে, দেশের প্রচলিত শাসনযন্ত্র বর্জ্জন করিয়া আয়র্লণ্ডের সিন ফিনের আদর্শে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী (parallel) গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করা হউক এবং দেশবাসীকে সেই প্রতিদ্বন্দ্বী গভর্ণমেণ্টের প্রতি অনুগত্য প্রকাশে আহ্বান করা হউক। উক্ত প্রস্তাবে তিনি দেশের শ্রমিক, কৃষক ও যুবসম্প্রদায়কে সংগঠিত করার দাবীও উপস্থিত করেন। কিন্তু নিখিল ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কেহই সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করিলেন না। বাঙলার ডেলিগেটদের একটি প্রধান দল (দেশপ্রিয় সেনগুপ্তের সমর্থকদল) সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব সমর্থন

করিলেন না। মহাত্মাজীর সুপারিশক্রমে জওহরলাল সভাপতির আসনে সমাসীন—সুতরাং তিনিও সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবের বিরোধী। গান্ধীমণ্ডলের নেতারা তো গান্ধীজী ব্যতীত অন্যকাহারও প্রোগ্রাম গ্রহণ করিতেই পারেন না। সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল। সপ্তরথী বেষ্টিত হইয়া অভিমন্যুর মত বীর বিক্রমে একাকী সংগ্রাম করিয়া তিনি পরাজয় বরণ করিলেন। সেদিন লাহোর কংগ্রেসেই তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন, "আজ আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল; কিন্তু, এমন দিন শীঘ্রই আসিবে যেদিন আপনারা অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন" সেদিন সুভাষচন্দ্রের ব্যাকুল কণ্ঠের করুণ আবেদন শুনিয়া অনেকেই বক্রহাসি হাসিয়াছিলেন। আজ ১৯৪২ সালে আগষ্ট আন্দোলনের ইতিহাসে যখন দেখি সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবিত প্রতিদ্বন্দ্বী গভর্ণমেণ্ট স্থাপনের পরিকল্পনা তমলুক, কাঁথি, সাতারা প্রভৃতি স্থানে কার্য্যকরী করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছিল, তখন সুভাষচন্দ্রের কর্মপন্থায় অভ্রান্ত দূর দৃষ্টির পরিচয়ই আমরা পাই। *

১৯২৯ সালে সুভাষচন্দ্র নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। কিন্তু ১৯২৭ সাল হইতে তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও জেনারেল সেক্রেটারী থাকা সত্ত্বেও লাহোর অধিবেশনে তাঁহাকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ পরিত্যাগ করিতে হয়। এই বৎসর মাদ্রাজের জনপ্রিয় নেতা ও ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারকেও কমিটি হইতে বর্জন করা হয়। লাহোর অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র এই মর্মে আর একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, ওয়াকিং কমিটির সদস্যগণ অতঃপর

* লাহোর কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের যে সংগ্রামশীল রূপ ও প্রখর ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে তৎসম্পর্কে "ট্রিবিউন" পত্রিকায় নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য প্রকাশিত হয়—"Mr. Bose was an embodiment of C. R. Dass's fighting spirit—fighting against every thing that smacked of oppression and for everything that led to the national glory."

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত এই দাবীও অগ্রাহ্য হয়। গণতান্ত্রিক নীতির এই অবমাননায় সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বামপন্থীদল সভাস্থল পরিত্যাগ করেন এবং গয়া কংগ্রেসের অনুরূপ লাহোর কংগ্রেসের অভ্যন্তরে একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করেন। এই দলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "The new party will without prejudice to the party's objective of complete independence for India, endeavour to the best of its ability to co-operate as far as possible with the other parties in the country in such programmes, policies and activities as the party may accept for the purpose of attaining its objective."

১৯৩০ সালের ৪ঠা জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র ব্রাড্‌লে হলে লাহোরের নাগরিকদের এক সভায় বক্তৃতা করেন। লাহোর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে ১৯৩০ সালের ২৩শে জানুয়ারী তারিখে নিখিল ভারত রাজনৈতিক লাঞ্ছিত কর্মী দিবসের শোভাযাত্রা সম্পর্কে রাজদ্রোহের অভিযোগে তিনি ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

এই সময় গান্ধীজীর নেতৃত্বে লবণ আইন অমান্য অন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনেও অন্যান্য বারের ন্যায় বাঙ্‌লার যুব-সম্প্রদায় বিপুল সংখ্যায় দলে দলে আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়ায়। সুভাষচন্দ্র তখন জেলে। কারারুদ্ধ অবস্থাতেই তিনি কলিকাতার নাগরিক জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান কর্পোরেশনের মেয়রপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৩০ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর তিনি মুক্তিলাভ করেন। মুক্তিলাভের পরেই তিনি নিখিল ভারত ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেসকে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করিয়া চলিবার উপদেশ দেন। সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেন, "জাতীয় স্বাধীনতা অর্জ্জনই

সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন—স্বাধীনতালাভের পূর্ব্বে শ্রমিকদের কোনরূপ শ্রেণী সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া আমি সঙ্গত মনে করি না। শ্রমিক অন্দোলন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হউক কিন্তু তাহা যেন জাতীয়তাবিরোধী (anti-nationalist) না হয়।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সুভাষচন্দ্র নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর বঙ্গ পরিভ্রমণে বহির্গত হন। মালদহ জেলার সীমান্তে ট্রেনের কামরায় ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার উপর এক আদেশ জারী করেন। ঐ আদেশ দ্বারা তাঁহাকে মালদহ জেলায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হয়। সুভাষচন্দ্র এই আদেশ মানিতে অস্বীকার করেন। ফলে ষ্টেশনে প্রথম শ্রেণীর আরোহীদের বিশ্রামাগারেই তাঁহার বিচার হয়। এই বিচার সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য জানিতে চাহিলে তিনি বলেন, "এই আদেশে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারার সম্পূর্ণ অপপ্রয়োগ হইয়াছে। আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন ভারতবাসী হিসাবে আমি ইহা মানিতে পারি না। আমি যদি এই আদেশ মানিয়া লই তাহা হইলে নাগরিক হিসাবে আমি কর্ত্তব্যচ্যুত হইব।" বিচারে তাঁহার উপর ৭ দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। সুভাষচন্দ্র রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলে প্রেরিত হন। শোভাযাত্রাদি যাহাতে না হইতে পারে তজ্জন্য রাজসাহীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ১৮ই জানুয়ারী স্বয়ং গভীর রাত্রিতে তাঁহাকে রাজসাহী হইতে ত্রিশমাইল দূরবর্ত্তী নাটোর রেলওয়ে ষ্টেশনে আনিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দেন। এই ভাবে তাঁহাকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ঘোষিত হওয়ার পর হইতে প্রতিবৎসর ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হইয়া আসিতেছে। ১৯৩১ সালের স্বাধীনতা দিবসের সভা ও শোভাযাত্রা সরকার বে-আইনী ঘোষণা করেন। কিন্তু কর্পোরেশনের মেয়র সুভাষচন্দ্র সরকারের এই অন্যায় আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া স্বয়ং মনুমেণ্টের অভিমুখে শোভাযাত্রা

পরিচালনা করিয়া লইয়া যান। শোভাযাত্রা ময়দানের সমীপবর্ত্তী হইলে পুলিশ বেপরোয়া লাঠি চালনা করে। উহার ফলে সুভাষচন্দ্র আহত হন। আইন ভঙ্গের অপরাধে তিনি ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

কিন্তু দণ্ডকাল শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি মুক্তি লাভ করেন; কেননা, সেই সময় গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তিতে দারুণ অসন্তুষ্ট হইলেও সুভাষচন্দ্র তথনকার পরিস্থিতি বিবেচনায় কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখিবার আবেদন জানাইয়া এক বিবৃতি প্রচার করেন। ইতিপূর্ব্বে প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস যোগদান না করায় বৈঠক চরম ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর কংগ্রেস দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের প্রস্তাবে স্বীকৃত হয়। কিন্তু দেশের যুব-শক্তি এই চুক্তি ও আপোষ মানিয়া লয় নাই। সেই সময়ে ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেও ব্যবস্থাপরিষদে বোমানিক্ষেপের অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। এই বীর যুবকত্রয়ের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞারদকল্পে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করিয়া যুবসম্প্রদায় এই দাবী উত্থাপন করে যে, এই বীরত্রয়ের মৃত্যুদণ্ড প্রত্যাহার না হইলে গভর্ণমেণ্টের সহিত কোন প্রকার চুক্তিই হইতে পারে না। জনমতের চাপে গান্ধীজী বড়লাটকে বলিয়াও এ বিষয়ে কিছুই করিতে পারিলেন না। অথচ, এই যুবকদের ফাঁসিরদ না করাতে তিনি আপোষ-আলোচনা ভাঙ্গিয়াও দিলেন না। ২৩শে মার্চ্চ যে সময়ে কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হয় ঠিক সেই সময়ে ভারতের নবজাগ্রত যুবশক্তি ও দেশাত্মবোধের মূর্ত্ত প্রতীক, আত্মত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ভারতমাতার এই বীর সন্তানত্রয় সাম্রাজ্যবাদের যুপকাষ্ঠে আত্মাহুতি দিলেন। এই ঘটনায় দেশের যুবসম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে এবং সর্ব্বত্র কৃষ্ণপতাকাধারী ছাত্র শোভাযাত্রিদল কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করে। এই মর্ম্মন্তুদ ঘটনার বর্ণনা করিতে গিয়া জওহরলাল

বলেন, গান্ধী-আরউইন আপোষ-নিষ্পত্তির পথের মাঝখানে ঝুলিয়া আছে ভগৎ সিংহের মৃতদেহ। সাহসিকতা ও তেজস্বিতার মূর্ত্ত বিগ্রহ, আত্মত্যাগ ও কষ্টসহিষ্ণুতার মহনীয় আদর্শ এই তিন বীর শহিদের প্রাণহরণে অত্যাচারী গভর্ণমেণ্টের সহিত আপোষের প্রস্তাব দেশবাসী কিছুতেই মানিতে পারে নাই। বিক্ষুব্ধ জনচিত্ত সেদিন জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে একমাত্র সুভাষচন্দ্রকেই তাহাদের অন্তরের কথা বলিতে শুনিয়াছিল। সুভাষচন্দ্র করাচীতে "হিন্দুস্থান নওজোয়ান সঙ্ঘের" সভাপতি রূপে দেশবাসীর অন্তরের এই তীব্র বিক্ষোভকে ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্র গান্ধী-আরইউন চুক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেন। করাচী কংগ্রেসে সভাপতি পদে সর্দার প্যাটেলের নির্ব্বাচনেরও তিনি প্রতিবাদ করেন। সর্দার প্যাটেল প্রতিনিধি মণ্ডলী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত না হইয়া সরাসরি ওয়ার্কিং কমিটি কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছিলেন। সভাপতি নির্ব্বাচনের এই প্রথা কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র বিরোধী হইলেও গান্ধী-আরইউন চুক্তি পাকাপাকি ভাবে সিদ্ধ করাইয়া লইবার জন্যই সর্দার প্যাটেলকে সভাপতিপদে বরণ করা হইয়াছিল।

এই সময়ে বাঙলাদেশে সন্ত্রাসবাদের যুগ চলিতেছে। চট্টগ্রামের গোয়েন্দা কর্ম্মচারী আশানুল্লা এই সময় সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত হন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই সম্পর্কে বাঙলাদেশের উল্লেখ করিয়া যে বিবৃতি দেন তাহা মোটেই শোভন হয় নাই। সুভাষচন্দ্র ঐ বিবৃতির প্রতিবাদে এক বিবৃতি দেন। ইতিমধ্যে হিজলী বন্দীনিবাসে রক্ষীদলের বেপরোয়া গুলীচালনার ফলে কয়েকজন রাজবন্দী আহত ও নিহত হন। এই মর্ম্মান্তিক ঘটনা সকলকেই বিচলিত করিয়া তোলে; এমন কি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নিজেই উহার প্রতিবাদকল্পে আহূত এক জনসভায় সভাপতিত্ব করিতে কলিকাতায় ছুটিয়া আসেন এবং অগ্নিবর্ষী ভাষায় এই বর্বরোচিত বীভৎসতার তীব্র নিন্দা করেন। এই সময়ে সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক

রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি পদে ও কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান পদে ইস্তফা দেন। বিলাতের দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কোনই ফল হইল না—কেবল দেশকে এক অপ্রয়োজনীয় পরাজয় ও অমর্য্যাদাকর আপোষের গ্লানি বহন করিতে হইল। গান্ধীজী রিক্তহস্তে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণের জন্য বোম্বাইয়ে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আহূত হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুভাষচন্দ্র লাহোর কংগ্রেসে ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যপদ ত্যাগ করেন। এবারকার বৈঠকে বিশেষ নিমন্ত্রণ-দ্বারা সুভাষচন্দ্রকে আলোচনায় যোগদান করিতে অনুরোধ করা হয়। সেখানে পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু এই আন্দোলনে যোগ দিবার পূর্ব্বেই কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পথে ১৯৩২ সালের ২রা জানুয়ারী বোম্বাই হইতে ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী "কল্যাণ" ষ্টেশনে ১৮১৮ সালের তিন আইনে সুভাষচন্দ্র গ্রেফ্‌তার হন। তাঁহাকে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত সিউনি জেলে লইয়া যাওয়া হইল। এইবারও জেলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। সিউনি জেল হইতে জব্বলপুর সেণ্ট্রাল জেলে, সেখান হইতে ভাওয়ালী স্বাস্থ্য-নিবাসে এবং সেখান হইতে চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক পরীক্ষার জন্য বলরামপুর হাসপাতালে সুভাষচন্দ্রকে ক্রমান্বয়ে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু এই ভাবে বিভিন্ন হাসপাতালে ও স্বাস্থ্যাবাসে ঘুরিয়া ফিরিয়াও যখন তাঁহার স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি হইল না তখন সরকার তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য ইউরোপে গমন করিতে সম্মতি দান করেন।

১৯৩৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তিনি ইউরোপ অভিমুখে যাত্রা করেন। যাত্রার প্রাক্‌কালে জাহাজ হইতে বাংলার উদ্দেশ্যে এক মর্ম্মস্পর্শী বাণী প্রেরণ করেন—"বাঙলা মরিলে কে বাঁচিয়া থাকিবে? বাঙলা বাঁচিলে কে মরিবে?"

চৌদ্দ

স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারকল্পে ইউরোপে যাইবার জন্য সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দেওয়া হইলেও ভারতবর্ষের বাহিরে তাঁহাকে চলাফেরার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই। বিলাতের কমন্স সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে স্যার স্যামুয়েল হোর জবাব দেন যে, সুভাষচন্দ্রকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে না— তাঁহাকে জার্ম্মানী পরিদর্শনে অনুমতি দেওয়া হইবে না।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ৮ই মার্চ্চ সুভাষচন্দ্র ভিয়েনায় পৌঁছিয়া স্বাস্থ্যনিবাসে অবস্থান করেন। সেই সময় অষ্ট্রিয়া নামেমাত্র সাধারণতন্ত্র ছিল। কার্য্যতঃ অষ্ট্রিয়ার রাজনীতি ক্ষেত্রে ফ্যাসিষ্টদেরই প্রাধান্য ছিল। ভিয়েনা নগরী কিন্তু সোস্যাল ডেমোক্রাটদের দ্বারা শাসিত হইত। তাঁহাদের সুশাসনে একবৎসরের মধ্যেই ভিয়েনা পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধিশালিনী ও সর্ব্বাপেক্ষা রমনীয়া নগরীতে পরিণত হইল। সেখানকার পৌরশাসনের সমাজতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা সুভাষচন্দ্রকে আকৃষ্ট করিল। সুভাষচন্দ্র সেখানকার মেয়ের কার্ল সিটজ (Karl Sietz) এর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং কলিকাতা ও ভিয়েনার শাসন ব্যবস্থার তুলনামূলক অলোচনা করেন। ভিয়েনার পোরশাসনে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা সুভাষচন্দ্রের অন্তরে এইরূপ গভীর রেখাপাত করিল যে তিনি উহা কলিকাতার শাসন ব্যবস্থায় প্রবর্ত্তন করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। প্রবাসে থাকিয়াও ভারতবর্ষের উন্নতিই তাঁহার প্রধান চিন্তা ছিল।

ভিয়েনাতে প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ পরলোকগত মিঃ বিটলভাই প্যাটেলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। মিঃ প্যাটেলও চিকিৎসার জন্য সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন। সুভাষচন্দ্র ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়াও মিঃ প্যাটেলের শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করেন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার শয্যাপার্শ্বে ছিলেন।

মিঃ বিটলভাই প্যাটেলের মৃত্যু হইলে সুভাষচন্দ্র তাঁহার শব ভারতে প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং শবাধারের সহিত তিনি মার্সাই বন্দর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন।

এই সময়ে গান্ধীজী তাঁহার দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। এই আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার উপলক্ষে ১৯৩৩ সনের মে মাসে সুভাষচন্দ্র ও বিটলভাই ভিয়েনা হইতে এক যুক্ত বিবৃতি দান করেন। তাহাতে তাঁহারা ঘোষণা করেন যে, গান্ধীজী কর্ত্তৃক আন্দোলন প্রত্যাহার পরাজয় স্বীকার করা ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। "আমাদের স্পষ্ট অভিমত এই যে গান্ধীজী রাজনৈতিক নেতা হিসাবে ব্যর্থ হইয়াছেন। অতএব এখন নূতন উপায়ে ও নূতন মতবাদের ভিত্তিতে কংগ্রেসের আমূল সংস্কার সাধন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং ইহার জন্য একজন নূতন নেতারও অত্যন্ত প্রয়োজন। কেননা গান্ধীজী তাঁহার সমস্ত জীবনের বিশ্বাস, আদর্শ ও কর্ম্মপন্থার বিরুদ্ধে যাইবেন তাঁহার নিকট ইহা আশা করা অনুচিত। * * * যদি সমগ্র কংগ্রেসকে এই ভাবে পুনর্গঠিত করা যায় তবেই সর্বোত্তম হইবে। নতুবা কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই সমস্ত আমূল-পরিবর্ত্তনপন্থী (radcial) উপাদানের সম্মেলনে এক নূতন দল গঠন হইবে।" পরে যখন তাঁহাকে লণ্ডন প্রবাসী ভারতীয়দের এক সর্ব্বদলীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে আমন্ত্রণ করা হয় তখন তিনি এক লিখিত বাণী প্রেরণ করিয়া বলেন, "১৯৩১ সালের দিল্লী চুক্তি যদি ভ্রান্ত হইয়া থাকে তবে ১৯৩৩ সালের আত্মসমর্পণ এক বিরাট জাতীয় দুর্গতি। এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে আইন অমান্য আন্দোলম বন্ধ করিয়া দেওয়ায় গত ১৩ বৎসরের জাতির সমস্ত ত্যাগস্বীকার ও দুঃখবরণ কার্য্যতঃ নিষ্ফল হইল।" বলা বাহুল্য, উক্ত সম্মেলনে যোগদানের জন্য সুভাষচন্দ্রকে ইংলণ্ডে যাইবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। সমুদ্র শুল্ক আইন অনুসারে ঐ অভিভাষণ ভারতে প্রেরণ নিষিদ্ধ হয়। এই সম্মেলনেই সুভাষচন্দ্র

সর্ব্বপ্রথম "সাম্যবাদ সঙ্ঘ" স্থাপনের প্রস্তাব করেন। এই সংঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য ২২ জন সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়।

সুভাষচন্দ্রের বৈদেশিক প্রচারকার্য্যের দুইটি লক্ষ্য ছিল। এক, ইউরোপবাসীদিগকে ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থার সহিত পরিচিত করা ও বৃটিশগভর্ণমেণ্ট ও বৃটিশের প্রসাদপুষ্ট দলগুলির ভারতবিরোধী প্রচার-কার্য্যের বিরোধিতা করা। দুই, ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক আশা-আশঙ্কার প্রতি উৎসাহশীল ও শ্রদ্ধাবান দেশ ও রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করা। সুভাষচন্দ্র একাধিকবার ঘোষণা করেন, ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতি কোন বৈদেশিক শক্তির পররাজ্যনীতির সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইবে না। ভারতবর্ষ পরম ঔদার্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত ও সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে বিভিন্নদেশের রাষ্ট্রিক মতবাদ ও চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইয়া বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের দ্বারা এক উদার ও সর্বজনগ্রাহ্য নীতির অনুসরণ করিবে। এই সময়ে ইউরোপে দুইটি মতবাদ বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। একদিকে নব্য ইটালার ফ্যাসিবাদ—মুসোলিনী পৃথিবীব্যাপী এক বিশাল রোমক সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্নে বিভোর; অপরদিকে নবীন রাশিয়ার কম্যুনিজম বা সাম্যবাদ। সকলের দৃষ্টিই এই দুই দেশের উপর নিবদ্ধ। ফ্যাসিবাদী ইটালীর সমৃদ্ধি ও জয়যাত্রা সুভাষচন্দ্রকে আকৃষ্ট করিলেও তিনি যেমন ফ্যাসীতন্ত্রকে সর্বান্তঃ-করণে গ্রহণ করিতে পারেন নাই তেমনি কম্যুনিজমকেও তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন, 'the next phase in world history will produce a synthesis between Communism and Fascism'—ভারতবর্ষে যে নীতি অনুসৃত হইবে তাহা হইবে ফ্যাসিজম্ ও কম্যুনিজম এর সংশ্লেষণ। এই দুই মতবাদের মধ্যে যে যে বিষয়ে মিল আছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই

এই সমন্বয় প্রক্রিয়া চলিতে থাকিবে। এই প্রক্রিয়াকেই তিনি "সাম্য" আখ্যা দিয়াছেন। এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি "সাম্যবাদ সংঘ" প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেন। তিনি "সাম্যবাদ সংঘের" নিম্নলিখিত দশবিধ কর্মপন্থার নির্দেশ দেন।

1. The party will stand for the interest of the peasants, workers, etc., and not for the vested interests, that is, the landlords, capitalists, and money-lending classes.

2. It will stand for the complete political and economic liberation of the Indian people.

3. It will stand for a Federal Government for India as the ultimate goal but will believe in a strong Central Government with dictatorial powers for some years to come, in order to put India on her feet.

4. It will believe in a sound system of state planning for the reorganization of the agricultural and industrial life of the country.

5. It will seek to build up a new social structure on the basis of the village communities of the past, that were ruled by the village 'Panch' and will strive to break down existing social barriers like caste.

6. It will seek to establish a new monetary and credit system in the light of the theories and the experiments that have been and are current in the modern world.

7. It will seek to abolish landlordism and introduce a uniform land tenure system for the whole of India.

8. It will not stand for democracy in the mid-Victorian sense of the term, but will believe in Govern-

ment by a strong party bound together by military discipline, as the only means of holding India together and preventing a chaos, when Indians are free and are thrown entirely on their own resources.

9. It will not restrict itself to a campaign inside India but will resort to international propaganda also in order to strengthen India's cause for liberty and will attempt to utilise the existing international organisations.

10. It will endeavour to unite all the radical organisations under a national executive so that whenever any action is taken there will be simultaneous activity on many fronts.

বিলাতের রক্ষণশীল দলের নেতৃবর্গ ও তাহাদের সংবাদপত্রগুলি এই সাম্যবাদ সংঘের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচারকার্য্য চালান ও নানারূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে থাকেন। প্রতিপক্ষীয়দের সমালোচনার উত্তরে সুভাষচন্দ্র জেনেভা হইতে নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রচার করেন। এই বিবৃতির দ্বারা সুভাষচন্দ্রের মনোভাবের ঔদার্য্য ও দৃষ্টির ব্যাপকতাই প্রমাণিত হয়। "ইয়োরোপে আসিয়া অবধি আমি এই মত আরও দৃঢ়তার সহিত পোষণ করিতেছি যে, আমাদিগের পক্ষে যেমন দেশবিদেশের নানা আধুনিক আন্দোলনের সহিত পরিচিত থাকা আবশ্যক, আবার আমাদের অতীত ইতিহাস তথা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন অনুযায়ী ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ উন্নতি-পথ নির্ণয় করাও তেমনি আমাদের পক্ষে সমান ভাবেই প্রয়োজন। শতশত বৎসর ধরিয়া বহির্জগৎ হইতে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন ও চিন্তা-রাজ্যেও স্বতন্ত্র হইয়া থাকার ফলে ভারতবর্ষের পক্ষে সহানুভূতিপূর্ণ সমালোচনার দৃষ্টিতে অন্যান্য জাতি ও দেশকে বিচার করা সহজ সাধ্য।

আমাদের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতির পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়া রাখা বিশেষ দরকার। আমাদের আভ্যন্তরীন নীতি নির্ণয় কালে এ-কথা বলা মারাত্মক ভ্রম হইবে যে, ভারতবাসীকে কম্যুনিজম ও ফ্যাসিজমের মধ্যে যে কোন একটা বাছিয়া লইতে হইবে। মানবের জ্ঞানরাজ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বা মতবাদই একেবারে চূড়ান্ত বা শেষ কথা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

আধুনিক জাতিসমূহের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক ধারা, পরিবেশ ও প্রয়োজনের ফলমাত্র। মানব জীবনের মতই ইহারা পরিবর্ত্তন বা বিকাশের অধীন। অধিকন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমান সময়ের কোন কোন অতিশয় চিত্তাকর্ষক প্রতিষ্ঠানগুলির এখনও পরীক্ষাকাল উত্তীর্ণ হয় নাই। এই সব প্রতিষ্ঠানকে সফল ও সার্থক বলিবার পূর্বে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইবে। ইত্যবসরে আমাদিগকে স্বাধীনভাবে বুদ্ধিবৃত্তির চালনাদ্বারা সব কিছু পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, বর্ত্তমানকালের বিভিন্ন আন্দোলনগুলির মধ্যে যাহা যাহা উপাদেয় ও হিতকর তাহাদের সমন্বয় সাধন করাই ভারতের কর্ত্তব্য। তাই, ইয়োরোপ ও আমেরিকায় যে সব আন্দোলন ও পরীক্ষা চলিতেছে সহানুভূতির সহিত তাহাদের পর্য্যালোচনা ও সমালোচনা করা আমাদের উচিত। কোন প্রকার পূর্ব সংস্কার বা পক্ষপাতের বশে কোন আন্দোলন বা পরীক্ষাকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা আমাদের নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হইবে।”

সুভাষচন্দ্রের পক্ষে ইংলণ্ড, জার্ম্মানী ও রাশিয়া যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ায় তিনি দক্ষিণ ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি পরিভ্রমণ করেন। ১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে তিনি চেকোশ্লোভেকিয়ার রাজধানী প্রাগ পরিদর্শনে আসিয়া সেখানে দশদিন অবস্থান করেন। প্রাগে তাঁহার

রাজকীয় অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হয়—সেখানকার লর্ড মেয়র স্বয়ং তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। পররাষ্ট্রসচিব ডাঃ বেনেসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ও তিনি পরিদর্শন করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া তিনি জেনেভাতে অবস্থান করেন এবং তৎপরে কিছু সময়ের জন্য ফ্রান্স পরিভ্রমণে যান। ইটালীতে তিনি এশিয়াবাসী ছাত্রদের এক সম্মেলনে যোগদান করেন। সিনর মুসোলিনী ঐ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এই সময়েই তিনি কয়েকদিন রোমে থাকিয়া সেখানকার ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্র সংগঠন পর্য্যবেক্ষণ করেন।

১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসে তিনি বল্কান দেশগুলি পরিভ্রমণ করেন। বুদাপেষ্ট, বুখারেষ্ট, সোফিয়া, বেলগ্রেড প্রভৃতি রাজধানীগুলিতে তিনি বক্তৃতা প্রদান করেন এবং ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম ও ভারতে সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের কথা ইউরোপের জনগণের নিকট প্রচার করেন। ইউরোপে প্রবাসজীবন যাপন কালে তিনি "ভারতীয় সংগ্রাম ১৯২০-৩৪" (Indian Struggle—1920-1934) নামে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি বামপন্থীর দৃষ্টি লইয়া ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন এবং বৃটিশ স্বেচ্ছাতন্ত্র কি জঘন্য ষড়যন্ত্র ও নির্মম নির্য্যাতনের দ্বারা এই আন্দোলন ও গণজাগরণ দলন ও দমন করিতেছে, তাহার মর্মস্পর্শী বর্ণনা প্রদান করেন। এই গ্রন্থে তাঁহার ইউরোপ পর্য্যটনের অভিজ্ঞতাও বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয় ও বহু মণীষী ইহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। স্যার স্যামুয়েল হোর এই গ্রন্থের ভারত-প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দেন। কারণ তাঁহার মতে এই পুস্তক সন্ত্রাসবাদের প্রশ্রয় দেয়। সম্প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

এদিকে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্রের পিতা জানকীনাথ অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং তাঁহার অবস্থা ক্রমশঃই বিশেষ আশঙ্কাজনক হইয়া

দাঁড়ায়। পিতৃদেবেকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য সুভাষচন্দ্র ভারতে আসিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। অবশেষে ভারত সরকার তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। ৪ঠা ডিসেম্বর তিনি তাঁহার পিতাকে দেখিবার জন্য ভারতে আগমন করেন। কিন্তু ২রা ডিসেম্বরেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। ৩রা ডিসেম্বর সুভাষচন্দ্র বিমানযোগে করাচী পৌছিলে শ্রীযুক্ত জামসেদ মেটার নিকট তাঁহার পিতার মৃত্যু সংবাদ শোনেন।

বিমান হইতে করাচী অবতরণ করিবামাত্র শুল্ক বিভাগের জনৈক কর্ম্মচারী ও একজন গোয়েন্দা তাঁহার মালপত্র খানাতল্লাশ করিয়া "ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল" এর একখানি টাইপ-করা কপি হস্তগত করেন। সেখান হইতে সুভাষচন্দ্র বিমান যোগেই কলিকাতা আসেন। দমদম বিমানঘাঁটিতে সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে তাঁহার উপর এক আদেশ জারী করা হয়। এই আদেশ অনুসারে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ সরাসরি ৩৮।২নং এলগিন রোডের বাড়ীতে যাইতে এবং পুনরাদেশ পর্য্যন্ত সেস্থানেই অবস্থান করিতে বলা হয়। উক্ত আদেশ অনুযায়ী তিনি ঐ বাড়ীর বাহিরে যাইতে বা কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না। তাঁহার পরিবারস্থ লোক যাহারা ঐ গৃহে অবস্থান করিতেছে তাহারা ছাড়া কাহারও সহিত পত্রব্যবহার, আলাপ-আলোচনা ও সংবাদ আদান-প্রদান করিতে পারিবেন না। তাঁহার নামের চিঠি-পত্র, টেলিগ্রাম প্রভৃতি সমস্তই না খুলিয়া পুলিশের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। অর্থাৎ নিজের বাড়ীতেই তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখা হয়। সাতদিনের মধ্যে দেশত্যাগ করিবার নির্দ্দেশ দিয়া তাঁহার উপর আর একটি আদেশ জারী করা হয়। তাঁহাকে যেন একমাস থাকিতে দেওয়া হয় এই অনুরোধ জানাইয়া তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট একখানি পত্র লিখেন। ঐ পত্রে তিনি লিখেন যে বিদেশে মুক্ত অবস্থায় থাকার চেয়ে স্বদেশে বন্দী অবস্থাই তাঁহার নিকট অধিকতর কাম্য। অবশেষে পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পর্য্যন্ত

তাঁহাকে ভারতে থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে সুভাষচন্দ্র পুনরায় ইউরোপ যাত্রা করেন।

বলিতে গেলে ১৯৩৩ হইতে ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত সুভাষচন্দ্র একাদিক্রমে ইউরোপে প্রবাস যাপন করেন। এই সময় তিনি কেবলমাত্র নিজের স্বাস্থ্যোদ্ধারেই ব্যস্ত ছিলেন না। প্রবাসে তিনি কংগ্রেসের দূত হিসাবে বহির্জগতে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর পক্ষ হইয়া প্রচারকার্য্য চালান। সুভাষচন্দ্রের পূর্ব্বে কেহ রাজনীতিক্ষেত্রে বহির্জাগতিক প্রচারের উপর তেমন গুরুত্ব দেন নাই অথচ ইহার প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি তাহা যতই দিন যাইতেছে ততই আমরা বেশী করিয়া উপলব্ধি করিতেছি। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকে একদিকে ব্যঙ্গ করিয়া ও অপরদিকে বৃটিশ শাসনাধীনে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জয়ডঙ্কা বাজাইয়া ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে বিদেশীর চোখে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রবাস জীবনে সুভাষচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম সাম্রাজ্যবাদের এই কুৎসা প্রচারের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করেন। এই কার্য্যে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন প্রবীণ দেশকর্ম্মী বিটলভাই পাটেল। মৃত্যুকালে বিটলভাই বৈদেশিক প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য সুভাষচন্দ্রের নামে ১লক্ষ টাকা লিখিয়া দেন। পরে অবশ্য আইনগত ত্রুটির সূত্র ধরিয়া তাঁহাকে ঐ অর্থ হইতে বঞ্চিত করা হয়। বিদেশে সাম্রাজ্যবাদী অপপ্রচার, কুৎসামূলক ছবি ও ছায়াচিত্রের সাহায্যে ইহাই প্রচার করা হয় যে, ভারতীয়গণ অতিশয় অসভ্য ও বর্ব্বর। এই অসভ্য ভারতীয়গণের উন্নতির জন্য শ্বেতাঙ্গগণ আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। ভারতবর্ষকে সভ্য করিবার মহান কর্ত্তব্যবোধে ঈশ্বরপ্রেরিত এই শ্বেতাঙ্গগণ নিঃস্বার্থভাবে ভারতশাসনের দায়িত্ব নিজেদের ঘাড়ে লইয়াছে। সুভাষচন্দ্র এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করেন। সুভাষচন্দ্র একটি প্রবন্ধে ইউরোপে সাম্রাজ্যবাদী

শাসকবর্গের ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় অপপ্রচারের কিঞ্চিৎ নমুনা দেন। "While we are quite indifferent to this question, missionaries and other civilizing agencies are not inactive for several decades. They have painted India as a land where widows are burnt, girls are married at the age of five or six and people are virtually unacquainted with the art of dressing. I remember vividly that, when I was in England in 1920, I was one day passing a lecture hall in front of which there was a pictorial advertisement of a lecture to be delivered by a missionary about India. In that advertisement, there were pictures of some half naked men and women of the blackest complexion, possessing the ugliest features. Ostensibly the lecturer wanted to raise funds for his 'civilizing work' in India and was, therefore, painting India in this light without the slightest compunction. Towards the end of 1933 a German journalist who claimed to have visited India recently, wrote in a Munich paper that she had seen widows being burnt in India and dead bodies lying uncared for in the streets of Bombay. Recently in a Vienna pictorial paper (*Wiener Bilder*, dated the 30th June) a picture of a dead body covered with insects was printed and there was a footnote saying that it was the corpse of a Sadhu which could not be removed for several days because of the Hindu belief that the dead body of a

Sadhu should not be removed by ordinary men. What surprises me is the careful selection of pictures about India made by propagandists in Europe with a view to depicting India in the worst colours possible."

সুভাষচন্দ্র যখন ইউরোপ পরিভ্রমণে আসেন সেই সময় 'ইণ্ডিয়া স্পীকস্', 'বেঙ্গলী' প্রভৃতি ছায়াচিত্রের ভিতর দিয়া সাম্রাজ্যবাদী প্রচার পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল। 'বেঙ্গলী' ছবিতে ভারতে বৃটিশ শাসনের অপার মহিমা কীর্ত্তিত হয়। এতদ্ভিন্ন 'সকলেই সঙ্গীত ভালবাসে' নামে আর একখানি ছবিতে দেখান হয় ভারতের গণ-নায়ক গান্ধীজী কৌপিন পরিয়া এক ফিরিঙ্গী মেম সাহেবের সহিত নৃত্য করিতেছেন। ভারতবর্ষ এবং তাহার শ্রদ্ধেয় নেতৃবর্গকে মসীচিত্রিত করিবার উদ্দেশ্য-কল্পিত কুৎসিত চিত্রের প্রচারের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র ভিয়েনা হইতে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করেন। ফলে, ভিয়েনায় 'বেঙ্গলী' প্রভৃতি ছবির প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। সুভাষচন্দ্রের ইউরোপে থাকাকালে নাৎসীপতি হিটলার এক বক্তৃতায় সদম্ভে ঘোষণা করেন যে, "কৃষ্ণকায়দের শাসন করা শ্বেতকায় জাতিসমূহের কর্ত্তব্য।" পরাধীন ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে সুভাষচন্দ্র এই ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। নাৎসীরা উক্ত বিবৃতিটি ধামাচাপা দিবার জন্য বলে যে, উহা ভারতবর্ষ বা জাপানের পক্ষে প্রযোজ্য নয়।

পিতৃশ্রাদ্ধের পরে ইউরোপে ফিরিয়া গিয়া তিনি প্রথমে নেপল্‌সে পদার্পণ করেন। সেখান হইতে রোমে যান এবং প্রায় একসপ্তাহ কাল রোমে কাটাইয়া ভিয়েনায় আসেন। রোমে অবস্থানকালে আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব্ব আমীর আমানুল্লার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তৎপর তিনি জেনেভায় গিয়া স্বর্গগত প্যাটেলের মর্ম্মর মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন। পরে জেনেভা হইতে প্যারিসে যান। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ডাবলিনে পৌছেন এবং আইরিশ জননেতা ডি, ভ্যালেরার সহিত সাক্ষাৎ

করেন। সুভাষচন্দ্র ডি, ভ্যালেরার সহিত আয়ার্ল্যাণ্ড ও ভারতের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন,—এই সময়ে উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। এই দুই নির্য্যাতিত দেশের মধ্যে গভীর যোগসূত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব করেন, যে কতিপয় ভারতীয় অধ্যাপককে আয়ার্ল্যাণ্ড পরিদর্শনের সুযোগ ও ভারতীয় ছাত্রদিগকে আয়ার্ল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হউক। ডি, ভ্যালেরা এই প্রস্তাবে আগ্রহের সহিত সম্মতি দান করেন।

পনের

১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবার কথা। এই অধিবেশন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়; কেননা, এই অধিবেশনে ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইন সম্পর্কে মত গ্রহণ করার কথা ছিল। তদুপরি এই অধিবেশনে বামপন্থীদলের বিশেষ করিয়া সমাজতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদবিরোধীদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার সম্ভাবনা। বামপন্থী-দের নেতা হিসাবে জওহরলাল কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। সুভাষচন্দ্রকে এই সম্মেলনে দেখিবার জন্য দেশবাসী অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে। দেশবাসীর পক্ষ হইতে জওহরলাল দেশবাসীর এই বাসনা সুভাষচন্দ্রকে জ্ঞাপন করেন। সুভাষচন্দ্র দেশে ফিরিবার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু সরকার পক্ষ হইতে এক আদেশ জারী করিয়া তাঁহাকে জানানো হয় যে, দেশে তিনি মুক্ত অবস্থায় থাকিতে পারিবেন না। সুভাষচন্দ্র এই অন্যায় আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। যাত্রার প্রাক্কালে তিনি বিলাতের সংবাদ পত্রে এই অদ্ভুত আদেশের প্রতিবাদে এক বিবৃতি প্রচার করেন। ১৯৩৬ সালের ১১ই এপ্রিল কন্টিভার্ড জাহাজ

বোম্বাইয়ের জাহাজ ঘাটে আসিয়া লাগে ; বন্দরে লক্ষ লক্ষ নরনারী এই দেশপ্রেমিক বীরের অভ্যর্থনায় দাঁড়াইয়াছিল; কিন্তু, ভারত-ভূমিতে পদার্পণ করিবামাত্রই ১৮১৮ সালের তিন আইনে তিনি বন্দী হইলেন এবং যারবেদা জেলে প্রেরিত হইলেন। গ্রেফ্তারের সময় দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি এই আবেগময়ী বাণী দিয়া যান—"স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন রাখুন।"—সুভাষচন্দ্রের গ্রেফ্তারের প্রতিবাদে ভারতব্যাপী দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ১০ই মে তাঁহার গ্রেফ্তারের প্রতিবাদে "নিখিল ভারত সুভাষ দিবস" প্রতিপালিত হয়।

শীঘ্রই ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে এমন তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয় যে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বেশীদিন আটক রাখিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে ২০শে মে তাঁহাকে যারবেদা জেল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া কার্শিয়াং এর গির্দ্দা পাহাড়ে শরৎচন্দ্র বসুর বাড়ীতে অন্তরীণ রাখা হয়—সেখান হইতে চিকিৎসার জন্য ১৭ই ডিসেম্বর কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। অবশেষে সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরকাল বন্দীজীবনের পর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ্চ সুভাষচন্দ্র বিনাসর্ত্তে মুক্তি লাভ করেন। তখনও তাঁহার শরীর সুস্থ হয় নাই। প্রায় ১মাস কাল তিনি কলিকাতায় ডাঃ নীলরতন সরকারের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পাঞ্জাবের ডালহৌসী পাহাড়ে যান এবং সেখানে ডাঃ ধরমবীরের গৃহে পাঁচ মাস কাল কাটাইয়া কলিকাতায় আসেন। এই সময় কলিকাতায় কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির বৈঠক হইতেছিল। ওয়াকিং কমিটির বৈঠকের পর তিনি চতুর্থবার ইউরোপ যাত্রা করেন। ছাত্রজীবনের পর ইহাই তাঁহার প্রথম স্বাধীনভাবে ইয়োরোপ ভ্রমণ। ১৯৩৮ সালের ১০ই জানুয়ারী তিনি ইংলণ্ড পৌছেন। লণ্ডনে তাঁহাকে রাজোচিত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সেখানে পার্লামেণ্টের বহু বিশিষ্ট সদস্যের সহিত তিনি ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন।

সেখানে তিনি ঘোষণা করেন যে, কংগ্রেস সরকার-কল্পিত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাইবে। লণ্ডনে আয়ার্ল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি ডি, ভ্যালেরার সহিত তাঁহার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী আচার্য্য কৃপালনী ঘোষণা করেন যে, সুভাষচন্দ্র হরিপুরায় নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সেই বৎসর সভাপতি পদের জন্য শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও খাঁন আবদুল গফুর খাঁন—এই চারিজনের নাম প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু অন্যান্য সকলেই সুভাষচন্দ্রের পক্ষে তাঁহাদের নাম প্রত্যাহার করেন ও সুভাষচন্দ্র বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ২৪শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র লণ্ডন হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সমরে আপোষহীন সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ সৈনিক অক্লান্তকর্ম্মী এই বিপ্লবী তরুণকে রাষ্ট্রপতি পদে বরণ করিয়া দেশবাসী স্বাধীনতা যুদ্ধের লক্ষ লক্ষ শহিদকে সম্মানিত করেন ও কংগ্রেসের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে আরও মহিমামণ্ডিত করিয়া তোলেন। দুঃখ-নির্য্যাতনকে হাসিমুখে বরণ করিয়া যে শক্তিধর পুরুষ কঠোর অগ্নি-পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইয়াছেন আজ দেশবাসী তাঁহার গৌরবোন্নত শিরে বিজয় মুকুট পরাইয়া দিল। ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জাতীয় জীবনস্পন্দনের মহাকেন্দ্র নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার সভাপতি পদ পরাধীন ভারত সন্তানের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সম্মান—সুভাষচন্দ্র এই সম্মানের-অধিকারী হইয়া বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করিলেন।

ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে দুইটি স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। একটি স্রোতের অগ্রভাগে রহিয়াছে পুঁজিপতি, জমিদার ও মিলমালিকগণ। বৃটিশ ব্যবসায়ীদের সমান সুযোগ হইতে বঞ্চিত হওয়ার ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইঁহাদের আক্রোশ। এদেশে কলকারখানা স্থাপন

ও ব্যবসা-বাণিজ্যের তুল্য অধিকার যাহাতে পাওয়া যাইতে পারে তজ্জন্য বৃটিশরাজসরকারের নিকট হইতে সুবিধা আদায় করিবার জন্যই ইঁহারা সরকার বিরোধী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসে যোগদান করে। অন্যদিকে জাতীয় আন্দোলনের দ্বিতীয় ধারায় রহিয়াছে দেশের অগণিত কৃষক, মজুর, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়—যাহাদের নিকট স্বাধীনতার অর্থ কেবল বৃটিশশাসন হইতে মুক্ত হওয়াই নহে, বিদেশী শোষক শ্রেণীর স্থলে স্বদেশী শোষক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা নহে। তাহাদের নিকট স্বাধীনতার অর্থ দেশে শোষনহীন শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন। এই দলের মধ্যেই সর্ব্বপ্রথম বৈপ্লবিক চেতনা জাগ্রত হয় এবং ইহারাই বৈপ্লবিক কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিয়া আপোষহীন সংগ্রাম চালাইতে থাকে। সুভাষচন্দ্র ইহাদেরই পুরোভাগে থাকিয়া এই বৃহৎ শক্তিকে একটি সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মধারায় পরিচালিত করেন। তিনি দেশের সম্মুখে আজীবন পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছেন ও আপোষহীন রণনীতি অকুণ্ঠভাষায় প্রচার করিয়াছেন। বিপ্লবী গণশক্তি তাঁহাকে সেনাপতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। তাই তাঁহাকে রাষ্ট্রপতি পদে বরণ করায় যে কেবল একজন বহুনির্য্যাতিত অক্লান্তকর্ম্মী সর্ব্বত্যাগী মুক্তি সাধককে গৌরবান্বিত করা হইল তাহাই নহে, সুভাষচন্দ্র যে বামপন্থী কর্ম্ম-পন্থায় বিশ্বাসী সেই নীতিও জয়যুক্ত হইল। হয়ত কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ ভাবিয়াছিলেন সুভাষচন্দ্রকে সভাপতিপদে অভিষিক্ত করিলে সুভাষচন্দ্রও জওহরলালের ন্যায় আজন্মার্জ্জিত বিশ্বাস ও আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়া কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্বের একান্ত 'বাধ্য ভক্ত' হইয়া পড়িবেন—কিন্তু তাঁহাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। সুভাষচন্দ্রের বজ্রাদপি কঠোর ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব কাহারও নিকট কোন কারণেই আত্মবিক্রয় করিতে জানে না।

ষোল

১৯৩৮ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী জাতীয় মহাসভার ৫১তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তাপ্তী নদীর তীরে হরিপুরা গ্রামে এই বিরাট অধিবেশনের আয়োজন হয়। ২৪শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র বিমানযোগে ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে করাচী বিমান ঘাঁটিতে দেশবাসী এই নব-নির্ব্বাচিত সভাপতিকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। ১৪ই ফেব্রুয়ারী ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হইবার কথা। ১১ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় অধিবেশনে পৌরোহিত্য করিবার নিমিত্ত সুভাষচন্দ্র কলিকাতা হইতে বোম্বাই মেল-যোগে হরিপুরা যাত্রা করেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারী বার্দ্দোলী ষ্টেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি দরবার গোপাল দাস দেশাই ও সর্দ্দার প্যাটেল তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর তাঁহাকে মোটর যোগে হরিপুরা গ্রামে স্বর্গত কালুভাই প্যাটেলের গৃহে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে বাসন্তী রঙের সাড়ি পরিহিতা একশত স্বেচ্ছাসেবিকা ও সমাগত স্বেচ্ছা-সেবকবৃন্দ নবীন রাষ্ট্রপতিকে সম্বর্দ্ধনা করেন। একদল বালিকা তাঁহার কপালে কুমকুম পরাইয়া আরতি সহযোগে তাঁহাকে বন্দনা করে। তৎপর সুভাষচন্দ্র ও দরবার গোপালদাস একান্নটি বলিবর্দ্দ বাহিত একখানি সুসজ্জিত নানালঙ্কারপরিশোভিত রথে অরোহন করিয়া অধিবেশন মণ্ডপের দিকে অগ্রসর হন। সেই রথের পশ্চাতে ছয়খানি শকটে সর্দ্দার প্যাটেল ও অভ্যর্থনা সমিতির অন্যান্য কর্ম্মকর্ত্তারা অনুগমন করেন। চার মাইল দীর্ঘ এই শোভাযাত্রার প্রতি পংক্তিতে দশজন করিয়া লোক ছিল। পথের উভয় পার্শ্বে পল্লীবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিপুল হর্ষধ্বনি সহকারে শোভাযাত্রীদের অভিনন্দিত করিতেছিল। শোভাযাত্রা সভামণ্ডপে পৌঁছিতে দুইঘণ্টা লাগে। শোভাযাত্রা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র বলেন, "বিরাট

জনতা আমাকে যে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়াছে, তাহা আমাকে অভিভূত করিয়াছে। এই শোভাযাত্রার বর্ণনা প্রদান করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে।" স্বর্গত বিটলভাই প্যাটেলের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত অধিবেশন মণ্ডপের নাম রাখা হয় 'বিটল নগর'। কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশনকে স্মরণীয় করিবার জন্য মণ্ডপের ৫১টি তোড়নে ৫১টি জাতীয় পতাকা উড়িতে থাকে, ৫১টি জাতীয় সঙ্গীত গীত হয়, এবং ৫১টি বলিবর্দ্ধ কর্ত্তৃক সভাপতির রথ বাহিত হয়।

১৯শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণে বিচিত্র সমারোহে ও মনোহর দৃশ্যরাজির মধ্যে 'বিটলনগরে' ভারতীয় জাতীয় মহাসভার ৫১তম অধিবেশন আরম্ভ হয়। সুভাষচন্দ্র এই জাতীয় যজ্ঞের ঋত্বিক। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত দুই লক্ষাধিক নর-নারীর সমাবেশে 'বিটলনগর' জনসমুদ্রে পরিণত হইয়াছে। বাঙলার একদল গায়িকা কর্তৃক সুললিত কণ্ঠে বন্দে-মাতরম্ সঙ্গীত গীত হওয়ার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি গোপালদাস সমাগত প্রতিনিধি ও দর্শক বৃন্দকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া তাঁহার সংক্ষিপ্ত অথচ চিত্তাকর্ষক অভিভাষণ পাঠ করেন। অতঃপর বিপুল জয়-ধ্বনির মধ্যে মাল্যবিভূষিত রাষ্ট্রপতি বক্তৃতামঞ্চে আরোহণ করেন। শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার জ্ঞানগর্ভ অভিভাষণ শ্রবণ করে।

হরিপুরা কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের অভিভাষণের সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

সাম্রাজ্যের পরিণতি—গ্রেট-ব্রিটেনের প্রতি সতর্কবাণী— মানব-ইতিহাসে সাম্রাজ্যসমূহের উত্থান-পতনই সর্ব্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাচ্যের মত প্রতীচ্যের ক্রমবর্দ্ধমান সাম্রাজ্যসমূহ একসময় উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছে এবং ক্রমশঃ ক্ষীণায়ু হইতে হইতে আবার সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছে। প্রাচীন যুগের রোমক সাম্রাজ্য এবং বর্ত্তমানযুগের তুর্কী ও অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যসমূহ এই

বিশ্ব-নীতির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ভারতের মৌর্য্য, গুপ্ত ও মুঘল সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও এই নীতির ব্যতিক্রম হয় নাই। বিশ্বের ইতিহাসের এই সমস্ত দৃষ্টান্তের পরেও, ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের ভিন্নরূপ পরিণতি হইবে, ইহা বলিতে কেহ সাহসী হইবেন কি? ইতিহাসের চৌমুহনী রাজপথে আজ ব্রিটীশ সাম্রাজ্য দণ্ডায়মান, ইহাকে অন্যান্য সাম্রাজ্যসমূহের পন্থানুসরণ করিতে হইবে, অথবা স্বাধীন জাতিসমূহের স্বেচ্ছাগঠিত যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হইতে হইবে। এই দুইটির যে কোন পন্থাই ইহার জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে জারের সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে এবং সেই ধ্বংসস্তূপের ভস্মরাশি হইতেই পুনরায় সোভিয়েট রাশিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। গ্রেট বৃটেনের পক্ষে রাশিয়ার ইতিহাস হইতে শিক্ষালাভের এখনও অবকাশ রহিয়াছে। বৃটেন ইহার সুযোগ গ্রহণ করিবে কি? ব্রিটীশ সাম্রাজ্য আজ নানাবিধ প্রভাবে প্রপীড়িত। বর্ত্তমানে বৃটেন 'সমুদ্রের রাণী' বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারে না। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে নৌ-শক্তির বলেই বৃটেনের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। বিমান-শক্তির অভাবেই বিংশ-শতাব্দীতে বৃটেনের প্রাধান্য বিনষ্ট হইয়াছে এবং বিশ্বরাজনীতি-ক্ষেত্রে ক্ষমতার সামঞ্জস্য রক্ষার নীতি গুরুতররূপে পর্য্যুদস্ত হইয়াছে। বিরাট ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল আজ যেরূপ শিথিল হইয়াছে পূর্ব্বে কখনও এইরূপ হয় নাই।

ভারতবর্ষের সুযোগ—বিশ্বশক্তিসমূহের বর্ত্তমান ঘাত-প্রতিঘাত—বিশ্ব-পরিস্থিতির এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে ভারতবর্ষ আজ নবতর শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। বিরাট মহাদেশ-সদৃশ আমাদের জন্মভূমিতে পঁয়ত্রিশ কোটি লোকের বাস। দেশের এই বিপুল লোকসংখ্যা ও বিরাট পরিধি এতাবৎকাল আমাদের দুর্ব্বলতার কারণ ছিল। আজ যদি সম্মিলিত হইয়া আমরা শাসকসম্প্রদায়ের সম্মুখীন হইতে পারি, তবে উহা আমাদের বর্দ্ধিত শক্তিরই প্রমাণ দিবে। ভারতের এই ঐশ্বর্য্যের বিষয় উল্লেখের সময়

আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্রিটীশভারতের সহিত দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের বিভেদের সীমারেখা কৃত্রিম। ভারতবর্ষ অখণ্ড এবং ব্রিটীশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা লাভই আমাদের সকলের আদর্শ। যে গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহ স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করিতে পারে, আমার মতে, তাহার মধ্য দিয়াই এই স্বাধীনতা লাভ করা যাইবে। গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্ত্তনের জন্য দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণ যে আন্দোলন করিতেছেন কংগ্রেস উহা সমর্থন করিয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইহার অতিরিক্ত কোন সাহায্য প্রদানে কংগ্রেস সক্ষম না হইলেও, কংগ্রেস-কর্ম্মীদের পক্ষে দেশীয় রাজ্যের আন্দোলনে ব্যক্তিগতভাবে সহায়তা করিবার কোন বিধিনিষেধ নাই। দেশীয় রাজ্যের সহকর্ম্মীরা আমাদের সহানুভূতি ও সাহায্যলাভের আশায় রহিয়াছেন, ইহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

সংখ্যালঘুসম্প্রদায়ের সমস্যা—ভারতের ঐক্যের বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্যার উল্লেখ করিতে হয়। কংগ্রেসের এতৎসম্পর্কিত নীতি বহুবার ঘোষিত হইয়াছে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তাহাতে ভ্রান্তধারণার সৃষ্টি ও কংগ্রেস-নীতি বিকৃত হওয়ায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত প্রস্তাবে তাঁহাদের নীতি পুনরায় ঘোষণা করেন। মৌলিক অধিকারঘটিত প্রস্তাবে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, লোকের ধর্ম্ম, বিবেক ও সংস্কৃতি বিষয়ক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হইবে না এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় তাঁহাদের ব্যক্তিগত নিয়মকানুন অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ভারতের ঐক্যের পরিপন্থী ও জাতীয়তার বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করা সত্ত্বেও কংগ্রেস বলিয়াছেন যে,

সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের অভিমত অনুসারেই ইহার পরিবর্ত্তন করা হইবে। পারস্পরিক আপোষ-মীমাংসার দ্বারা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পরিবর্ত্তন সাধনের সুযোগ গ্রহণ করিতে কংগ্রেস সর্ব্বদা উৎসুক।

সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে নূতন উদ্যমে আত্ম-নিয়োগ করিবার সময় বর্ত্তমানে সমুপস্থিত। ধর্ম্মবিষয়ে 'নিজেরা বাঁচিয়া থাক এবং অপরকে বাঁচিতে দাও'—এই নীতি গ্রহণ এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে একটি আপোষ-মীমাংসা করা খুবই সঙ্গত হইবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্যার কথা চিন্তা করিতে মুসলমানদের কথা বড় হইয়া দেখা দিলেও অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বিষয়েও যথাযোগ্য মনোযোগ প্রদান করিতে কংগ্রেস ব্যগ্র। অখণ্ড ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষার দাবী লইয়াই আজ কংগ্রেস সংগ্রামরত। কংগ্রেসের অভীষ্টলাভ হইলে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহও উপকৃত হইবে। ভারতের স্বাধীনতালাভে মুসলমানদের শঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই—লাভবান হইবারই বরং সুবিধা রহিয়াছে। বিগত সতের বৎসর ধরিয়া কংগ্রেস তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক অসুবিধা দূরীকরণের নানারূপ চেষ্টা করিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে সে সকল অসুবিধা দূরীভূত হইবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা—এখন আমি কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নীতি ও কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে কিছু বলিব। জাতীয় সংগ্রামে অহিংস-অসহযোগ অথবা সত্যাগ্রহ কংগ্রেসের কর্ম্মপন্থা হইবে, ইহা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। এই অহিংস-অসহযোগ কথাটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে এবং ইহার মধ্যে আইন-অমান্য আন্দোলনও নিহিত থাকিবে। ইহাকে কেবলমাত্র নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বলা সঙ্গত হইবে না; কারণ, সত্যাগ্রহ বলিতে আমি নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় উভয় প্রকার প্রতিরোধই বুঝিয়া থাকি। তবে এই সক্রিয়

প্রতিরোধ সম্পূর্ণ অহিংস ধরণের হইবে। আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমানে দুইটি পন্থা রহিয়াছে। পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালনা এবং সংগ্রামের পথে যে সকল ক্ষমতা আমাদের হস্তে আসিবে তাহা গ্রহণে অস্বীকার করা অথবা পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকালে আমাদের অবস্থিতিকে সুদৃঢ় করা—এই দুই পন্থার একটি পন্থা আমাদিগকে বাছিয়া লইতে হইবে। নীতির দিক দিয়া উভয় পন্থাই গ্রহণযোগ্য। তবে আমরা যে পন্থাই গ্রহণ করি না কেন, ব্রিটীশ সম্পর্কচ্ছেদের প্রতি আমাদের চরম লক্ষ্য থাকিবে। যখন ঐ সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইবে এবং আমাদের ভারতবর্ষে ব্রিটীশ প্রভুত্ব নিশ্চিহ্ন হইবে, তখনই তাহাদের সহিত মৈত্রীসূচক চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার মত আমাদের অবস্থা হইবে। আয়ার্ল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতির ন্যায় আমিও বলিতে চাই যে, ব্রিটীশ জনসাধারণের প্রতি আমরা বিন্দুমাত্র বৈরীভাব পোষণ করি না। গ্রেট বৃটেনের সহিত আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নির্ণয় করিবার অধিকার অর্জ্জনের নিমিত্ত আমরা সংগ্রাম করিতেছি। আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের পর ব্রিটীশ জনগণের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ না হইবার কোন কারণই নাই।

স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেসের কর্ত্তব্য—জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে কংগ্রেসের অবস্থিতি কোথায়—অনেক কংগ্রেসকর্ম্মীর মনেই এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নাই। আমি জানি, আমাদের বহু বন্ধুর মনে এইরূপ ধারণা আছে যে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া যাইবে এবং উহার আর কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। আমি বলিতে চাই যে, স্বাধীনতা লাভের পরও কংগ্রেসের অস্তিত্ব মুছিয়া যাইবে না—বরং তখনই কংগ্রেসকে শক্তি, দায়িত্ব ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার গুরুভার গ্রহণ করিতে হইবে এবং পুনর্গঠনমূলক কর্ম্মসূচীকে কার্য্যকরী করিতে হইবে। জোর করিয়া কংগ্রেসের মূলে কুঠারাঘাত করিলে দেশব্যাপী অনর্থের সৃষ্টি হইবে।

মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী ইউরোপের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখা যায় যে, যে সকল দেশে শক্তিশালী দল পুনর্গঠনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, সেই সকল দেশে জাতীয় অগ্রগতি অব্যাহত রহিয়াছে।

কংগ্রেস ও সমাজিক পুনর্গঠন—ভবিষ্যৎ সমাজ-গঠন ব্যবস্থার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান বর্ত্তমানে সম্ভব না হইলেও, আমার বিশ্বাস এই যে, কেবলমাত্র সমাজ-তান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারাই দারিদ্র্য-মোচন, নিরক্ষরতা ও ব্যাধি দূরীকরণ এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পর্কিত আমাদের প্রধান জাতীয় সমস্যাসমূহের সমাধান হইতে পারে। এই পুনর্গঠন কার্য্যে আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় সরকারকে সর্ব্বাগ্রে একটি কমিশন নিয়োগ করিতে হইবে। এই কমিশন জাতিগঠনের ব্যাপক কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ করিবেন। কমিশন কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত কর্ম্মপন্থার দুইটি অংশ থাকিবে। প্রথম অংশে অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করিবার উপযোগী একটি কর্ম্মপন্থা এবং দ্বিতীয় অংশে, কিছুকাল যাবৎ অনুসরণের যোগ্য অপর একটি কর্ম্মপন্থা থাকিবে। প্রথম অংশ রচনার সময় নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে :—

(১) আত্মত্যাগের জন্য দেশকে প্রস্তুত করা,

(২) দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা,

(৩) ব্যক্তিগত ও সংস্কৃতিগত স্বাধীনতা।

যে বৈদেশিক শাসনের ফলে আমরা আজ পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও হেয় অবস্থায় পতিত, আমাদের স্কন্ধ হইতে সেই গুরুভার অপসারণের পর সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত বিশেষ সচেষ্ট হইতে হইবে। জাতীয় ঐক্যবৃদ্ধির নিমিত্ত একটি সাধারণ বর্ণমালা ও রাষ্ট্রীয় ভাষার প্রবর্ত্তন প্রয়োজন। অতঃপর বিমান, টেলিফোন, বেতার, চলচ্চিত্র, টেলিভিসন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভারতের বিচ্ছিন্ন

অংশকে একত্রিত করিয়া একটি সাধারণ শিক্ষানীতির দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় ভাবের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। সাধারণ বর্ণমালা প্রবর্ত্তনের বিষয় আমি পুনরায় বলিতেছি। যাহাতে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির নিকটবর্ত্তী হইতে পারি আমাদিগকে এইরূপ একটি বর্ণমালা গ্রহণ করিতে হইবে। রোমান বর্ণমালা প্রবর্ত্তনের কথা বলিলে অনেকেই হয়ত আতঙ্কিত হইবেন; কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা আমি তাঁহাদিগকে এই সমস্যাটি বিবেচনা করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। দেশের শতকরা নব্বইজন লোক অশিক্ষিত এবং তাহারা কোন বর্ণমালার সহিত পরিচিত নহে। এইরূপ ক্ষেত্রে যে বর্ণমালাই প্রবর্ত্তন করি না কেন, তাহাতে তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না। রোমান বর্ণমালা গ্রহণের ফলে তাহারা অনায়াসে আর একটি ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা করিতে পারিবে—এই বিষয়ে চিন্তা করিবার জন্য আমি দেশবাসীকে অনুরোধ করিতেছি। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে আমার অভিমত এই যে, হিন্দী ও উর্দ্দুর মধ্যে পার্থক্য কৃত্রিম—সুতরাং, এতদুভয়ের সংমিশ্রণেই আমাদের রাষ্ট্রভাষার সৃষ্টি হওয়া উচিত।

দারিদ্র্য দূরীকরণই পুনর্গঠনকার্য্যে আমাদের প্রধান ও প্রাথমিক কর্ত্তব্য হইবে। এতদুদ্দেশ্যে ভূমি-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ প্রয়োজন। কৃষি-ঋণ মকুব করিতে হইবে এবং পল্লীবাসীদের জন্য অল্পসুদে অর্থসাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। উৎপাদক ও গ্রাহক উভয়ের সুবিধার নিমিত্ত সমবায় আন্দোলনের প্রসারের চেষ্টা করিতে হইবে। অধিকতর ফসল উৎপাদনের জন্য বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকার্য্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

একমাত্র কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতির দ্বারা জাতির অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হইবে না; রাষ্ট্রীয় অধিকারে ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে শিল্পবাণিজ্যের প্রসারও প্রয়োজন। ভারতের অভ্যন্তরে বৈদেশিক শাসন

বিদ্যমান থাকিবার এবং বাহিরে শিল্পবাণিজ্যের প্রসার হইবার ফলে, এই দেশের পুরাতন শিল্পবাণিজ্য-পদ্ধতি ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। উহার স্থলে নূতন পদ্ধতি গ্রহণ প্রয়োজন। আধুনিক ফ্যাক্টরীসমূহের প্রতিযোগিতা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও কোন্ কোন্ কুটীর-শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা হইবে এবং ব্যাপকভাবে উৎপাদনের নিমিত্ত কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করা হইবে, পুনর্গঠন কমিশন তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন। এই কমিশনের সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রকে আমাদের কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থাকে উৎপাদন ও ব্যবহারের উভয়ক্ষেত্রেই সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী পুনর্গঠিত করিতে হইবে। যেই প্রকারেই হউক, অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই কার্য্যে অতিরিক্ত মূলধন নিয়োজিত করিতে হইবে।

কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী—ভারতের এগারটি প্রদেশের মধ্যে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব নূতন শাসন-তন্ত্রের প্রাদেশিক অংশে বিরোধিতার সম্ভাবনা নাই। ইহার ফলে কংগ্রেসকে কেবলমাত্র সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী করা যাইতে পারে। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের আমলে কিরূপে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করা সম্ভব? সর্ব্বপ্রথম আমলাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে; ইহা অসম্ভব হইলে কংগ্রেসের পক্ষে দুঃখের কারণ হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মাদক-দ্রব্য বর্জ্জন, কারা-সংস্কার, সেচ-শিল্পবাণিজ্য-ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার, শ্রমিক ও কৃষিমঙ্গল প্রভৃতি বিষয়ে জাতিগঠনমূলক পন্থা অবলম্বন করিবেন। এই সমস্ত বিষয়ে ভারতের সর্ব্বত্র অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন সঙ্গত। দুইটি উপায়ে এই ঐক্য-ব্যবস্থা বাস্তবে পরিণত হইতে পারে। প্রথমতঃ, বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ সম্মিলিত হইয়া একটি সমভাবাপন্ন কর্ম্মপন্থা নিদ্ধারণ করিতে পারেন; দ্বিতীয়তঃ, বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শানুসারে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বিভিন্ন সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে সাহায্য করিতে

পারেন। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে সহায়তা করিবার সময় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণকে উক্ত প্রদেশসমূহের বিভিন্ন সমস্যার সহিত পরিচিত থাকিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে কিছু বলিতে চাই। এই কমিটি কেবলমাত্র ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের সৈন্যদল নিয়ন্ত্রণ-সঙ্ঘ নহে, ইহা স্বাধীন ভারতের মন্ত্রিসভা। সেইজন্য ওয়ার্কিংকমিটিকে স্বাধীন ভারতের প্রাক্-মন্ত্রিসভার ন্যায় কার্য্য করিতে হইবে। রাষ্ট্রপতি ডি, ভ্যালেরার প্রজাতন্ত্র যখন ব্রিটীশ সরকারের সহিত সংগ্রামলিপ্ত ছিল, তখন তাঁহারাও এইরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। শাসনাধিকার লাভের পূর্ব্বে মিশরের ওয়াকফদলও এইরূপ নীতি গ্রহণ করিয়াছিল।

ওয়ার্ধা প্রস্তাব—প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার বিরোধিতা— প্রাদেশিক কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের কার্য্যপরিচালনা অপেক্ষা নূতন শাসনতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনাকে কিভাবে বাধা দান করিতে হইবে, তাহা বিবেচনার আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটির বিগত ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর ওয়ার্দ্ধা অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা সম্পর্কিত কংগ্রেসের মনোভাব সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতি কর্ত্তৃক বিবেচিত হইবার পর এই প্রস্তাবটি বর্ত্তমান অধিবেশনে আলোচিত হইবে।

যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার প্রতি বিরুদ্ধভাব পোষণের কারণ সম্পর্কে আমি দুই একটি কথা বলিতেছি। নূতন শাসনতন্ত্রের বাণিজ্য ও অর্থ-বিষয়ক রক্ষাকবচগুলিই এই পরিকল্পনার প্রতি আমাদের বিরুদ্ধভাব পোষণের অন্যতম কারণ। কেবলমাত্র দেশরক্ষা বিভাগ ও পররাষ্ট্র নীতিতে জনসাধারণের অধিকার থাকিবে না এমন নহে, ইহাতে সরকারের ব্যয়ের অধিকাংশ অংশের উপর জনগণের প্রতিনিধিবর্গের বিন্দুমাত্র কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের বাজেট প্রস্তাব

অনুসারে সরকারের মোট ব্যয়ের শতকরা সাতান্ন ভাগই সেনাদলের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের যে সংরক্ষিত অংশ বড়লাট কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে তাহা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয়ের শতকরা আশী ভাগ। ইহা ব্যতীত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, যুক্তরাষ্ট্রীয় রেল বিভাগ প্রভৃতি ব্যবস্থাতন্ত্র ইতিমধ্যেই গঠিত হইয়াছে; উহা যুক্তরাষ্ট্রের নামমাত্র অধীনে পরিচালিত হইবে। রেল বিভাগের নীতি সম্পর্কে আইনসভার কোন কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না;—মুদ্রানীতি ও বাটার হার নির্দ্ধারণের ব্যাপারটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির মূলকথা হইলেও তাহার উপর এই আইনসভার কোন কর্ত্তৃত্বই থাকিবে না। পররাষ্ট্রবিষয়ক ব্যাপারগুলি প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে সংরক্ষিত বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইহাতে অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি করিবার সাধারণ স্বাধীনতাটি পর্য্যন্ত ভারতীয় আইনসভাকে প্রদান করা হয় নাই। এতদ্বারা আর্থিক স্বাধীনতা গুরুতররূপে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ভারত শাসন আইনে যে সকল বাণিজ্যসংক্রান্ত অসম-সংরক্ষণ ব্যবস্থার নির্দ্দেশ আছে, তাহাতে ভারতের জাতীয় শিল্প-বাণিজ্যও যখন ব্রিটীশ স্বার্থের প্রতিকূল হইবে (উহা সর্ব্বদাই হইতে বাধ্য), তখন কোনরূপ ব্যবস্থার দ্বারা ঐগুলিকে রক্ষা করা বা উহার প্রসারে সহায়তা করা সম্ভব হইবে না। এই ভারত শাসন আইনে যে সকল অসমঞ্জস বাণিজ্যিক নীতি আছে, তাহা যথযথ প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা রহিয়াছে। ইহা ছাড়া যদি কখন কোন ব্রিটীশ-পণ্যের উপর অতিরিক্ত আমদানী-শুল্ক ধার্য্যকরণ বা অন্য কোন প্রকারে উহার আমদানী সম্পর্কে কড়াকড়ি ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব হয়, তবে বড়লাট উহা অগ্রাহ্য করিয়া দিতে পারেন। এই সমস্ত ব্যবস্থা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতাবলে বাতিলের বহির্ভূত ব্রিটীশ স্বার্থবিরোধী কোন প্রস্তাব আইন-পরিষদে বা শাসনতন্ত্রের অন্য যে কোন ক্ষেত্রে হইতে পারিবে না। দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য রক্ষাকল্পে জাতীয় প্রচেষ্টার মধ্যে

প্রয়োজনমত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের অধিকার আমরা কোনক্রমেই ত্যাগ করিতে পারি না।

বৈদেশিক বাণিজ্যনীতি—আর্থিক স্বাধীনতা ও বাণিজ্যবিষয়ক সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় একটি কার্য্যকরী বৈদেশিক বাণিজ্যনীতির কথা বলিব। ভারতের রপ্তানী-বাণিজ্য ও ইহার বৈদেশিক বাধ্যবাধকতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যাপকভাবে ঐরূপ নীতির বিবেচনা করিতে হইবে। অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত ভারতের বাণিজ্য-চুক্তি সাধন দুর্ঘট হয় অথবা সাম্রাজ্যের বাহিরের যে সমস্ত দেশ ভারতীয় পণ্যের ক্রেতা তাহাদের সহিত ব্যবসাক্ষুণ্ণকর কোনপ্রকার চুক্তি ইংলণ্ডের সহিত করা সঙ্গত হইবে না। ভারতের বহির্বাণিজ্যের পক্ষে ইহা একান্ত আবশ্যক। দুঃখের বিষয়, এখনও ইঙ্গভারতীয় বাণিজ্য-আলোচনা চলিতেছে; পক্ষান্তরে অটোয়া চুক্তির নোটিশের কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং ভারতীয় আইনসভা কর্ত্তৃক নাকচের সিদ্ধান্তসত্ত্বেও উহাকে এখনও বহাল রাখা হইয়াছে। বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য-চুক্তি হইলে, ইংলণ্ডের অনুকূলে তুলাদণ্ড ঝুঁকিয়া পড়িবেই। বাণিজ্য-চুক্তির আশ্রয়ে এই দেশে অ-ভারতীয় কায়েমী-স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত হইতে দিবার পূর্ব্বে উহার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ও আর্থিক ফলাফল সম্বন্ধেও আমাদিগকে সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিতে হইবে। আমি আশাকরি, বর্ত্তমানে যে ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্য-চুক্তির আলোচনা চলিতেছে, তাহাতে অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সরাসরি বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদনে বাধা উপস্থিত হইবে না এবং ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট ঐরূপ কোন চুক্তি স্বাক্ষর করিবে না।

প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডল ও প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলের ক্ষমতার তুলনা করা যায় না। তাহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের গঠন অত্যন্ত

প্রগতিবিরোধী। দেশীয় রাজ্যসমূহের লোকসংখ্যা সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার শতকরা প্রায় চব্বিশজন মাত্র। তাহা সত্ত্বেও দেশীয় রাজ্য-সমূহের নৃপতিগণকে (তাঁহাদের প্রজাবৃন্দকে নহে) যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার নিম্নতর পরিষদে শতকরা তেত্রিশটি ও উচ্চতর পরিষদে শতকরা চল্লিশটি আসন দেওয়া হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে, যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব কখনও পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা নাই। সরকার যে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা এ দেশের স্কন্ধে চাপাইতে চাহিতেছেন, তাহাতে বাধা প্রদান করিবার সাফল্যের উপরই আমাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। সর্ব্বপ্রকার বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমাদিগকে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে—সর্ব্বশেষে আমা-দিগকে হয়ত ব্যাপক আইন-অমান্য আন্দোলনের আশ্রয় লইতে হইবে। ভবিষ্যতে যদি এইরূপ ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, তবে তাহা কেবল ব্রিটীশ ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না, দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের মধ্যেও উহা বিস্তৃতি লাভ করিবে।

স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী—অদূর ভবিষ্যতে কোন সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইলে আমাদিগকে যথাযথভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে জনজাগরণ এরূপ ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে যে আমাদের দল পরিচালনা সম্পর্কে বহু নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে কোন সভা-সমিতিতে পঞ্চাশ হাজার নরনারীর সমাবেশ হইয়া থাকে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে এইরূপ সভা ও শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। ইহা ছাড়া এই বিরাট জন-জাগরণকে কেন্দ্রীভূত করিয়া সুনির্দ্দিষ্ট পথে চালিত করিবার বৃহত্তর সমস্যাও বিদ্যমান। এই জন্য আমাদের সুসংবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী আছে কি? ভবিষ্যৎ নেতৃবৃন্দ ও তরুণ কর্ম্মীদের জন্য আমরা কোনপ্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছি কি? আধুনিক রাজনৈতিক দলের এই সকল প্রয়োজন মিটাইবার এখন সময়

আসিয়াছে। সুশিক্ষিত অধিনায়কবৃন্দ পরিচালিত একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী আজ আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। রাজনৈতিক কর্ম্মীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে ভবিষ্যতে আমরা যোগ্য রাজনৈতিক নেতা লাভ করিতে পারিব। বিলাতে নিদাঘ-বিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে—এইরূপ শিক্ষাদান একনায়কত্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইউরোপের কোন কোন দেশ কি-ভাবে এই সমস্যার সমাধান করিতেছেন, তাহা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। আমাদের আদর্শ ও শিক্ষার প্রণালী তাঁহাদের সহিত সামঞ্জস্যহীন হইলেও, ইহা সর্ব্বজনস্বীকৃত যে আমাদের কর্ম্মীদের জন্য বৈজ্ঞানিক ধারায় সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রয়োজন। নাৎসীদের শ্রমিক সেবাবাহিনীর (Labour Service Corps) ন্যায় প্রতিষ্ঠান বিশেষ বিবেচনাযোগ্য এবং উপযুক্তভাবে সংশোধন করিয়া প্রবর্ত্তন করিলে উহা ভারতের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে।

কিষাণ সভাসমূহ—সঙ্ঘানুবর্ত্তিতার আলোচনা প্রসঙ্গে আর একটি সমস্যা সম্পর্কেও আমাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে। ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সহিত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও কিষাণ সভাসমূহের সম্পর্কের কথাই আমি বলিতেছি; উহা আমাদের উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। কেহ কেহ কংগ্রেসের বহির্ভূত যে-কোন প্রতিষ্ঠানের নিন্দা করেন এবং কেহ কেহ উহাদের আবশ্যকতা স্বীকার করেন। আমার মতে, উহাদের অস্তিত্ব আমরা পছন্দ করি বা না করি, উহাদের সহিত আমাদিগকে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। প্রশ্ন হইতেছে, উহাদের প্রতি কংগ্রেসের কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। রাজনৈতিক অধিকার লাভের সংগ্রামে কংগ্রেস জনগণের প্রতিনিধি। কংগ্রেসের বিরোধীদলরূপে এই সকল প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না। সুতরাং, এই সকল প্রতিষ্ঠানকে কংগ্রেসের আদর্শে ও কার্য্যপন্থায় উদ্বুদ্ধ হইয়া

কংগ্রেসের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। এইজন্ত ট্রেড ইউনিয়ন ও কিষাণ সভাসমূহে কংগ্রেস কর্ম্মীবৃন্দের দলে দলে যোগদান কর্ত্তব্য। শ্রমিক ও কৃষকদের আর্থিক দুরবস্থার প্রতি অধিক অবহিত হইয়া ট্রেড ইউনিয়ন ও কিষাণ সভাসমূহ যদি কংগ্রেসকে দেশের মুক্তিসাধনার সার্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করেন, তবে কংগ্রেস ও উক্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা সহজসাধ্য হইতে পারে। সমষ্টিগত সমর্থন বা সংযোগসাধনের কথা ছাড়িয়া দিলেও, কংগ্রেসের সহিত সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদল গঠনে বহু বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের পক্ষে আমি ওকালতি করিতেছি না এবং আমি উহার সদস্য নহি। তাহা সত্ত্বেও আমি বলিব যে ইহার সাধারণ নীতির সহিত আমি প্রথম হইতেই একমত। প্রথমতঃ, বামপন্থীদের একটি দলে সুসংহত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়তঃ বামপন্থীদলের প্রকৃতি যদি সমাজতন্ত্রমূলক হয়, তাহা হইলে একটি বামপন্থী 'ব্লক' (বিরোধীদল) থাকার সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে। এইরূপ 'ব্লক'কে দল বলা হইলে অনেকে আপত্তি করেন। আমার মতে, এইরূপ পার্থক্য সৃষ্টির কোন অর্থ হয় না। ভারতীয় জাতীয় মহাসভার নিয়মতন্ত্র অনুসারে ঐরূপ চরমপন্থী বিরোধীদল গঠন করা কিছুই অন্যায় নহে—উহাকে দল বা লীগ বা ব্লক যে কোন নামই দেওয়া যাইতে পারে। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদল বা অনুরূপ দলকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী বা চরমপন্থীদল স্বরূপ কার্য্য করিতে হইবে। সমাজতন্ত্রবাদ আমাদের আশু সমাধানযোগ্য সমস্যা নহে; কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের পর সমাজতন্ত্রবাদ গ্রহণের জন্য দেশকে প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রচারকার্য্যের প্রয়োজন রহিয়াছে। সুতরাং সমাজতন্ত্রবাদে আস্থাবান কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলের দ্বারা সেই প্রচার-কার্য্য চলিতে পারে।

পররাষ্ট্রনীতি ও বিদেশে প্রচার কার্য্য—গত কয়েক বৎসর যাবৎ একটি সমস্যা সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ আগ্রহান্বিত। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জ্জাতিক সংযোগ স্থাপনের বিষয় উপস্থিত করাই আমার উদ্দেশ্য। আমার মনে হয় যে আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে যে তাহা ভারতের মুক্তিসংগ্রামের অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হইবে। সেই জন্য বিশ্বপরিস্থিতির প্রত্যেকটি পরিবর্ত্তন সম্পর্কে সচেতন থাকিতে হইবে এবং কিরূপে তাহার সুযোগ গ্রহণ করা যায় তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। আমাদের সম্মুখে মিশরের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কোনপ্রকার হিংসাত্মক নীতি গ্রহণ না করিয়া মিশর কিরূপে স্বাধীনতার সন্ধি-চুক্তি আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিল? তাহারা ভূমধ্যসাগরে ইঙ্গ-ইতালীয় বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তাহা সম্ভব হইয়াছিল।

আমাদের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে কোন দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি বা উহার রাষ্ট্রীয় গঠন আমাদিগকে যেন প্রভাবান্বিত না করে। প্রত্যেক দেশেই ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নরনারী থাকিবেই। প্রত্যেক দেশেই ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নরনারীর দল গঠন করিতে হইবে। বিদেশে যে সকল ভারতীয় ছাত্র আছে, তাহারাও আমাদের এই প্রচেষ্টায় সহায়তা করিতে পারে। ভারতীয় ছাত্রদের অভাব-অভিযোগের প্রতি আমরা দৃষ্টি রাখিতে পারিলে, তাহারাও এই বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করিবে। বিদেশের ভারতীয় ছাত্রগণের সহিত ভারতের জাতীয় মহাসভার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রাখিতে হইবে। আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত ছায়াচিত্র যদি আমরা বিদেশে পাঠাইতে পারি, তবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জনসাধারণ আমাদের বিষয় অবগত হইবে এবং আমরা তাঁহাদের সহানুভূতি লাভ করিতে সমর্থ হইব। আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করিয়া তুলিতে

হইলে ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকায় জাতীয় মহাসভার বিশ্বস্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত আন্তর্জ্জাতিক সভা বা সম্মেলনে ভারতবর্ষকে যোগদান করিতে হইবে। এইরূপ সভাসম্মেলনে যোগদানের ফলে ভারতের প্রয়োজনীয় প্রচারকার্য্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে এবং বিশ্বজনমতের নিকট ভারতের দাবী স্বীকৃত হইবে।

এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে—বিশেষতঃ জাঞ্জিবার, কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, মালয় ও সিংহলের প্রবাসী ভ্রাতৃবৃন্দের অভাব-অভিযোগ ও সমস্যার বিষয় আমরা যেন বিস্মৃত না হই। তাঁহাদের সম্পর্কে কংগ্রেস সর্ব্বদা গভীর মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন। আমরা এখনও দাস-জীবন যাপন করিতেছি বলিয়া তাঁহাদের জন্য প্রয়োজনানুরূপ কিছু করা হয়ত আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। স্বাধীন ভারত বিশ্বের রাজনীতিক্ষেত্রে বিরাট শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে; তখন প্রবাসী ভারতীয়দের স্বার্থসংরক্ষণে কোন বাধার সৃষ্টি হইবে না।

এই প্রসঙ্গে পারস্য, আফগানিস্থান, নেপাল, চীন, ব্রহ্ম, শ্যাম, মালয়, পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও সিংহল প্রভৃতি প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত সংস্কৃতিগত ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের আবশ্যকতার উল্লেখ করিতে চাই। এই সমস্ত রাষ্ট্রের সহিত পারস্পরিক পরিচয় ও সহযোগিতা থাকিলে উভয় পক্ষেরই কল্যাণ হইবে। ব্রহ্ম ও সিংহলের সহিত আমাদের সংযোগ বহু যুগের বলিয়া এই দুইটি রাষ্ট্রের সহিত ঘনিষ্ঠতম সংস্কৃতিগত সম্পর্ক রাখিতে হইবে।

আটক ও রাজনৈতিক বন্দী—এক্ষণে আমি আটক এবং রাজনৈতিক বন্দীদের সমস্যার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উহাই বর্ত্তমানে আমাদের প্রধান সমস্যা। বন্দিগণের অনশনের ফলে এই সমস্যাটি জনসাধারণের নিকট আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

তাহাদের আশু মুক্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমার বিশ্বাস, আমার এই মন্তব্যে কংগ্রেসের মনোভাব ব্যক্ত হইবে।

যে সকল আটক ও রাজনৈতিক বন্দী কারাগারের ভিতরে ও বাহিরে অবরুদ্ধ আছেন, তাঁহারাই কেবল দুঃখভোগ করিতেছেন না; যাঁহারা আজ মুক্তি পাইয়াছেন, তাঁহাদের অবস্থাও অধিকাংশক্ষেত্রে শোচনীয়। যক্ষার মত নানারূপ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইয়া ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া তাঁহারা গৃহে ফিরিয়াছেন। অনাহারের ভয়াবহ সম্ভাবনা তাঁহাদের সম্মুখে। আত্মীয়-পরিজনবর্গের হাসিমুখের অভ্যর্থনার পরিবর্ত্তে, অশ্রুজলের করুণ অভিনন্দন তাঁহারা লাভ করেন। মাতৃভূমির সেবায় জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ উৎসর্গ করিয়া যাঁহারা বিনিময়ে দুঃখ ও দারিদ্র্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি কি আমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই? অতএব, যাঁহারা দেশপ্রীতির অপরাধে নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে যেন আমরা আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি প্রেরণ করি এবং তাঁহাদের দুঃখলাঘবের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করি।

বর্ত্তমান সংকট ও ঐক্যের আহ্বান—বন্ধুগণ! আর একটি বিষয়ের অবতারণা করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে যে পার্থক্য বিরাজমান, তাহাকে উপেক্ষা করার চেষ্টা অর্থহীন। বাহিরে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান। আমাদিগকে এই আহ্বানের প্রত্যুত্তর দিতে হইবে। এই সঙ্কটকালে আমাদের কর্ত্তব্য কি? যাত্রাপথের ঝড়ঝঞ্ঝার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া আমাদিগকে শাসকশ্রেণীর ছলকৌশল বিস্তারের প্রতিরোধ করিতে হইবে। কংগ্রেসই বর্ত্তমানে গণ-সংগ্রামের সার্ব্বভৌম প্রতিষ্ঠান। ইহার মধ্যে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদল থাকিতে পারে—কিন্তু, ইহা ভারতের মুক্তিকামী সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রতিষ্ঠানের মিলনক্ষেত্র। অতএব, আসুন, ভারতীয়

জাতীয় মহাসভার পতাকাতলে সমগ্র জাতিকে সমবেত করুন। কংগ্রেসকে শক্তিশালী ও সঙ্ঘবদ্ধ করুন—বামপন্থীদের প্রতি ইহাই আমার আবেদন। ব্রিটীশ সাম্যবাদীদলের নেতৃবৃন্দের মনোভাবে বিশেষ-ভাবে উৎসাহিত হইয়া আমি এই আবেদন করিলাম। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ব্রিটীশ সাম্যবাদীদলের সাধারণনীতি কংগ্রেসের নীতির প্রায় অনুরূপ।

উপসংহারে আপনাদের মনোভাবের প্রত্যভিব্যক্তিস্বরূপ আমি ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, জাতির মুক্তির জন্য মহাত্মাজী আরও দীর্ঘকাল জীবিত থাকুন। এই যুগসন্ধিক্ষণে ভারতবর্ষ তাঁহাকে কিছুতেই হারাইতে পারে না। দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ রাখিবার জন্য তাঁহাকে প্রয়োজন, আমাদের সংগ্রামকে হিংসা-দ্বেষ মুক্ত রাখিতে তাঁহাকে প্রয়োজন। ভারতের স্বাধীনতা ও সর্ব্বমানবের কল্যাণের জন্য গান্ধাজীর সাহচর্য্য প্রয়োজন। কেবলমাত্র ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম নহে—বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম। কেবল-মাত্র ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমরা সংগ্রাম করিতেছি না—সর্ব্বমানবের মুক্তির জন্য আমরা সংগ্রাম করিতেছি। ভারতের স্বাধীনতার সহিত বিশ্বমানবের মুক্তিসমস্যা বিজড়িত।”

সতের

সুভাষচন্দ্রের ‘সাম্যবাদ সংঘ’ পরিকল্পনায় ও ইটালী পরিভ্রমণের সময় রোমে তাঁহার অভ্যর্থনার সমারোহ দেখিয়া ও তাঁহার মুখে ইটালীর পুনরভ্যুত্থান ও সেখানকার যুবশক্তির অজস্র প্রশংসাবাদ শুনিয়া যাহারা সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারা ও কার্য্যক্রমের মধ্যে ‘ফ্যাসিবাদ’ আবিষ্কার করিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন হরিপুরা কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতির অভিভাষণ পড়িয়া তাঁহাদের সে আশঙ্কা দূরীভূত হইবে।

অভিভাষণের প্রথমেই তিনি ঘোষণা করেন, "ব্রিটীশ সাম্রাজ্যকে হয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হইবে অথবা স্বাধীন জাতিসমূহের স্বেচ্ছাগঠিত যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হইতে হইবে। ১৯১৭ সালে জারের সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছিল এবং সেই ধ্বংসস্তূপের ভস্মরাশি হইতেই সোভিয়েট রাশিয়ার উদ্ভব হইয়াছে। ব্রিটিশের পক্ষে রাশিয়ার ইতিহাস হইতে শিক্ষা লাভের এখনও অবকাশ রহিয়াছে। ব্রিটেন ইহার সুযোগ গ্রহণ করিবে কী?" তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, ব্রিটীশ জনসাধারণের স্বাধীনতা রক্ষা হইতে পারে যদি ব্রিটেন একটি সোশ্যালিষ্ট রাষ্ট্রে পরিণত হয়; এবং সোশ্যালিষ্ট রাষ্ট্র গঠন করিতে হইলে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের বন্ধন শিথিল করিতে হইবে ও ঔপনিবেশিক অধিকার হস্তচ্যুত করিতে হইবে। যেহেতু, "ব্রিটেনের পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণী ও উপনিবেশ সমূহের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। বহুদিন পূর্বে লেনিন বলিয়াছিলেন 'কতকগুলি জাতির দাসত্বই গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে অধিকতর শক্তিশালী ও পুষ্ট করিতেছে।' ইংলণ্ডের বাহিরে বিভিন্ন উপনিবেশ ও অধীন দেশ সমূহ শোষণক্ষেত্ররূপে রহিয়াছে, মুখ্যতঃ এই কারণেই ব্রিটিশ অভিজাততন্ত্র ও বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব এখনও বজায় আছে।" তিনি আরও বলেন—

"এই সব উপনিবেশ ও অধীনদেশ সমূহ স্বাধীনতা লাভ করিলে নিঃসন্দেহে গ্রেট ব্রিটেনের ধনতান্ত্রিক শাসকশ্রেণীর বিলোপ ঘটিবে; এবং সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা হইবে। অতএব ইহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে হইবে যে, উপনিবেশতন্ত্রের উচ্ছেদ ব্যতীত ইংলণ্ডে সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। আমাদের মধ্যে যাহারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অন্যান্য অধীন দেশের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতেছেন, তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ জাতির অর্থনৈতিক মুক্তিসাধনের জন্যও সংগ্রাম করিতেছেন, সন্দেহ নাই।" যতদিন ব্রিটেন ঔপনিবেশিক অধিকার কায়েম রাখিবে ততদিন ব্রিটেনের

আপামর জনসাধারণের সত্যিকারের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না—কেবল উপনিবেশসমূহকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানের দ্বারাই ব্রিটেনে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পত্তন হইতে পারে। আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের দ্বারা পরোক্ষভাবে ব্রিটীশ জনসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তিলাভে সহায়তা করিতেছি—রাষ্ট্রপতি এই ঘোষণার দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত পরাধীনদেশসমূহের এবং সমাজসচেতন ও গণতান্ত্রিক মনোভাবসম্পন্ন জনগণের প্রাণের আকুতিকে ভাষা দিয়াছেন।

'সাম্যবাদ সংঘে' সুভাষচন্দ্র One-party State গঠনের পক্ষে মত প্রচার করেন কিন্তু হরিপুরা কংগ্রেসে তাঁহার সে মত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়। স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের স্থান ও কার্য্য কি হইবে সে সম্বন্ধে তিনি বলেন:—"আমার সন্দেহ হয়, আমাদের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে কংগ্রেসের যথাযথ কর্ত্তব্য ও অংশ সম্বন্ধে আমাদের কংগ্রেস কর্মীদের অনেকেরই কোন স্পষ্ট ধারণা ও সুনির্দ্দিষ্ট চিন্তা নাই। আমাদের কোন কোন বন্ধু মনে করেন কংগ্রেসের স্বাধীনতালাভ-রূপ অভীষ্ট সিদ্ধ হইলেই কংগ্রেসী দলের বিলোপ সাধন করা হইবে। এইরূপ চিন্তা সর্ব্বৈব ভ্রমপ্রসূত। স্বাধীনতালাভের পরে কংগ্রেসী দল ভাঙ্গিয়া দিবার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে, কংগ্রেসকে ক্ষমতা অধিকার করিয়া শাসন কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে ও জাতীয় পুনর্গঠনের কর্মপন্থা কার্য্যকরী করিতে হইবে। কেবল তখনই কংগ্রেসের কর্ত্তব্য পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইবে। বলপূর্বক কংগ্রেসের বিলোপ সাধনের ফলে দারুণ বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, যে দেশে ক্ষমতা অধিকার করিয়া বিজয়ীদল পুনর্গঠনের দায়িত্ব ও কর্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছে, কেবল সেই সেই দেশগুলিতেই সুশৃঙ্খল ও অব্যাহত উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। এইরূপ তর্ক উঠিতে পারে যে, ক্ষমতা লাভের পর বিজয়ী দল রাষ্ট্রের কর্ণধার হইলে, ঐ রাষ্ট্র একটি

আলোচনারত—সুভাষ ও জওহরলাল

একদলীয় কর্তৃত্বশালী সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রে পরিণত হইবে; কিন্তু এই অভিযোগ আমি স্বীকার করিতে পারি না। রাশিয়া, জার্মানি ও ইটালীর মত যদি রাষ্ট্রে মাত্র একটি দলেরই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সেই রাষ্ট্র একটি সর্বগ্রাসী ও একদলীয় প্রভুত্বাধীন রাষ্ট্র হইতে পারে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের দেশে অন্যান্য দলগুলিকে নিষিদ্ধ ও ক্ষমতাচ্যুত করার কোন যুক্তি নাই। আমাদের কংগ্রেস "নাৎসী দলের" মত "একনায়ক-নীতি'র উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে না; কংগ্রেসের ভিত্তি হইবে সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক। কংগ্রেসে একাধিক দল ও গণতান্ত্রিক ভিত্তি থাকার ফলে ভবিষ্যৎ ভারতীয় রাষ্ট্র একটি সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারিবে না। অধিকন্তু গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর কংগ্রেস সংগঠন প্রতিষ্ঠিত থাকায় এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাইবে যে, উপর হইতে নেতাদিগকে জনগণের উপর চাপাইয়া দেওয়া যাইবে না; জননেতারা নিচ হইতেই নির্বাচিত হইবেন।"

কংগ্রেসকে একটি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাই সুভাষচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল। মহাত্মা গান্ধীর সার্বভৌম নেতৃত্বেই কংগ্রেসের কার্য্যক্রম নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। সুভাষচন্দ্র এই একনায়কত্বের ঘোর বিরোধী ছিলেন। জাতীয় আন্দোলনে যেমন কংগ্রেস স্বাধীনতাকামী বিভিন্ন সংগ্রামশীল দল বা প্রতিষ্ঠানের মিলন-ক্ষেত্র স্বাধীন-ভারতেও কংগ্রেস জাতীয় পুনর্গঠনকার্য্যে প্রগতিপন্থী সকল দলের মিলন-ক্ষেত্র হইবে সুভাষচন্দ্রের ইহাই ছিল অভিমত। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলের উপর গান্ধীবাদীদের তেমন স্নেহদৃষ্টি ছিল না; কিন্তু, সুভাষচন্দ্র সমাজতন্ত্রীদলের প্রয়োজনও স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে স্বীকার করিয়া জাতীয় সংগ্রামে এই দলের সহযোগিতা ও সহায়তা কামনা করেন। কংগ্রেসের বাহিরেও যে সব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দল বা প্রতিষ্ঠান আছে, দলগত বিভেদ ভুলিয়া, মত ও পথের চুলচেরা বিচারে কালক্ষেপ না

করিয়া সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কংগ্রেসও ঐ সকল দল বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা করিবে ইহাই সুভাষচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদল সম্বন্ধে তিনি বলেন: "সম্প্রতি কংগ্রেসের অভ্যন্তরে "কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদল" গঠন সম্পর্কে বহু বিতর্ক হইয়াছে। আমি কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলের পক্ষে ওকালতি করিতেছি না—আমি এই দলের সভ্য নই। তথাপি আমি বলিব যে, এই দলের সূচনা হইতেই এই দলের সাধারণ আদর্শ ও কর্মনীতিতে আমার সম্মতি আছে। প্রথমতঃ, বামপন্থী কর্মী ও সংগঠন সমূহের একটি দলে সুসংহত হওয়া বাঞ্ছনীয়; দ্বিতীয়তঃ, বামপন্থী দল সৃষ্টির সুসঙ্গত কারণ তখনই থাকিতে পারে, যখন ঐ দল সমাজতান্ত্রিক নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল" অথবা অনুরূপ কোন দলের কংগ্রেসের "বামপক্ষ" হিসাবে কার্য্য করা উচিত। যদিও সমাজতন্ত্র আমাদের বর্তমানে প্রত্যক্ষ সমস্যা নহে, তথাপি, স্বাধীনতালাভের পরে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, দেশকে প্রস্তুত কারবার জন্য সমাজতান্ত্রিক প্রচার কার্য্য প্রয়োজন। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ও সমাজতন্ত্রপ্রতিষ্ঠাকামী "কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী" দলের মত এইরূপ একটি দলই শুধু এইরূপ প্রচার কার্য্য চালাইতে পারে।"

এখানে সুস্পষ্টভাবে এই মতই ব্যক্ত হইয়াছে যে, স্বাধীনভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক নীতিই অনুসৃত হইবে। সংগ্রামাত্মক কর্মপন্থায় আস্থাশীল ও সমাজতন্ত্রপ্রতিষ্ঠাকামী কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলকে তিনি অভিনন্দিত করেন—এই দল গণ-বিপ্লব ও সংগ্রামশীল মনোভাবের প্রতীক হইবে। সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রের পুনর্গঠনকল্পে প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী এইরূপ একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানকে স্বীকার করিয়া না লইলে কংগ্রেস গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হইবে। গণতন্ত্রের মূলনীতি রক্ষার প্রচেষ্টায়ই সুভাষচন্দ্রের সহিত কংগ্রেস

হাই কমাণ্ডের বিরোধ উ .স্থিত হয়। "Hitlerism inside and outside the Congress" এর উচ্ছেদকল্পে তিনি সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন। ১৯৩১-সালের মাঘ মাসে করাচী কংগ্রেসের সময় নওজোয়ান ভারতসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত নওজোয়ান সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে সুভাষচন্দ্র স্বাধীন ভারতের জন্য নিম্নলিখিত রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে বলেন: "I want a Socialist Republic in India… …The message I have to give is one of complete, alround undiluted freedom. We want political freedom, whereby is meant the constitution of an Independent Indian State; free from the control of British Imperialism. It should be quite clear to everybody that independence means severance from the British Empire, and on this point there should be no vagueness or mental reservation. Secondly, we want complete economic emancipation, Every human being must have the right to work, and the right to a living wage. There shall be no droves in our society, and no unearned incomes. There must be equal opportunities for all. Above all there should be a fair, just and equitable distribution of wealth. For this purpose it may be necessary for the State to take over the control of the means of production, distribution of wealth. Thirdly, we want complete social equality. There shall be no caste, no depressed classes. Every man will have the same rights, the same status in society. Further, there shall be no inequality between

the sexes either in Social status or in Law—and woman will be in every way an equal partner of man.

সুভাষচন্দ্রের অভিপ্রায় এই যে, ভারতবর্ষের বাহিরে যে সকল রাষ্ট্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল সেই সব রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক মতবাদ যাহাই হউক না কেন ভারতবর্ষ তাহাদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিবে। হরিপুরা অভিভাষণে ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তিনি বলেন—"In this matter we should take a leaf out of Soviet diplomacy. Though Soviet Russia is a Communist State her diplomats have not hesitated to make alliances with non-socialist states and have not declined sympathy or support coming from any quarter. We should therefore aim at developing a nucleus of men and women in every country who would feel sympathetic towards India." অবশ্য এই পররাষ্ট্রনীতির অর্থ এই নয় যে, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ রাষ্ট্রসমূহের আভ্যন্তরীণ শাসনতান্ত্রিক নীতি ও কার্য্যক্রম ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থায়ও অহেতুক প্রভাব বিস্তার করিবে। সুভাষচন্দ্র বলেন, "In connection with our foreign policy, the first suggestion I have to make is that we should not be influenced by the internal politics of any country or the form of its State." বহুদিন পূর্বে পূর্বোক্ত নওজোয়ান সম্মেলনেই তিনি সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করিয়াছিলেন—"While seeking light and inspiration from abroad we cannot forget that we should not blindly imitate any other people, and that we should assimilate what we learn elsewhere after finding out what will suit

our national requirements.". ১৯৩১ সালের ৪ঠা জুলাই কলিকাতায় নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেন, "I have no doubt in my mind that the salvation of India, as of the wor'd, depends on socialism. India should learn from and profit by the experience of other nations—but India should be able te evolve her own method in keeping with her own needs and her own environments. In applying any theory to practice, you can never rule out your geography or history. If you attempt it, you are bound to fail. I also think that India should form her own form of socialism. When the whole world is engaged in socialistic experiments, why should we not do the same thing? It may be that the form of socialism which India will evolve will have something new and original about it which will be of benefit to the whole world".

সুভাষচন্দ্রকে যাহারা ফ্যাসিষ্ট আখ্যায় আখ্যাত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন তাহাদের সুভাষচন্দ্রের বিভিন্ন সময়ের উল্লিখিত উক্তিসমূহ বিশেষ করিয়া প্রণিধান করা উচিত। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, সূক্ষ্মবিচার-শক্তি ও পরমতসহিষ্ণুতা দলনির্বিশেষে সকল দেশকর্মীরই অনুকরণীয়। বিদেশের কোন 'ismকেই তিনি যেমন নির্বিচারে চালাইতে চাহেন নাই, তেমনি কোন 'ism'কেই তিনি কটাক্ষ করিতেন না। Fascism-কে অস্বীকার করিয়াও সুভাষচন্দ্র Fascism-এর উজ্জ্বল ও শ্রেয়: অংশ গ্রহণ করিয়াই 'সাম্যবাদ সংঘে'র পরিকল্পনায় তিনি Fascism ও Communism-এর সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করেন। সুভাষচন্দ্র Communism

এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণেরই পক্ষপাতী ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রিক দর্শন ও মতবাদ মূলতঃ সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ও কর্মপন্থা দ্বারাই গঠিত—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।

আঠারো

সুভাষচন্দ্রের প্রথম রাষ্ট্রপতিত্বের কাল প্রবল কর্মচাঞ্চল্যের ভিতর দিয়া কাটিয়া যায়। ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া তিনি কংগ্রেসের মত বিরাট প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব করেন। সেই সময়েই দেশীয় রাজ্যসমূহে গণবিক্ষোভ দেখা দেয়—নিপীড়িত প্রজাগণ চেতনা লাভ করিয়া দলে দলে কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইতে থাকে ও বৃটিশ অনুগ্রহপুষ্ট অত্যাচারী স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম সুরু করে। তালচর, ধেনকানল, মহীশূর হিন্দোল, জয়পুর, রণপুর, রাজকোট প্রভৃতি বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে গণজাগরণের প্লাবন বিপুল আকার ধারণ করে এবং বৃটিশ শাসন ও রাজন্যবর্গের যুক্ত দলন নীতির বিরুদ্ধে ভারতীয় জণগণের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করে। সেই সময়ে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট মুসলমান সম্প্রদায়কেও অধিকতর সংখ্যায় কংগ্রেসের পতাকাতলে আনিবার চেষ্টা করেন। রাষ্ট্রপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্র মুসলীম লীগের সভাপতি মিঃ জিন্নার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে মুসলমান জনগণের সহায়তালাভের জন্য কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে ঐক্যসংস্থাপনের উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা করেন। তাঁহার এই চেষ্টা ফলবতী না হইলেও এই প্রচেষ্টার দ্বারাই তিনি মুসলমান জনগণের হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ হন। সেই সময়েই মহাচীনের মুক্তি সংগ্রামে সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে চীনে কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশন প্রেরিত হয়। চারিজন

বিশিষ্ট ভারতীয় চিকিৎসক চীনের বিখ্যাত অষ্টম রুট্ বাহিনীর সহিত থাকিয়া চীনা জনগণের স্বাধীনতার যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। হরিপুরা অভিভাষণে তিনি ভবিষ্যৎ ভারতের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে ঘোষণা করেন, "কেবলমাত্র সোস্যালিষ্ট পদ্ধতির দ্বারাই দারিদ্র্য মোচন, নিরক্ষরতা ও ব্যাধি দূরীকরণ এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কিত আমাদের প্রধান প্রধান জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধান হইতে পারে।" ভারতবর্ষে এরূপ রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের জন্য হরিপুরা কংগ্রেসেই তিনি এক কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব করেন। এই কমিশন ভারতবর্ষের কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থাকে উৎপাদন ও ব্যবহারের উভয়ক্ষেত্রেই সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী পুনর্গঠিত করিতে ভবিষ্যৎ জাতীয় সরকারকে সুপারিশ করিবে; কারণ,—'a comprehensive scheme of industrial development under state-ownership and state-control will be indispensable.' পরে তাঁহারই নেতৃত্বে এই কমিশন গঠিত হইয়া "ন্যাশনাল প্লানিং কমিটি" নামে পরিচিত হয়। এই 'জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি' গঠনে সুভাষচন্দ্র যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন তাহার তুলনা কংগ্রেসের ইতিহাসে বিরল। এতদ্ভিন্ন, তাঁহারই চেষ্টায় বহুদিনের বাঙালী-বিহারী সমস্যারও সন্তোষজনক সমাধান হয়। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে ওয়ার্কিং কমিটির বার্দ্দৌলী অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহার মর্ম এই—(১) ভারতের যে কোন প্রদেশে যে কোন ভারতীয় চাকুরি পাইতে পারিবেন। (২) বিহারী ও বিহারে প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে কোন ব্যাপারে কোনরূপ বৈষম্য থাকিবে না। (৩) ডোমিসাইল্ড সার্টিফিকেট্ প্রথা রহিত হইবে। (৪) চাকুরী প্রার্থীরা আবেদনপত্রে অধিবাসী অথবা ডোমিসাইল্ড বলিয়া উল্লেখ করিবেন। (৫) যে কোন ব্যক্তি দশ বৎসর কোন প্রদেশে বাস করিলেই ঐ প্রদেশে ডোমিসাইল্ড বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৬) যাহাদের মাতৃভাষা স্কুলের প্রচলিত ভাষা হইতে পৃথক, সংখ্যায় যথোপযুক্ত হইলে তাহাদের জন্য তাহাদের মাতৃভাষাতেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বলা বাহুল্য ভারতীয়মাত্রকেই একটি অখণ্ড জাতি হিসাবে গণ্য করিবার যে উদার নীতি এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়াছে, উহা সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেসের মূল নীতি ও আদর্শের পরিপোষক ও গণতন্ত্রের অনুকূল। সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বকালে পার্লামেণ্টারী কার্য্যক্ষেত্রে কংগ্রেসী মন্ত্রিবর্গ অপরিসীম দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেন। জাগ্রত জনমতের নিকট দাম্ভিক ক্ষমতাপ্রিয় গভর্ণরগণ অনেকক্ষেত্রে নীতি স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। ভারতের আটটি প্রদেশে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা শাসনভার গ্রহণ করেন। আসামে কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। সিন্ধু, পাঞ্জাব, বাঙলাদেশেও কংগ্রেস যথেষ্ট শক্তিশালী হয়। পার্লামেণ্টারী কার্য্যকলাপে কংগ্রেসের মর্য্যাদা, শক্তি ও কর্মতৎপরতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু সুভাষচন্দ্রের এই কার্য্যকলাপ দেশের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করিলেও কংগ্রেস নেতৃত্বের একটি অংশের নিকট উহা মোটেই প্রীতিকর হইতেছিল না। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী বিপ্লবী-শ্রেণীর এইরূপ সুসংহত অভিযান মোটেই সুনজরে দেখিতে পারিতেছিলেন না। কংগ্রেসের ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের সুভাষ-বিরোধিতা নির্লজ্জরূপে আত্মপ্রকাশ করিল ত্রিপুরী কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের সময়। ইতিপূর্বে নরীম্যান ও খারে কংগ্রেস উচ্চমণ্ডলের রোষদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিলেন, এইবার সুভাষচন্দ্রের উপরেই খড়্গ পড়িল!

উনিশ

১৩৪৫ সালের ৭ই মাঘ রাষ্ট্রপতি শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু শান্তিনিকেতন আশ্রম পরিদর্শনে গেলে শান্তিনিকেতনের ছায়াশীতল আম্রকুঞ্জে কবিগুরু নিজে নবীন রাষ্ট্রপতিকে অভ্যর্থনা করেন। অভ্যর্থনা করিয়া কবিগুরু বলেন, "কল্যানীয় সুভাষচন্দ্র! আমাদের যা' বলবার কথা, হাজার বছর পূর্বে আমাদের ঋষিরা তা' বলে গেছেন। সমস্ত দেশের অভ্যর্থনার ভিতর দিয়ে তুমি এসেছ। আমাদের দেশ তোমাকে যে আসন দিয়েছে সে আসনের বার্তা রয়েছে ঋষিদের সেই পবিত্র বাণীর ভিতরে—তাঁদের বাণীতে তুমি পেয়েছ তোমার আসন। আমরা খুসী হয়েছি আজ তোমাকে এখানে পেয়ে। আমার খুসী হবার একটা কারণ হচ্ছে, এই সুযোগে তুমি আমার পরিচয় পাবে। বাণীর সাধনায় আমার সিদ্ধি সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছ। যারা আমাকে ভালবাসেন তাঁরা বলেন, আমি একটা কিছু প্রতিষ্ঠা লাভ করেছি বাক্‌দেবতার কল্যাণে। কিন্তু তোমার দৃষ্টিতে পড়্‌বে এই কর্মক্ষেত্রে আমার পরিচয়। মানুষের মানবত্বের পরিচয় যদি এখানে জাগ্রত হয়ে থাকে, ত্যাগ ও সাধনার ক্ষেত্র যদি এখানে খুলে থাকে, তাহলে তুমি আনন্দিত হবে জানি। আর সে পরিচয় আমি গর্বের সংগে তোমাকে দিতে চাই; এই কারণে দিতে চাই, তুমি এখানে দেশের কর্ণধাররূপে এসেছ—দেশ তোমাকে স্বীকার করেছে। এখানে দেশের যে সাধনা সে তোমাকে জানতে হবে, স্বীকার কর্তে হবে, গ্রহণ কর্তে হবে। যদি তুমি স্বীকার কর তাহলে এ চিরকালের জন্য সার্থক হবে। আমার সৌভাগ্য আজ তোমাকে আহ্বান করে এনেছে আমার এই কর্মক্ষেত্রে—তুমি আমাকে জানবে।

তোমাকে আমি রাষ্ট্রনেতারূপে স্বীকার করেছি মনে মনে। আমার সঙ্কল্প আছে জনতার মধ্যে আমার সেই বাণী আমি প্রকাশ করব। তুমি বাঙ্‌লাদেশের রাষ্ট্রীয় অধিপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ। অন্য

দেশকে আমি জানি না, সেখানে আমার জোর খাটবে না। আমি বাঙালী—বাঙালাকে জানি—বাঙালার প্রয়োজন অসীম। সেই জন্য তোমাকে যদি আহ্বান করি, স্বীকার কর্তে হবে। এখানে তুমি আমাদের অতিথি ও বন্ধু। আমাদের দেখে আমাদের কার্যভার যদি লাঘব কর্তে পার, কর। অবসর হ'লে আসতে যেতে হবে।

দেশে যারা অপমানিত তাদের সন্মান দেবার আয়োজন করেছি এখানে। এখানকার হাওয়াতে এখানকার ছেলে মেয়েদের যে আনন্দ, তাতে তাদের দাবী আছে, এই জন্য তারা জন্মেছে। তা নইলে কেন ফুল ফোটে, দিনান্তে কেন পাখী ডাকে, যদি তারা ক্লাস ঘরে ঢুকে দাগ কাটা Passage মুখস্থ করে জীবনের সুন্দর সময় নষ্ট করে। কি দুর্ভাগ্যে মানুষ সৌন্দর্য্যবোধ থেকে বঞ্চিত থাকবে। শিক্ষাটা জীবনের সংগে জড়িত। শিক্ষাকে যারা বিচ্ছিন্ন করে রাখে, তারা তাকে পীড়িত করে, মানুষের মনকে তারা কেটে কেটে বাঁচাবার চেষ্টা করে। এখানে শিক্ষাকে সমগ্র জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে আহ্বান করেছি—মুক্তি ও আনন্দের স্বাদ দিতে চেষ্টা করেছি। কাজ যা করবার সম্পূর্ণ হয় নি। রাষ্ট্রীয় দিক থেকে তুমি আমার কর্মের পরিচয় নিয়ে যদি তাকে স্বীকার কর্তে পার, সুখী হব।"

কবিগুরুর সম্বর্দ্ধনার উত্তরে সুভাষচন্দ্র বলেন—"আপনার যে অখণ্ড সাধনা, সেটা সাধারণ মানুষ বা সাধারণ ভারতবাসী যে সহজে উপলব্ধি করবে এটা আশা করা অন্যায়। আমিও সেই সাধারণের একজন। সুতরাং আমি যে আপনার অখণ্ড সাধনা, মহত্ত্ব ও গৌরব উপলব্ধি কর্তে পারব, সে দুরাকাঙ্ক্ষা আমি করি না, সে উপলব্ধি একদিনে আসে না। সে উপলব্ধি হচ্ছে ক্রমিক এবং সারা জীবনব্যাপী। তবে আমার মনে হয় যদি আমরা চলার পথে চল্‌তে থাকি তাহ'লে সে উপলব্ধি ক্রমশঃ প্রসারলাভ কর্‌বে।

মধ্যে মধ্যে একথা উঠে এবং আমাদের মধ্যে আলোচিত হয়, আপনি উপস্থিত না থাকলে আপনার সাধনার কি হবে। আমি বল্‌তে চাই—কোন বস্তু বা সাধনা মরতে পারে না, যতদিন তার সার্থকতা আছে। যে সত্য ও সাধনা নিয়ে আপনার সমস্ত জীবন দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেদিন ভারতবর্ষের প্রত্যেক নর-নারীর হৃদয়ে সেটা প্রতিষ্ঠিত হবে সেদিন শান্তি-নিকেতন বাঁচুক বা মরুক তাতে কিছু আসবে যাবে না। যতদিন পর্য্যন্ত সে সত্য ও সাধনা জাতির প্রাণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততদিন পর্য্যন্ত আপনার শান্তিনিকেতনের ও শ্রীনিকেতনের সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা থাকবেই থাকবে। শুধু তাই নয়, এ রকম সাধনা ভারতের দিকে দিকে স্থানে স্থানে গড়ে উঠবে।

আমরা, যারা রাষ্ট্রীয় জীবনে বেশী সময় ও শক্তি ব্যয় করি, আমরা মর্মে মর্মে আমাদের অন্তরের দৈন্য অনুভব করি। প্রাণের দিক দিয়ে যে সম্পদ না পেলে মানুষ বা জাতি বড় হতে পারে না, সেই সম্পদ্—সেই প্রেরণা আমরা চাই, কারণ, আমরা জানি—সেই প্রেরণা, সত্যের সেই আভাস যদি প্রাণের মধ্যে পাই তাহ'লে আমাদের কর্মজীবনের ও বহির্জীবনের সাধনা সাফল্যমণ্ডিত ও সার্থক হবে। আপনার কাছ থেকে সে প্রেরণা আমরা চাই।

আমরা হয়ত আজ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কর্‌ছি; কিন্তু আমাদের আদর্শ বড়। আমরা চাই মানুষের ও জাতির পরিপূর্ণ জীবন, আমরা চাই সব দিক দিয়ে আমাদের অখণ্ড জাতি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। এই যাত্রার পথে, এই সাধনার পথে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা একটি সোপান মাত্র। বাণীর বা সাহিত্যের সাধনায় আপনার চেষ্টা পর্য্যবসিত হয় নাই—শুধু ভগবানের উপাসনায় আপনার সাধনা পর্য্যবসিত হয় নাই। অন্তরের আদর্শকে আপনি বহির্জীবনে মূর্ত্ত কর্ত্তে চেষ্টা করেছেন। এইটুকু আপনার চরণে নিবেদন কর্ত্তে চাই—এই আদর্শ আমাদেরও

জীবনের আদর্শ, কারণ, এটা আমাদের জাতীয় আদর্শ। আমাদের জীবনে তা' সফল কর্তে পারি না পারি সেই আদর্শকে আমরা অন্তরে রেখেছি, বাহিরে রেখেছি এবং সেই আদর্শ অনুসরণ কর্তে চেষ্টা কর্ছি, ভবিষ্যতেও করব।"

শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের এক সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বলেন, "আমরা যে নূতন ভারত তৈরী করব তার প্রতিষ্ঠা হবে মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম আদর্শের উপর। তাকে ভিত্তি করে স্বরাজের সৌধ নির্ম্মিত হ'বে। তার মধ্যে জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন ফুটিয়ে তুলতে পারব, ভারতবর্ষকে আবার ধনধান্যে পূর্ণ কর্তে পারব এবং ভারতের নর-নারীকে সকল রকমে যোগ্য করে তুলতে পারব। যেদিন ভারতের প্রত্যেক নর-নারীকে মনুষ্যত্বের উচ্চতর সোপানে উন্নীত কর্তে পারব, সেদিন আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হ'বে। শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে শিক্ষার যে আয়োজন হ'য়েছে তার যদি সদ্ব্যবহার হয়, তা'হলে জাতিসংঘঠনকার্য সাফল্যমণ্ডিত হবে।"

কুড়ি

কলিকাতায় একটি কংগ্রেস-ভবন প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প সুভাষচন্দ্রের মনে বহুদিন পূর্বেই স্থান পাইয়াছিল। সুভাষচন্দ্র যে জাতীয় সৈনিকবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন কংগ্রেস হাউস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও তাহার সহিত যুক্ত ছিল। তাঁহার পরিকল্পিত কংগ্রেসভবনে শুধু কংগ্রেসের কাজই হইবে না, আসলে সেটা হইবে জাতীয় বাহিনীর প্রধান শিবির। সেখানে লাইব্রেরী, রঙ্গমঞ্চ, জিম্‌নাসিয়াম ও কংগ্রেস অফিস ত থাকিবেই কিন্তু মূলতঃ প্রতিষ্ঠানটি একটি সৈনিক কেন্দ্র হইবে। ১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাসে কর্পোরেশনের সভায় কলিকাতায় এইরূপ

একটি জাতীয় ভবন নির্মানের প্রস্তাব আলোচিত হয়। চিত্তরঞ্জন এভিনিউর উপর প্রশস্ত একখণ্ড জমি বার্ষিক এক টাকা খাজনায় ৯৯ বৎসরের জন্য সুভাষচন্দ্র বসুকে দিবার প্রস্তাব ঐ সভায় গৃহীত হয়। এই জমির উপরে সুভাষচন্দ্র বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে রঙ্গালয়, বক্তৃতামঞ্চ, গ্রন্থাগাব ও একটি ব্যায়ামগার প্রতিষ্ঠা করিবেন। প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্য্যালয়ও ঐ ভবনেই স্থাপিত হইবে। সুভাষচন্দ্রের সমর্থকগণ কর্পোরেশনের সভায় প্রস্তাব করিলেন, জাতীয় ভবন নির্মাণের জন্য সুভাষচন্দ্রকে নগদ এক লক্ষ টাকা দেওয়া হউক। কর্পোরেশনে তখন সুভাষচন্দ্রের অসামান্য প্রভাব। বিরোধিতা সত্ত্বেও এই প্রস্তাব পাস্ হইয়া গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ টাকা বাহির হইল না। কর্পোরেশনের কৃষ্ণকায় পরিচালকগণ শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের চোখ রাঙানিতে সন্ত্রস্ত হইয়া অচিরাৎ তাহাদের মত পরিবর্তন করিলেন। কেহ কেহ ধুয়া তুলিল যে ঐ লক্ষ টাকার দ্বারা জাতীয় ভবনও প্রতিষ্ঠা হইবে না, জাতীয় বাহিনীও গঠিত হইবে না—"টাকাগুলি গান্ধীমারণ যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিতেই শেষ হইয়া যাইবে"। সেবার কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রপতিপদ ত্যাগের পর হইতে গান্ধীজী ও কংগ্রেসের উচ্চমণ্ডলের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভের প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা সমগ্র বাঙলাদেশকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল; কাজেই উক্ত মতবাদের একদল সমর্থকও জুটিল। ইতিমধ্যে হাইকোর্ট ইন্‌জাঙ্‌সন জারি করিয়া বসিল। এদিকে কিন্তু সমস্ত আয়োজনই প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

১৩৪৬ সালের ২রা ভাদ্র কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় ভবনের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। ভিত্তি-স্থাপন উপলক্ষে প্রদত্ত অভিভাষণে তিনি বলেন—"আজ এই মহাজাতি সদনে আমরা বাঙলাজাতির যে শক্তির

প্রতিষ্ঠা করবার সঙ্কল্প করেছি তা সেই রাষ্ট্রশক্তি নয়, যে শক্তি শত্রু মিত্র সকলের প্রতি সংশয়-কণ্টকিত। জাগ্রতচিত্তকে আহ্বান করি যার সংস্কারমুক্ত উদার আতিথ্যে মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন মুক্তি অকৃত্রিম সত্যতা লাভ করে। বীর্য্য এবং সৌন্দর্য্য, কর্মসিদ্ধিমতী সাধনা এবং সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনা, জ্ঞানের তপস্যা এবং জনসেবার আত্ম-নিবেদন এখানে নিয়ে আসুক আপন আপন বিচিত্র দান। অতীতের মহৎ স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের বিপুল প্রত্যাশা এখানে আমাদের প্রত্যক্ষ হোক। বাঙ্‌লাদেশের যে আত্মিক-মহিমা নিয়ত পরিণতির পথে নবযুগের নব-প্রভাতের অভিমুখে চলেছে, অনুকূল ভাগ্য যাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং প্রতিকূলতা যার নির্ভীক স্পর্দ্ধাকে দুর্গমপথে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করছে সেই তার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব এই মহাজাতি সদনের কক্ষে কক্ষে বিচিত্র মূর্ত্ত রূপ গ্রহণ করে বাঙালীকে আত্মোপলব্ধির সহায়তা করুক। বাঙ্‌লার যে জাগ্রত হৃদয়-মন আপন বুদ্ধির ও বিদ্যার সমস্ত সম্পদ ভারতবর্ষের মহাবেদীতলে উৎসর্গ করবে বলেই ইতিহাস বিধাতার কাছে দীক্ষিত হয়েছে তার সেই মনীষিতাকে এখানে আমরা অভ্যর্থনা করি। আত্মগৌরবে সমস্ত ভারতের সঙ্গে বাঙ্‌লার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য থাকুক। আত্মাভিমানের সর্বনাশা ভেদবুদ্ধি তাকে পৃথক না করুক এই কল্যাণ-ইচ্ছা এখানে সংকীর্ণ চিত্ততার ঊর্দ্ধে আপন জয়ধ্বজা যেন উড্ডীন রাখে। এখান থেকে এই প্রার্থনামন্ত্র যুগে যুগে উচ্ছ্বসিত হোতে থাক :—

বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।

সেই সংগে এ কথা যোগ করা হোক বাঙালীর বাহু ভারতের বাহুতে বল দিক, বাঙালীর বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক, ভারতের মুক্তি সাধনায় বাঙালী স্বৈরবুদ্ধিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো কারণেই নিজেকে অকৃতার্থ যেন না করে"।

রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় ভবনটির নামকরণ করিয়াছিলেন—মহাজাতি-সদন' (The abode of the Natien)। আজিও চিত্তরঞ্জন এভিনিউর উপর সুভাষচন্দ্রের মহাজাতিসদনের কঙ্কালখানি অতীতের বিষাদ-মাখা করুণ স্মৃতি বহন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জাতীয়ভবন প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প সম্পূর্ণ সফল না হইলেও সেদিনের সেই ব্যর্থ প্রয়াসই আজ শতগুণ বৰ্দ্ধিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগঠন ও পূর্ব এশিয়ায় স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপনের কার্যে। কলিকাতা মহানগরীর মহাজাতিসদন সম্পূর্ণ না হইলেও ভারতবর্ষের বাহিরে তিনি যে মহাজাতিসংঘ গড়িয়া তুলিয়াছেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে তাহা এক সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায়ের সংযোজনা করিয়াছে। সেদিনের অসম্পূর্ণ ও পরিত্যক্ত মহাজাতিসদন মহাজাতিসংঘে আসিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। বাঙালী জাতির এই সূচনাসার জাতীয়-ভবনটি বাঙালীর শোচনীয় অকীর্ত্তি ও অক্ষমতার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। আজ প্রত্যেক বাঙালীকে এই অসমাপ্ত জাতীয় সৌধের প্রতি তাহাদের দায়িত্বের কথা একবার ভাবিয়া দেখিতে বলি

একুশ

ত্রিপুরীতে অভিমন্যুবধ পর্বের পুনরাভিনয়ের যে আয়োজন হইয়াছিল তাহার ইতিহাস অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে চরম শক্তিপরীক্ষা হইয়া যায়। ত্রিপুরী কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করিবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সুভাষচন্দ্রের নাম প্রস্তাবিত হয়। অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে সুভাষচন্দ্র এবারও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া নির্বাচিত হইবেন কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল যে কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে রাষ্ট্রপতিপদে গ্রহণ করিতে চাহেন না। তদনুসারে সুভাষচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের পক্ষ হইতে ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার নাম প্রস্তাবিত হয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নামও প্রস্তাবিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি এক বিবৃতি প্রচার করিয়া ডাঃ সীতারামিয়ার পক্ষে স্বীয় প্রার্থিপদ প্রত্যাহার করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, "সভাপতি পদের জন্য ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার নাম ও প্রস্তাবিত হইয়াছে দেখিয়া আমি আনন্দিত হইলাম। আমি আমার নাম প্রত্যাহার করিব না—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি তাঁহার নাম প্রত্যাহার করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন; কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে, আমি তাঁহাকে উহা হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছি। তিনি একজন অক্লান্তকর্মী ও ওয়ার্কিং কমিটির পুরাতন সদস্য। সভাপতি নির্বাচনের জন্য আমি প্রতিনিধিদের নিকট তাঁহার নাম সুপারিশ করিতেছি। আমি আশা করি, তিনি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হইবেন।"

সুভাষচন্দ্রকে দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি পদে গ্রহণ না করিবার প্রধান কারণ ছিল তাঁহার যুক্তরাষ্ট্র-বিরোধিতা। এদিকে ইউরোপের আকাশে তখন যুদ্ধের ঘনঘটা দেখা দিয়াছে। ব্যাপকভাবে লোকের

ইহাই বিশ্বাস যে ইউরোপীয় যুদ্ধের পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা সম্বন্ধে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দের সহিত বৃটিশ সরকারের আপোষের সম্ভাবনা আছে। সুতরাং দক্ষিণপন্থিগণ আপোষের পথে কণ্টকস্বরূপ এমন কোন বামপন্থী রাষ্ট্রপতি চাহেন না যিনি তাঁহাদের আপোষ আলোচনার পথে বাধা সৃষ্টি করিবেন। মৌলানা আজাদের বিবৃতির উত্তরে সুভাষচন্দ্র যে বিবৃতি দেন তাহাতে তিনি বলেন, "আসন্ন সভাপতি নির্বাচন ব্যাপারটি ব্যক্তিগত নহে, কাজেই এই বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে সকল রকম কৃত্রিম সৌজন্য পরিহার করিতে হইবে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ক্রমশঃ তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে এবং নূতন ভাবধারা, নূতন আদর্শ ও কর্মসূচির সমস্যা দেখা দিয়াছে। অন্যান্য স্বাধীন দেশের মত ভারতে রাষ্ট্রপতি পদের নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইলে কোনও বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণের অভিমত সুস্পষ্টভাবে জানা যাইবে। এই সকল কারণে ভারতের রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনেও নির্দ্দিষ্ট সমস্যা ও কর্মতালিকার ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়া সঙ্গত বলিয়া জনগণ বিবেচনা করেন। এইদিক হইতে নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবাঞ্ছনীয়ও নহে। * * আন্তর্জাতিক বিরোধ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আসন্ন হইয়া উঠিতেছে। এই অবস্থায় আমাদের জাতীয় ইতিহাসে নূতন বৎসর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইবে। এই সকল কারণে অধিকাংশ প্রতিনিধি যদি আমাকে কংগ্রেস সভাপতিপদে পুনরায় নির্বাচিত করিতে চাহেন, তবে আমি কোন্ যুক্তিতে প্রতিযোগিতা হইতে সরিয়া দাঁড়াইব? তবে মৌলানা আজাদের ন্যায় বিশিষ্ট নেতা যেরূপ আবেদন করিয়াছেন, তাহার ফলে অধিকাংশ প্রতিনিধি যদি আমার পুনর্নির্বাচনের বিরুদ্ধে ভোট দেন, তবে আমি বিশ্বস্তভাবে তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইব এবং সাধারণ সৈনিক হিসাবে কংগ্রেস ও দেশের সেবা করিব। নির্বাচন হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার আমার

অধিকার নাই। অতএব আমি সর্বতোভাবে আমার বিষয়ে বিবেচনা করিবার ভার প্রতিনিধিবর্গের হস্তে অর্পণ করিলাম। তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তই আমি মানিয়া লইব।”

সুভাষচন্দ্রের এই বিবৃতির প্রতিবাদে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কতিপয় সদস্য এক বিবৃতি প্রচার করিয়া বলেন, “* * * মৌলানা সাহেব এই নির্বাচন প্রতিযোগিতা হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছেন দেখিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। কিন্তু তিনি যখন প্রতিযোগিতা না করিবার সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি আমাদের মধ্যে কয়েকজনের সহিত পরামর্শ করিয়াই ডাঃ পট্টভির নির্বাচন সমর্থন করিয়াছেন। যথেষ্ট বিবেচনা করিয়াই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। আমরা মনে করি যে, খুব গুরুতর কোন কারণ না ঘটিলে বিদায়ী সভাপতিকে পুনরায় নির্ব্বাচন না করার নীতিই অক্ষুণ্ণ রাখা উচিত। * * * আমরা বিশ্বাস করি যে ডাঃ পট্টভি কংগ্রেসের সভাপতি হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য ব্যক্তি। তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রধানতম সদস্যগণের অন্যতম। তিনি দীর্ঘদিন ধরিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে দেশসেবা করিয়া আসিতেছেন। আমরা তাই কংগ্রেস প্রতিনিধিগণের নিকট তাঁহার নির্বাচনের জন্য সুপারিশ জানাইতেছি। সুভাষবাবুর সহকর্মীরূপে আমরা তাঁহাকে তাঁহার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা করিতে এবং ডাঃ সীতারামিয়ার নির্ব্বাচন সর্ব্ববাদিসম্মত হইতে দিতে অনুরোধ করিতেছি।”

সর্দার প্যাটেল ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসাবেই এই বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। বলা হইয়াছে যে, বহু আলোচনার পর ডাঃ পট্টভির নির্ব্বাচন সমর্থন করিবার সিদ্ধান্ত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের এক ঘরোয়া বৈঠকে গৃহীত হইয়াছে।

সর্দার প্যাটেলের পরবর্ত্তী বিবৃতিতে ইহাও প্রকাশ যে, মহাত্মা গান্ধীও ঐ ঘরোয়া আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াও সুভাষচন্দ্র এবং ওয়াকিং কমিটির অন্যান্য সদস্যগণের কেহই (ওয়ার্কিং কমিটির) ঐ আলোচনা ও সিদ্ধান্তের কথা কিছুই জানিতেন না! সে যাহাই হউক, সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের আভ্যন্তরিক ঐক্য বজায় রাখিতেই চাহিয়াছিলেন। তিনি যে নির্ব্বাচন হইতে সরিয়া দাঁড়ান নাই তাহার কারণ তিনি মনে করেন যে, এবারকার সভাপতি নির্বাচন কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নহে—এই নির্ব্বাচনের দ্বারা কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাই নির্দ্ধারিত হইবে। সর্দ্দার প্যাটেল প্রমুখ নেতৃবৃন্দের বিবৃতির উত্তরে সুভাষচন্দ্র এক বিবৃতি প্রসঙ্গে তাঁহার সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, "অনেকেই মনে করেন যে আগামী বৎসর যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের সহিত বৃটিশগভর্ণমেণ্টের আপোষ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা আছে। কাজেই দক্ষিণপন্থীরা একজন বামপন্থী কংগ্রেস-সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়া পছন্দ করেন না—কেননা, তিনি এই আপোষ রফার অন্তরায় হইতে পারেন এবং আলোচনার পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারেন। জনসাধারণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিলে এবং তাহাদের সহিত আলোচনা করিলেই বুঝা যায় যে, এই বিশ্বাস অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় মনে-প্রাণে যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী একজন কংগ্রেস সভাপতির প্রয়োজন। সভাপতিপদের জন্য আমার নাম প্রস্তাবিত হওয়ায় আমি সত্যই দুঃখিত হইয়াছি। এই জন্যই আমি বহুসংখ্যক বন্ধুকে বলিয়াছিলাম যে, আমার পরিবর্ত্তে বামপন্থীদের মধ্য হইতে একজন নূতন প্রার্থী দাঁড় করান উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেরূপ না করিয়া কয়েকটি প্রদেশ হইতে আমারই নাম প্রস্তাবিত হইয়াছে। এখনও যদি আচার্য্য নরেন্দ্র দেবের ন্যায় একজন প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী বামপন্থীকে আগামী বৎসরের সভাপতিপদে নির্ব্বাচিত করা হয়, তবে আমি নির্ব্বাচন-

দ্বন্দ্ব হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে প্রস্তুত আছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বর্ত্তমান সঙ্কটকালে একজন প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী কংগ্রেস সভাপতির নির্বাচন অপরিহার্য্য। দক্ষিণপন্থীরা যদি প্রকৃতই জাতীয় ঐক্য চাহেন, তবে একজন বামপন্থীকে সভাপতি নির্বাচন করিতে রাজী হওয়া তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে।"

২৯শে জানুয়ারী রবিবার সভাপতি নির্ব্বাচনের দিন ধার্য্য হয়। ঠিক তিন দিন পূর্ব্বে ২৬শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র যে বিবৃতি প্রচার করেন তাহাতেও তিনি দক্ষিণপন্থীদের কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদসৃষ্টির এই অশুভ প্রচেষ্টা যাহাতে পরিত্যক্ত হয় তাহার জন্য আকুল আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "এই শেষ মুহূর্ত্তেও যদি তাঁহারা একজন যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী সভাপতি নির্বাচিত করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে এখনই এই বিরোধের অবসান ঘটিবে। আমার নিজের কথা আমি পূর্বেই ঘোষণা করিয়াছি। আসল প্রশ্ন হইল যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে। যদি কোন প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রবিরোধীকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হয়, তবে সানন্দে আমি তাঁহার অনুকূলে সরিয়া দাঁড়াইব।" সুভাষচন্দ্র দেশবাসীকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে, যদি নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই অনিবার্য্য হইয়া উঠে তাহা হইলে কংগ্রেসের মধ্যে ভেদসৃষ্টির সম্পূর্ণ দায়িত্ব দক্ষিণ-পন্থীদের উপর পড়িবে—তাঁহারা কি সে দায়িত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হইবেন, না প্রগতিশীল কর্মপন্থার ভিত্তিতে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও সংহতি অটুট রাখাই বাঞ্ছনীয় মনে করেন? কিন্তু দক্ষিণ পন্থী নেতৃবর্গ তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। দুই পদপ্রার্থীর মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল।

১৯২৯ সালের লাহোর কংগ্রেসের সময় হইতেই মহাত্মাগান্ধীর অভিপ্রায় ও নির্দ্দেশক্রমেই কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছে। মহাত্মার নির্দ্দেশ অনুসারে সভাপতি নির্বাচন একপ্রকার

প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ত্রি পুরী কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শেঠ গোবিন্দ দাসের ভাষায় বলিতে গেলে "a practice has grown up to elect as the congress president the person upon whom Mahatma Gandhi's choice falls" কাজেই, এ পর্য্যন্ত কংগ্রেস-সভাপতি নির্বাচনে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় নাই। সকলেই আশা করিয়াছিলেন গান্ধীজীর মধ্যস্থতায় এই অপ্রীতিকর নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বের অবসান হইবে। কিন্তু মহাত্মা বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না—একরূপ বিস্ময়কর নীরবতা অবলম্বন করিয়া রহিলেন। মহাত্মাজীর কোন ইঙ্গিত না পাইয়া ডেলিগেটগণ নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী সভাপতি নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইলেন। ফলে কংগ্রেসের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম সভাপতি পদের জন্য নির্ব্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইল। নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে নানা প্রকার অভিসন্ধিমূলক হীন ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে। কিন্তু নির্ব্বাচনে জনগণ সুভাষচন্দ্রের অনুকূলেই রায় প্রদান করিলেন—কিঞ্চিদধিক দুইশত ভোটাধিক্যে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। কেবল বাঙ্‌লা নহে, যুক্তপ্রদেশ, তামিলনাড, পাঞ্জাব, কেরলা, দিল্লী, আজমীর, আসাম, কর্ণাটক হইতেও তিনি বিপুল সমর্থন লাভ করেন। জনগণের রায় তাহাদের চিরপ্রিয় নির্ভীক যোদ্ধা সুভাষচন্দ্রের সমর্থনেই ঘোষিত হইল। সুভাষচন্দ্রের জয়লাভে গর্বান্ধ উপদলীয় প্রভুত্বের দর্প চূর্ণ হইল। সর্বজননিন্দিত যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনাকে ভারতবর্ষের স্কন্ধে জোর করিয়া চাপাইবার গোপন চক্রান্ত ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল। সুভাষচন্দ্রের জয়লাভে ক্ষমতাভিমানী প্রবীণ দলের বিরুদ্ধে নবীনদলের জয় সূচিত হইল। তাঁহার পুনর্নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের গতানুগতিকতা ও আপোষরফামূলক মোলায়েম নীতির পথ রুদ্ধ হইল।

বাইশ

৩০শে জানুয়ারী কলিকাতার নাগরিকবৃন্দের পক্ষ হইতে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক মহতী জনসভায় নবনির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে যে অভিনন্দন প্রদান করা হয় তাহার উত্তরে সুভাষচন্দ্র বলেন,—"আমার জয়লাভে নীতি ও আদর্শের জয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে ব্যক্তিত্বের কথা আসে না।" দক্ষিণপন্থীদের পরাজয়ের ফলে কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে যাহাতে কোন প্রকার দলাদলির সৃষ্টি না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করিলেন, ইহা আনন্দ প্রকাশের সময় নহে—যে গুরু কর্ত্তব্যের বোঝা আমাদের উপরে ন্যস্ত হইয়াছে আশা করি আমার সমর্থকগণ সে সম্বন্ধে অবহিত হইবেন। ঐ দিন নির্ব্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে তিনি যে বিবৃতি প্রচার করেন তাহাতে তিনি বলেন, "ভারতের স্বাধীনতা লাভের শত্রুরা হয়ত এই ভাবিয়া উৎফুল্ল হইয়াছেন যে, এই নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বের ফলে কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি সূচিত হইতেছে। কিন্তু আমি সুস্পষ্টভাবে সকলকে জানাইয়া দিতেছি যে, কংগ্রেস পূর্ব্বের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ রহিয়াছে—কোন দলাদলি ঘটিতে পারে নাই। কোন কোন বিষয়ে কংগ্রেসকর্ম্মীদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সকলেই একমত। দেশের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দল ও প্রতিষ্ঠান সমূহের ঐক্য ও সংহতি বর্ত্তমানে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়। যাহাতে সেই ঐক্য ও সংহতি পরোক্ষভাবেও ক্ষুন্ন হইতে পারে, এমন কোন কাজ করা বা কথা বলা আমাদের পক্ষে উচিত হইবে না।" সুভাষচন্দ্র দেশবাসীকে তাঁহার জয়লাভে হর্ষ প্রকাশে বিরত থাকিতে পরামর্শ দিলেও সমগ্র ভারতবর্ষে এখন ইহাই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। দলাদলিপ্রিয় কোন কোন সংবাদপত্র দক্ষিণপন্থীদের এই পরাজয়ে

কংগ্রেসের ইতিহাসে গান্ধীযুগের যবনিকাপাত হইল বলিয়া বিদ্রূপ করিতেও ছাড়ে নাই। এই শ্রেণীর অনিষ্টকারী সমালোচকদের ভেদ-সৃষ্টিকর উক্তির প্রতিবাদে সুভাষচন্দ্র শীঘ্র এক বিবৃতি প্রচার করিয়া ঘোষণা করিলেন, "সমস্ত সময় আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকিবে মহাত্মার বিশ্বাস অর্জ্জন করা; কারণ, অন্য সকলের আস্থা লাভ করিয়াও যদি মহাত্মার বিশ্বাসভাজন হইতে না পারি তবে আমার পক্ষে তাহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হইবে।"

সুভাষচন্দ্রের এই সকল বিবৃতির পরে সকলেই আশা করিয়াছিল যে দক্ষিণপন্থীরা তাঁহাদের এই পরাজয়কে সহজভাবেই গ্রহণ করিবেন; কিন্তু, এই সময়ে একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে মহাত্মাজী যে বিবৃতি প্রচার করিলেন তাহাতে বিরোধ আরও তীব্র ও শোচনীয় হইয়া উঠিল। কাহারও জানিতে বাকী রহিল না যে গান্ধীজীর আন্তরিক সমর্থন ছিল ডাঃ পট্টভির দিকে এবং সুভাষচন্দ্রের জয়লাভে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। মহাত্মা গান্ধীর সম্পূর্ণ বিবৃতিটি এই:—"শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সুস্পষ্টরূপেই জয়লাভ করিয়াছেন। আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, গোড়া হইতেই আমি তাঁহার (সুভাষচন্দ্রের) পুনর্নির্ব্বাচনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম। ইহার কারণ এস্থলে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। নির্ব্বাচনী প্রচারপত্রে তিনি যে সকল তথ্য ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমি সমর্থন করি না। আমি মনে করি যে, সহ-কর্ম্মীদের কথা তিনি যে ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা তাঁহার পক্ষে অযৌক্তিক ও অশোভন হইয়াছে। তথাপি তাঁহার জয়লাভে আমি আনন্দিত। মৌলানা সাহেব তাঁহার নাম প্রত্যাহার করিবার পর আমার চেষ্টাতেই ডাঃ পট্টভি নির্ব্বাচন হইতে সরিয়া দাঁড়ান নাই। অতএব এই পরাজয় তাঁহার অপেক্ষা আমারই অধিক। আমি যদি সুস্পষ্ট নীতি

ও কর্ম্মপদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব দাবী করিতে না পারি তবে আমার কোনই মূল্য নাই। অতএব আমার নিকট ইহা সুস্পষ্ট যে, আমি যে নীতি ও কার্য্যপদ্ধতির পরিপোষক, ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা তাহা সমর্থন করেন না। এই পরাজয়ে আমি আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

দিল্লীতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভা হইতে সংখ্যালঘিষ্ঠদলের বাহির হইয়া যাওয়া সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধে আমি যাহা প্রচার করিয়াছিলাম, সেই নীতি অনুসারে কাজ করিবার এখন আমার একটা সুযোগ হইয়াছে। সুভাষবাবু যাঁহাদিগকে দক্ষিণপন্থী বলেন, এখন তিনি তাঁহাদের অনুগ্রহে সভাপতি না হইয়া প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন দ্বারা নির্ব্বাচিত সভাপতি। ইহার ফলে তিনি একমতাবলম্বী সদস্যগণ দ্বারা গঠিত ওয়ার্কিং কমিটি মনোনয়ন এবং বিনাবাধায় তাঁহার রচিত কর্মপন্থা অনুসারে কার্য্য করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন।

সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু এই উভয়দলের মধ্যে একটা বিষয়ে মতের মিল আছে। কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ পবিত্রতার জন্য উভয়দলই আগ্রহশীল। হরিজন-পত্রে আমার যে সব লেখা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখান হইয়াছে যে, কংগ্রেস অতি দ্রুত একটা দুর্নীতিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতেছে—অর্থাৎ কংগ্রেসের খাতার মধ্যে বহুসংখ্যক ভূয়া-সদস্যের নাম রহিয়াছে। বিগত কয়েকমাস ধরিয়া আমি এই সকল খাতা বিশেষ করিয়া সংশোধনের প্রস্তাব করিতেছি। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, এই সকল ভূয়া ভোটারের ভোটে নির্বাচিত বহু সদস্যই পরীক্ষার ফলে অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন।

কিন্তু আমি এখন সেইরূপ কোন কঠোর পন্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করি না। ভবিষ্যতে কংগ্রেসের খাতাগুলি হইতে যদি সমস্ত ভূয়াসদস্যের নাম কাটিয়া দেওয়া হয় এবং প্রবঞ্চনার পথ রোধের যথাযথ ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের নিরুৎসাহ হইবার

কোন কারণ নাই। কংগ্রেসের প্রবর্ত্তিত বর্ত্তমান কার্য্যক্রমের উপর যদি তাঁহাদের বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা দেখিবেন যে, তাঁহারা সংখ্যালঘু অথবা সংখ্যাগুরু যাহাই হউন না কেন, এমনকি তাঁহারা কংগ্রেসের ভিতরে অথবা বাহিরে যেখানেই থাকুন না কেন, এই কার্য্যক্রম অনুসারে কাজ করা চলিবে। কংগ্রেসের এই পরিবর্ত্তনের ফলে একমাত্র পার্লামেণ্টারী কার্য্যক্রমই সম্ভবতঃ প্রভাবিত হইবে।

এতদিন যাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন, তাঁহারা মন্ত্রীদিগকে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের কার্য্যক্রমের মধ্যে পার্লামেণ্টারী কার্য্যক্রম একটি অপ্রধান বিষয় মাত্র; অবশ্য কংগ্রেসী মন্ত্রীদের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। যদি কোন বিষয়ে কংগ্রেসের নীতি অনুসারে তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে বলা হয়, কিংবা যদি তাঁহারা কংগ্রেসের সহিত একমত হইতে না পারিয়া পদত্যাগ করেন, তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ কিছু যায় আসে না।

হাজার হোক, সুভাষবাবু ত আর দেশের শত্রু নন। তিনি দেশের জন্য নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যক্রম এবং নীতিকেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রগতিমূলক মনে করেন। যাঁহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ তাঁহারা কেবলমাত্র উহার সাফল্য কামনা করিতে পারেন। তাঁহারা যদি উহার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের শক্তি বৃদ্ধি করিবেন; কোনক্রমেই বাধা সৃষ্টি করা সংখ্যালঘিষ্ঠদের উচিত হইবে না। যখন তাঁহারা সহযোগিতা করিতে অসমর্থ হইবেন তখন তাঁহারা সহযোগিতা হইতে বিরত থাকিবেন। কংগ্রেসসেবিগণকে আমি স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, যাঁহারা কংগ্রেসী হইয়াও কংগ্রেসের বাহিরে থাকেন, তাঁহারাই কংগ্রেসের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। সুতরাং যাঁহারা কংগ্রেসে থাকা অস্বস্তিকর মনে করিবেন তাঁহারা বাহিরে চলিয়া আসিতে পারেন। তাঁহারা কোনপ্রকার বিদ্বেষভাব পোষণ

করিয়া বাহির হইবেন না; কার্য্যকরীভাবে দেশের অধিকতর সেবা করার উদ্দেশ্য লইয়াই তাঁহারা বাহিরে আসিবেন।”

মহাত্মা গান্ধীর এই বিবৃতির উত্তরে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করেন :—

“সম্প্রতি কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহা আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতায় ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার পরাজয়কে মহাত্মা গান্ধী স্বকীয় পরাজয় বলিয়া গণ্য করিয়াছেন দেখিয়া আমি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি। তাঁহার প্রতি যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক আমি এই বিষয়ে তাঁহার সহিত ভিন্নমত হইতে চাই। ভোটদাতাগণ অর্থাৎ প্রতিনিধিগণ মহাত্মা গান্ধীর স্বপক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ হন নাই। অতএব, আমার এবং অধিকাংশ লোকের মতে নির্বাচন প্রতিযোগিতার ফলাফল ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার জয় পরাজয়ের সূচক নহে।

কংগ্রেসের বাম ও দক্ষিণপন্থীদের লইয়া কয়েকদিন যাবৎ অনেকে অনেককিছু বলাবলি করিয়াছেন, সংবাদপত্রেও অনেককিছু প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকেই সভাপতি নির্ব্বাচনের ফলকে বামপন্থীদের জয় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। আমার বক্তব্য এই যে, এই নির্ব্বাচনের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া যেন আমরা অতিরিক্ত কল্পনাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করি বা অতিরিক্ত রং ফলাইয়া না ফেলি। তর্কের খাতিরে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, নির্বাচন ব্যাপারে বামপন্থিগণেরই জয় হইয়াছে, তাহা হইলেও বর্ত্তমানে আমাদিগকে বামপন্থিগণের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইবে। বামপন্থিগণ কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির দায়িত্ব স্কন্ধে লইবেন না। যদি বিভেদের সৃষ্টিই হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের কার্য্যকলাপের জন্যই যে এইরূপ হইবে তাহা নহে, বিভেদ নিবারণে তাঁহারা চেষ্টা করিলেও বিভেদের সৃষ্টি হইবে।

কংগ্রেসের মধ্যে দলগত বিরোধের যে ধুয়া উঠিয়াছে, আমি তাহার কোন যুক্তি ও কারণ খুঁজিয়া পাইতেছিনা। তবু যদি কোনদিন এইরূপ কোন বিরোধ অনিবার্য্য হইয়া উঠে তবে আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া তাহার গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিব। আমাদের ভবিষ্যৎ নীতি সম্পর্কে আমি এই কথাই বলিতে চাই যে, আমাদের নির্ব্বাচন-প্রতিশ্রুতি ও পার্লামেণ্টারী কার্য্যসূচি আমরা ভবিষ্যতে অধিকতর যত্নের সহিত সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিব। যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য এবং পূর্ণ স্বরাজের পথে অগ্রসর হইবার জন্য আমাদের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত হইবে এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নীতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়াই আমরা আমাদের গন্তব্যপথে অগ্রসর হইব। এই সম্পর্কে আমি ইহাও বলিতে চাই যে, মহাত্মাজীর সহিত আমার মতানৈক্যের জন্য আমি গভীর বেদনা অনুভব করিতেছি। কিন্তু একথা খুবই সত্য যে, মহাত্মাজীর ব্যক্তিত্বের নিকট সর্ব্বদাই আমি আমার মস্তক আনত করিতে গৌরব অনুভব করিব। আমার সম্পর্কে মহাত্মা কিরূপ মত পোষণ করেন তাহা আমি জানি না। কিন্তু তাঁহার মতামত যাহাই হউক না কেন, তাঁহার বিশ্বাস ভাজন হওয়ার জন্য আমি সর্বদা সচেষ্ট থাকিব। অন্যান্য সকলের আস্থা অর্জ্জন করিয়া আমি যদি ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের আস্থা লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে উহা আমার পক্ষে বিশেষ পরিতাপের বিষয় হইবে।”

মহাত্মাজীর বিবৃতি প্রচারের ফলে অবস্থার উন্নতি হওয়া ত দূরের কথা পরিস্থিতি অধিকতর জটিলাকার ধারণ করিল। এমন কি উক্ত বিবৃতি প্রদানের ফলে যে সংকটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল তাহাই শেষ পর্যান্ত সুভাষচন্দ্রকে সভাপতিপদে ইস্তফা দিয়া ‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে বাধ্য করিয়াছিল—ইহাই অনেকের ধারণা। আসল কথা, মহাত্মাজীর বিবৃতিকে তাঁহার অনুচরবর্গ ঠিক মহাত্মার দৃষ্টি দিয়া

দেখিতে পারেন নাই—ফলে, এই বিবৃতিতে তাঁহারা যেন তাঁহাদের অভিসন্ধিমূলক কার্য্যের সমর্থন পাইলেন। সুভাষচন্দ্র শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও চিকিৎসকের পরামর্শের বিরুদ্ধে ওয়ার্দ্ধা গিয়া গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই সাক্ষাৎকারের ফল প্রথমতঃ শুভ বলিয়াই মনে হইয়াছিল। মহাত্মার অনুমতি লইয়া সুভাষচন্দ্র এই সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রদান করেন তাহাতে প্রকাশ, মহাত্মাজী তাঁহাকে এই আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, তিনি গান্ধীজীর পরিচালনা ও পরামর্শ লাভে বঞ্চিত হইবেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সুভাষচন্দ্রের এই বিবৃতি প্রকাশের পরেই মহাত্মাজী জনৈক সাক্ষাৎকারীকে বলেন যে তিনি (মহাত্মা) সুভাষচন্দ্রকে সুস্পষ্টরূপেই জানাইয়া দিয়াছেন যে সুভাষচন্দ্র নূতন ওয়াবিং কমিটি গঠনে তাঁহার পূর্ব্বতন সহকর্মীদের নিকট হইতে কোনরূপ সহযোগিতা আশা করিতে পারেন না। ওয়ার্কিং কমিটির দক্ষিণপন্থী সদস্যগণও বেশ দৃঢ়তার সহিত ইহা ঘোষণা করিয়াছেন যে ত্রিপুরী কংগ্রেসে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্দ্ধারণে তাঁহাদের কিছুই করিবার নাই। ইহার পর হইতেই কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ সংকট তীব্রতর হইয়া উঠিল।

২২শে ফেব্রুয়ারী ওয়ার্দ্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হইবার কথা ছিল। সুভাষচন্দ্রের শরীরের অবস্থা তখন মোটেই সন্তোষজনক নয়। এমতাবস্থায় ওয়ার্দ্ধা যাইবার পথশ্রম ও অধিবেশনের কার্য্য পরিচালনার গুরুভার তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হইতে পারে বিবেচনা করিয়া ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার সুভাষচন্দ্রকে ওয়ার্দ্ধা যাইতে নিষেধ করেন। মার্চ্চ মাসে ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের অধিবেশনও আগতপ্রায়। এ কয়দিন বিশ্রাম গ্রহণ করিলে ত্রিপুরী কংগ্রেসে যোগদান করিতে সমর্থ হইবেন মনে করিয়া সুভাষচন্দ্রও ওয়ার্দ্ধা না যাওয়াই স্থির করিলেন। এদিকে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় উপস্থিত করিবার জন্য প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তুত

করিতে হইবে। প্রস্তাব সম্পর্কে সদস্যগণের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সভাপতির উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন; নতুবা তিনি তাঁহার অনুপস্থিতিতেই বৈঠকের আলাপ-আলোচনা চালাইয়া যাইতে নির্দ্দেশ দিতেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া সুভাষচন্দ্র সর্দ্দার প্যাটেল ও গান্ধীজীকে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ত্রিপুরী অধিবেশন পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিতে অনুরোধ জানাইয়া এক জরুরী তার প্রেরণ করেন। এই তারের যে উত্তর আসিল তাহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ও হৃদয়বিদারক। সর্দ্দার প্যাটেল সদলবলে ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যপদ ত্যাগ করিলেন। অপরদিকে তাঁহারা রটনা করিয়া দিলেন যে ওয়ার্কিং কমিটির সম্মুখীন হইতে সাহস না থাকায় সুভাষচন্দ্র অসুস্থতার ভান করিয়াছেন! এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ত্রিপুরী অধিবেশন পর্য্যন্ত সহজেই স্থগিত রাখা চলিত। সাধারণতঃ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের পূর্বদিন কিংবা মাত্র দুই একদিন পূর্বে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হইয়া থাকে।

সর্দ্দার প্যাটেলের নেতৃত্বে ওয়ার্কিং কমিটির বারজন দক্ষিণপন্থী সদস্য পদত্যাগ করিলেন। কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতির কিরূপ পরিবর্ত্তন হইবে তাহা না জানিয়াই ত্রিপুরী কংগ্রেসের পূর্ব্বেই তাঁহাদের এই পদত্যাগ যে শোভন হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। পদত্যাগপত্রে তাঁহারা লিখেন, "* * আমরা ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করা আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া এতদ্বারা ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যপদ ত্যাগ করিতেছি। আমাদের মনে হয়, আপনার মনোমত কর্ম-পরিষদ গঠনে আপনাকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়াই কর্ত্তব্য। মনে হয়, কংগ্রেসের বিভিন্ন দলের আপোষ-নিষ্পত্তির ভিত্তির উপর রচিত কোন কর্মনীতির পরিবর্ত্তে কংগ্রেসের একটা সুস্পষ্ট কর্মনীতি অনুসরণের সময় আসিতেছে। এজন্য আপনার নিজ মতানুবর্ত্তীদের মধ্য হইতে আপনার নিজ কর্মপরিষদের

সদস্যগণকে বাছাই করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। আপনি দেশের জন্য যে কর্মনীতি রচনা করেন, উহার যে যে স্থলে আমাদের সহযোগিতা করা সম্ভব, আমরা সেই সেই স্থলে আপনার সহিত সহযোগিতা করিব।" ঐ দিনই পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু পত্র যোগে সুভাষ-চন্দ্রকে জানান যে বর্ত্তমানে, বিশেষ করিয়া কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনের পর যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে তিনিও আর কংগ্রেস ওয়াকিং-কমিটি সদস্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে পারেন না। ওয়াকিং কমিটির বারজন সদস্যের পদত্যাগের ফলে বর্ত্তমানে ওয়ার্কিং কমিটির অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে বলিয়াই পণ্ডিতজী মনে করেন, এবং এই পরিণতির ফলে ব্যক্তিগতভাবেও তিনি শ্রীযুক্ত বসুকে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিবেন না। ঐ পত্রের উপসংহারে পণ্ডিতজী লিখেন, "আমি পাকা সমাজতান্ত্রিক এবং গণতন্ত্রে আস্থাবান হইলেও গত ২০ বৎসর যাবৎ অনুসৃত মহাত্মা গান্ধীর অহিংস শান্তিপূর্ণ পন্থা সর্ব্বান্তঃকরণেই গ্রহণ করিয়াছি।" অর্থাৎ, পরোক্ষভাবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও পদত্যাগ করিলেন।

সুভাষচন্দ্র ও দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে মতবিরোধ তাহা মূলতঃ সংগ্রামমূলক মনোভাব ও সংগ্রামবিমুখ মনোভাবের বিরোধ মাত্র। সুভাষচন্দ্র সংগ্রামশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন এবং প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন। সংগ্রামমূলক কর্মপন্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত দ্বারাই তিনি কংগ্রেসের বামপক্ষের সমর্থন লাভ করিয়াছেন—সুতরাং দক্ষিণপন্থিগণ তাঁহার সহিত কিছুতেই সহযোগিতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন না। কংগ্রেসের ঐক্য ও সংহতি রক্ষাকল্পে সুভাষচন্দ্র চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নাই, তৎসত্ত্বেও কংগ্রেসের মধ্যে ভেদ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। এদিকে ইউরোপের আকাশে তখন বিশ্বযুদ্ধের মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে—যে

কোন মুহূর্ত্তেই প্রলয়ঝঞ্ঝা সুরু হইতে পারে। ভারতবর্ষেও যে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে না তাহা কে বলিতে পারে? এইরূপ অবস্থায় সুভাষচন্দ্র বলিষ্ঠ মনোভাবের পরিচয় দিতে দ্বিধা করিলেন না। তিনি পদত্যাগেচ্ছু সভ্যদের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করাই সমীচীন মনে করিলেন।

উল্লিখিত বারজন সদস্যের পদত্যাগপত্র গ্রহণের কথা সুভাষচন্দ্র ২৬শে ফেব্রুয়ারী এক পত্রযোগে সদস্যবর্গকে জানাইয়া দেন। ঐ পত্রে তিনি লিখেন, "আপনারা সম্মিলিত ভাবে ২২শে ফেব্রুয়ারী ওয়ার্দ্ধা হইতে যে পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহা যথাসময়ে আমার নিকট পৌঁছিয়াছে। আমার অসুস্থতার জন্য এতদিন পর্য্যন্ত উহার উত্তর দিতে পারি নাই। সাধারণ ক্ষেত্রে আমি আপনাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পুনর্ব্বিবেচনা করিতে এবং ত্রিপুরীতে আমাদের সাক্ষাৎ না হওয়া পর্য্যন্ত আপনাদের পদত্যাগ স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিতাম। কিন্তু আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আপনারা বিশেষভাবে সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আপনাদের পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের যদি বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আপনাদিগকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিতাম। বর্ত্তমান অবস্থায় এইরূপ মামুলী অনুরোধে কোন লাভ নাই। কাজেই গভীর দুঃখের সহিত আপনাদের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিতেছি।

আমি মনে করি, আপনাদের পদত্যাগের দ্বারা ইহা বুঝাইবে না যে, আপনারা সহযোগিতা প্রত্যাহার করিতেছেন। আমি একান্তভাবে বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতে আমার কার্য্য সম্পাদনে আমি আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভে সমর্থ হইব। আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা যে মূল্যবান তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। আমি আরও আশা করি, ত্রিপুরী কংগ্রেসে আমাদের মধ্যে মতানৈক্য অপেক্ষা ঐক্য অধিকমাত্রায়

পরিলক্ষিত হইবে ; ইহার ফলে আমরা ভবিষ্যতে সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিতে সক্ষম হইব।”

পণ্ডিত জওহরলাল পদত্যাগ করিয়াছেন কিনা তাহা স্পষ্টভাবে জানাইতে বলিয়া সুভাষচন্দ্র পণ্ডিতজীর নিকট এক পৃথক পত্র লিখেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে পণ্ডিত জওহরলাল লক্ষ্ণৌয়ে জনৈক বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে বলেন—তিনি তাঁহার পত্রে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করেন নাই ; প্রকৃতপক্ষে, ওয়ার্কিং কমিটির বারজন সদস্যের পদত্যাগের ফলে উহা স্বতঃই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সুতরাং এক্ষেত্রে তাঁহার পদত্যাগের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

ত্রিপুরী অধিবেশনের আর কয়েকদিন মাত্র বাকী। রাষ্ট্রপতি রোগশয্যায়—তাঁহার অবস্থা উদ্বেগজনক। এদিকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের পদত্যাগের ফলে সমস্ত কাজের দায়িত্ব তাঁহার উপর পড়িয়াছে। আচার্য্য কৃপালনীও পদত্যাগ করিয়াছেন—কাজেই সম্পাদকীয় দপ্তর ও তাঁহাকেই দেখিতে হইতেছে। পার্লামেণ্টারী সাব-কমিটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে উক্ত সাব কমিটির সর্বপ্রকার ক্ষমতা কংগ্রেস সভাপতি ও অবশিষ্ট একমাত্র সদস্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

সভাপতি নির্ব্বাচনের সূচনা হইতে দক্ষিণপন্থীদের পক্ষ হইতে সুভাষচন্দ্রের উপর যে সকল অভিযোগ আরোপ করার চেষ্টা হইয়াছে ঐ সকল অভিযোগের উত্তরে ৩রা মার্চ্চ সংবাদ পত্রে সুভাষচন্দ্র এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রচার করেন। কংগ্রেসের কয়েকজন প্রধান নেতা যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে আপোষের ভাব পোষণ করেন, সুভাষচন্দ্র এ কথা প্রচার করিয়া অন্যায় করিয়াছেন—সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থীদের ইহাই প্রধান অভিযোগ। এই অভিযোগের উত্তরে সুভাষচন্দ্র বলেন, “কংগ্রেসের প্রস্তাবে যদিও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অনমনীয় বিরোধিতা রহিয়াছে, তথাপি

ইহা সত্য যে, কোন প্রতিপত্তিশালী নেতা সর্ত্তাধীনে যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করিবার জন্য প্রকাশ্যে এবং ঘরোয়াভাবে মত প্রকাশ করিতেছেন এবং এ পর্য্যন্ত দক্ষিণপন্থী কোন নেতাই এইরূপ প্রচারকার্য্যের নিন্দা করেন নাই।" গান্ধীজী ও গান্ধীবাদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া তিনি উক্ত বিবৃতিতে লিখেন, "বর্ত্তমানে এরূপ ধারণার সৃষ্টি চলিতেছে যে, গান্ধীবাদের আদর্শ ও আঙ্গিকের প্রতি আমাদের বিশ্বাস নাই। কংগ্রেসী রাজনীতির উপর যে গান্ধীবাদ আরোপ করা হয় তাহা কি? সত্য ও অহিংসাই ইহার মূল নীতি—অহিংস অসহযোগিতাই ইহার কর্মপন্থা। আমাদের মূলনীতি ও পথের বিষয়ে কংগ্রেস কর্ম্মীদের মধ্যে কোন মতানৈক্য থাকিতে পারে না। যদি গান্ধীমতবাদ বলিতে কেহ মহাত্মাজীর ব্যক্তিগত আচরণ, তাঁহার আহার-পদ্ধতি, তাঁহার জীবনযাত্রাপ্রণালী, তাঁহার পোষক-পরিচ্ছদ প্রভৃতিকেও অন্তর্ভুক্ত করিতে চান, তবে মহাত্মাজীর তথাকথিত গোঁড়া ভক্তদের মধ্যেও কতজন তাহা বিশ্বাস করেন তৎসম্পর্কে আমার আশঙ্কা হয়। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অর্থ ইহা নহে যে, অন্ধের মত তাঁহার ইচ্ছা ও চিন্তাধারার অনুসরণ করিতে হইবে। আমি যদি তাঁহাকে ঠিকভাবে বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি ইহাও বলিতে পারি যে, কোন লোক যতক্ষণ পর্য্যন্ত মহাত্মাজীর সত্য ও অহিংসার মূলনীতির বিরোধিতা না করে, ততক্ষণ সে তাহার নিজস্ব বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কাজ করিবে ইহা মহাত্মাজীর অভিপ্রেত নয়। তাঁহার প্রতি আমার নিজের মনোভাব এই যে, স্বীয় বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়াও আমি তাঁহার বিশ্বাস অর্জ্জনের জন্য সচেষ্ট থাকিব।"

তেইশ

চিকিৎসকগণের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া ৫ই মার্চ্চ রবিবার রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র অসুস্থদেহে বোম্বাই মেলযোগে ত্রিপুরী যাত্রা করিলেন। গাড়ি ছাড়িবার পনের মিনিট পূর্বে সুভাষচন্দ্র একটি এ্যাম্বুলেন্স গাড়িতে হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হন। সুভাষচন্দ্রের শরীরের উত্তাপ তখন ৯৯'৪' ডিগ্রী। ইতিপূর্বে ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে ত্রিপুরী যাইতে নিষেধ করেন ও স্বাস্থ্যের অবস্থা উদ্বেগজনক বলিয়া মত প্রকাশ করেন। অসুস্থ শরীরেই তিনি ত্রিপুরী অভিমুখে রওনা হইলেন। হাওড়া ষ্টেশনে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে পুষ্পমাল্য-ভূষিত করেন। সুভাষচন্দ্রের কামরার বহির্দ্দেশে একটি বৃহৎ ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা দুলিতে থাকে। বিপুল বন্দেমাতরম্ ধ্বনির মধ্যে ট্রেণ খানি চলিতে আরম্ভ করে। সুভাষচন্দ্রের বৃদ্ধা জননী শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী তাঁহার সংগে ছিলেন।

ত্রিপুরীতে রাষ্ট্রপতির অভ্যর্থনার বিরাট আয়োজন হইয়াছিল। রাষ্ট্রপতিকে শোভাযাত্রা সহকারে লইয়া যাইবার জন্য ৫২টি হস্তিবাহিত সুদৃশ্য রথের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত দুর্বল ও ক্লান্ত বোধ করায় শোভাযাত্রার সহিত যাইতে পারেন নাই। রাষ্ট্রপতির একখানি বৃহৎ প্রতিকৃতি পুষ্প-মাল্য বিভূষিত করিয়া একটি অতিকায় নানা-অলঙ্কার-পরিশোভিত গজপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া শোভাযাত্রা চলিতে আরম্ভ করে। বিষ্ণুদত্ত নগর হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী 'পিসমিস মারিয়া' হইতে শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে এই শোভাযাত্রাকে উপলক্ষ করিয়া যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা গিয়াছিল তাহার তুলনা বিরল। ঝাণ্ডাচৌক পর্য্যন্ত এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিবার জন্য

পথের উভয় পার্শ্বে লক্ষ লক্ষ নর-নারী সমবেত হইয়াছিল। আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলে পাহাড় ও উপত্যকার মধ্য দিয়া রাষ্ট্রপতির শোভাযাত্রার অনুগমন করে। সেইদিন প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্বেই পথ জনসমুদ্রে পরিণত হয়। শত শত লোক গৃহের চাল, পাহাড় ও বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া শোভাযাত্রার মনোহর শোভা নিরীক্ষণ করে। শোভাযাত্রার অগ্রভাগে এক বিরাটকায় হস্তী হাওদার উপর স্থাপিত ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা বহন করিয়া সর্বাগ্রে চলিতে থাকে। মনে হইতেছিল, বায়ু-হিল্লোলে জাতীয় পতাকা যেন জাতীয় সংগীতের সহিত তালে তালে পত্ পত্ শব্দে উড়িতেছে। তৎপরে ২৫টি করিয়া দুই সারিতে ৫০টি হস্তী। প্রত্যেকটি-ই সুসজ্জিত ও নানালঙ্কারভূষিত। ৫০টি হস্তীর পৃষ্ঠে বিগত ৫০ বৎসরের কংগ্রেস সভাপতিদের এক একখানি প্রতিকৃতি বিরাজ করিতেছিল। মধ্যভাগে রাষ্ট্রপতির প্রতিকৃতিবাহী দ্বিরদ। এই নয়নাভিরাম দৃশ্য অবলোকন করিয়া বিরাট জনতা বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া প্রস্তরমূর্তিবৎ অবস্থান করিতেছিল। সেই বিপুলজনসংঘ সুভাষচন্দ্রকে দেখিতে না পাইয়া সুভাষচন্দ্রের প্রতিকৃতির উদ্দেশ্যে ভক্তিপরিপ্লুতচিত্তে মস্তক অবনত করিয়া অন্তরের শ্রদ্ধা ঢালিয়া দিল।

সুভাষচন্দ্র যখন এ্যাম্বুলেন্স যোগে ত্রিপুরী পৌছেন তখন তাঁহার শরীরের উত্তাপ ১০৩° ডিগ্রী। অভ্যর্থনা সমিতির চিকিৎসকগণের উপর তাঁহার সুশ্রূষার ভার অর্পিত হয়। সুভাষচন্দ্রের ত্রিপুরী আগমনের পূর্বেই ত্রিপুরীতে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল যে তিনি প্রকৃতপক্ষে অসুস্থ নহেন—অসুস্থতার ভান করিতেছেন মাত্র! কংগ্রেসের বড় কর্ত্তারা ইহাকে Political sickness বলিয়া তাঁহাদের সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন! ওয়ার্কিং কমিটির জনৈক প্রাক্তন সদস্য সুভাষচন্দ্রের চিকিৎসকগণকে গোপনে ডাকিয়া লইয়া সত্যই তাঁহার ১০৩° ডিগ্রী জ্বর আছে কিনা এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেও সঙ্কোচ বোধ করেন

নাই। ফলতঃ, কংগ্রেসের উচ্চমণ্ডলের নিকট সুভাষচন্দ্রের অসুস্থতার সংবাদ অবিশ্বাস্য বোধ হইয়াছিল। তাঁহাদের এরূপ আচরণ যে গভীর ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধিমূলক তাহার পরিচয় কিছুদিন পূর্বে ওয়ার্দ্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন সংক্রান্ত ব্যাপারেই পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন কংগ্রেস নেতার সন্দেহজনক কৌতূহল প্রকাশে বিরক্ত হইয়া সুভাষচন্দ্রের চিকিৎসকগণ সরকারী মেডিক্যাল বোর্ডের শরণাপন্ন হইলেন। মধ্য প্রদেশ ও বেরারের বেসামরিক হাসপাতাল সমূহের Inspector-General, মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের Director of Public Health ও জব্বলপুরের সিভিল সার্জ্জনকে লইয়া এই বোর্ড গঠিত হয়। এই বোর্ডের যুক্ত রিপোর্টে যখন সুভাষচন্দ্রের অসুস্থতার সংবাদ সমর্থিত হইল তখন হইতে অবস্থার কতকটা পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। জামাদোবা হইতে সুভাষচন্দ্র My strange illness নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখেন, উহা ১৯৩৯ সালের Modern Review'র এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ পাঠে সুভাষচন্দ্রের অসুস্থতার বিস্তৃত বিবরণ অবগত হওয়া যায়। সুভাষচন্দ্রের হিতৈষী বন্ধুদের কেহ কেহ তাঁহার এই অসুস্থতার কারণ 'বিষ-প্রয়োগ' বলিয়া বেশ গাম্ভীর্য্যের সহিত মন্তব্য করেন। সুভাষচন্দ্র এইরূপ সিদ্ধান্তকে কল্পনাবিলাসী উর্ব্বর মস্তিষ্কের পরিচায়ক বলিয়া হাসিয়াই উড়াইয়া দেন। সংস্কৃতজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরাও অনুরূপ কল্পনা-শক্তি প্রভাবে 'তান্ত্রিক প্রথায় মারণ-ক্রিয়ার প্রয়োগ করা হইয়াছে' বলিয়া মত প্রকাশ করেন। বিশেষ গবেষণা-লব্ধ এই সমস্ত কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীকে সুভাষচন্দ্র মোটেই আমল দিতেন না।

ত্রিপুরী অধিবেশনে কংগ্রেসের এক অধ্যায় সমাপ্ত হইয়া সম্পূর্ণ এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়। এই অধিবেশনের গুরুত্ব সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় অবহিত ছিলেন বলিয়াই শারীরিক অসুস্থতায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি ত্রিপুরী অধিবেশনে যোগদান করেন। ত্রিপুরীতে পণ্ডিত জওহরলাল

নেহরু তাঁহাকে জব্বলপুর হাসপাতালে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলে সুভাষচন্দ্র তাহার উত্তর দেন—"আমি জব্বলপুর হাসপাতালে যাইবার জন্য এখানে আসি নাই। এখানে যদি আমার মৃত্যু হয় সেও ভাল, তথাপি অধিবেশন সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আমি অন্য কোথাও যাইতে প্রস্তুত নই।" অবশ্য ম্যাডিকেল বোর্ডের নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহাকে কয়েকটি বৈঠকে অনুপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল। সুভাষচন্দ্রের অসুস্থতার একটি ফল এই হইয়াছিল যে, বিষয়-নির্বাচনী সমিতির কয়েকটি বৈঠকে এবং কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে তিনি উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ পণ্ডিত জওহরলালের সহায়তায় সভাপতির কার্য্য পরিচালনা করেন।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের অব্যবহিতপূর্বে গুজরাটের অন্তর্গত রাজকোট রাজ্যে প্রজাদিগের সহিত শাসকবর্গের বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় সত্যাগ্রহ হয়। কস্তুরবাঈ গান্ধী, মণিবেন প্যাটেল, মৃদুলাবেন সারাভাই প্রভৃতি খ্যাতনামা দেশসেবিকাগণ এই সত্যাগ্রহে যোগদান করিয়া কারাবরণ করেন। মহাত্মাগান্ধী বিচলিত হইয়া শাসকের সহিত প্রজাদের এই বিরোধ মিটাইতে অগ্রসর হন। কিন্তু রাজকোটের শাসক ও তাঁহার মন্ত্রী ঠাকুর সাহেব বিশ্বাসঘাতকতা করায় মহাত্মার হস্তক্ষেপেও কোন ফল হয় না। ফলে, ৩রা মার্চ্চ শুক্রবার দ্বিপ্রহর হইতে মহাত্মা গান্ধী প্রায়োপবেশন আরম্ভ করেন। এই সংবাদে দেশের সর্ব্বত্র তুমুল আন্দোলন হইতে থাকে। বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রীরা সম্মিলিতভাবে তার যোগে বড়লাটকে জানান যে, এই ব্যাপারে বড়লাট মধ্যস্থতা না করিলে কংগ্রেস-মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিবেন। গান্ধীজীর সহিত পত্রালাপ করিয়া অবশেষে বড়লাট রাজকোটের শাসককে গান্ধীজীর সর্ত্তে সম্মত হইতে বাধ্য করেন। তদনুসারে ৭ই মার্চ্চ ৪ দিন

উপবাসের পর মহাত্মা প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করেন। ৪ দিন উপবাসের ফলে তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। সেজন্য তিনি ত্রিপুরী কংগ্রেসে উপস্থিত থাকিতে পারিলেন না। সুভাষচন্দ্রের অনুরোধের উত্তরে মহাত্মা তাঁহাকে তারে জানাইয়াছেন—"আপনি চিকিৎসকের নির্দ্দেশ অবহেলা করিয়াছেন, কিন্তু আমার সে সাহস নাই।" মহাত্মার চিকিৎসকগণ তাঁহাকে সোমবারের পূর্বে কোথাও রওনা হইতে নিষেধ করিয়াছেন—অর্থাৎ যতদিন না কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হয়! কংগ্রেসের এই গোলযোগের সময় মহাত্মা রাজকোট সমস্যাকে প্রধান করিয়া লইলেন। এদিকে কর্ত্তব্যানুরোধে অসুস্থতাসত্ত্বেও নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরীতে উপস্থিত হন।

১৯৩৯ সালের ত্রিপুরি কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র নিম্নোক্ত অভিভাষণ প্রদান করেন :—

সহকর্মী চেয়ারম্যান, ভ্রাতা ও ভগিনীস্থানীয় প্রতিনিধিবৃন্দ,

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করিয়া আপনারা আমাকে যে মহাসম্মান প্রদান করিয়াছেন ও এখানে :আপনারা আমাকে যে আন্তরিক ও সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তজ্জন্য হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। অবশ্য, এই উপলক্ষে সাধারণতঃ অনুষ্ঠিত সমারোহের কতকাংশ আমার অনুরোধে আপনা-দিগকে বর্জন করিতে হইয়াছে। বন্ধুগণ, রাজকোটে মহাত্মা গান্ধী যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন ও তিনি যে উপবাস ভঙ্গ করিয়াছেন, তজ্জন্য সর্বপ্রথমে আমরা সকলে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। সমগ্র দেশ আজ বিরাট বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া অনির্বচনীয় সুখলাভ করিয়াছে।

বিশেষ বৎসর—বন্ধুগণ, নানা দিক দিয়া এই বৎসর একটি অস্বাভাবিক বা অসাধারণ বৎসর হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। এইবার রাষ্ট্রপতি-নির্বাচন প্রচলিত রীতি অনুযায়ী হয় নাই। রাষ্ট্র-পতি নির্বাচনের পরে এমন সব

চাঞ্চল্যকর ব্যাপার ঘটিয়াছে যাহার চরম পরিণতি স্বরূপ সর্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদ ও ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দ পদত্যাগ করিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম বিখ্যাত ও বিশিষ্ট সদস্য পণ্ডিত নেহেরু আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করিয়া না থাকিলেও এমন একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন যাহাতে সকলের মনেই এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে তিনিও পদত্যাগ করিয়াছেন।

ত্রিপুরি কংগ্রেসের প্রাক্কালে রাজকোটের ঘটনায় মহাত্মা গান্ধী মৃত্যুপণে অনশন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। রাষ্ট্রপতিও রুগ্ন অবস্থায় ত্রিপুরিতে আগমন করিয়াছেন। কাজেই, অন্যান্য বৎসরের অভিভাষণের আকার অপেক্ষা এই বৎসর রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের আকার ক্ষুদ্র হইলে, বর্ত্তমান পরিস্থিতির উপযোগীই হইবে।

ওয়াফ্‌দিষ্ট প্রতিনিধিমণ্ডলী—বন্ধুগণ, আপনারা জানেন যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অতিথিরূপে মিশর হইতে ওয়াফ্‌দিষ্ট প্রতিনিধিগণ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদের সকলকেই আমরা সাদর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ইয়োরোপীয় সঙ্কট—১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হরিপুরায় কংগ্রেস অধিবেশনের পরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ তাৎপর্য্য-পূর্ণ ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। এই ঘটনাগুলির মধ্যে ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ম্যুনিক চুক্তি (Munich Pact) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ—ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেন কীরূপ হীনভাবে নাজি জার্মানীর নিকট আত্মসমর্পন করিয়াছে, তাহা এই Munich চুক্তি হইতে বুঝা যায়। এই চুক্তির ফলে ইয়োরোপের নেতৃত্ব জার্মানীর হাতে চলিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি স্পেনে সাধারণতন্ত্রী গভর্ণমেণ্টের পতনে ফ্যাসিস্ত ইটালি ও নাজি জার্মানীর শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

বর্ত্তমানে ইয়োরোপীয় রাজনীতি হইতে সোভিয়েট রাশিয়াকে

বিতাড়নের জন্য তথাকথিত গণতান্ত্রিক শক্তিদ্বয় ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেন, ইটালি ও জার্মানীর সহিত হাতে হাত মিলাইয়াছে। কিন্তু এইরূপ মিতালি কতদিন বজায় থাকিবে—রাশিয়াকে দমন করিয়া ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনের কী লাভ হইবে? ইয়োরোপে ও এশিয়ায় বর্ত্তমানে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার ফলে শক্তি ও মর্য্যাদার দিক দিয়া ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের গতি বিশেষ বাধা ও পরাজয়ের সম্মুখীন হইয়াছে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

গ্রেট ব্রিটেনের চরমপত্র—আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে আমি দুই একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার আলোচনা করিব। প্রথমতঃ, কিছুকাল ধরিয়া আমি যাহা গভীরভাবে অনুভব করিতেছি—দ্বিধাহীন ও সুস্পষ্টরূপে তাহা আমি প্রকাশ করিতে চাই। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট চরমপত্রের আকারে আমাদের জাতীয় দাবী পেশ ও স্বরাজের প্রশ্ন উত্থাপনের প্রকৃত সময় ও সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কবে যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা আমাদের ঘাড়ে জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইবে, বর্ত্তমানের সমস্যা তাহা নহে। ইয়োরোপে শান্তিস্থাপন না হওয়া পর্য্যন্ত কয়েকবৎসর যদি যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা বলবৎ করা না হয়, তবে আমাদের কী করিতে হইবে ইহাই বর্ত্তমানের প্রধান সমস্যা। ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই যে, যদি ইয়োরোপে জোড়াতাড়া দিয়া কোন প্রকারে শান্তি স্থাপিত হয়, তবে গ্রেট ব্রিটেন সুকঠোর সাম্রাজ্যবাদনীতি গ্রহণ করিবে। প্যালেষ্টাইনে আরব ও ইহুদীদিগকে সন্তুষ্ট করিবার যে প্রয়াস ব্রিটিশ করিতেছে, তাহার কারণ এই যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্রিটেন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। অতএব আমার অভিমত এই যে, উত্তর প্রদানের সময় নির্দিষ্ট করিয়া আমাদের জাতীয় দাবি সম্বলিত চরমপত্র ব্রিটিশের নিকট পেশকরা উচিত। যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন সাড়া না পাই অথবা যদি উত্তর অসন্তোষজনক হয়, তবে আমাদের

জাতীয় দাবি স্বীকারে ব্রিটিশকে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে যে শক্তি আমাদের আয়ত্ত, তাহাই প্রযোগ করিতে হইবে।

আইন অমান্যরূপ গণ-আন্দোলন অথবা সত্যাগ্রহই বর্তমানে আমাদের একমাত্র শক্তি ও অবলম্বন। দীর্ঘকাল ধরিয়া নিখিল ভারতব্যাপী সত্যাগ্রহের সম্মুখীন হইবার শক্তি এখন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নাই। কংগ্রেসের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম করিবার প্রকৃত সময় এখনও আসে নাই—ইহাতে আমি দুঃখিত। বাস্তব দৃষ্টি সহকারে সমস্যার আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, নৈরাশ্যবাদের বিন্দুমাত্র কারণ নাই। আটটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ফলে আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের শক্তি ও মর্য্যাদা বিশেষ বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে, সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে গণ-আন্দোলনও বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে। দেশীয় রাজ্যসমূহেও অভূতপূর্ব জাগরণ আসিয়াছে। বিশেষতঃ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যখন আমাদের অনুকূল, তখন স্বরাজলাভার্থ আমাদের গণ-আন্দোলন আরম্ভ করিবার এমন সুযোগ ও সময় আমাদের জাতীয় ইতিহাসে আর কখনও কি আসিবে? শীতল-মস্তিষ্ক বাস্তববাদী হিসাবে আমি বলিতে পারি যে, সাম্প্রতিক পরিস্থিতির সমস্ত ঘটনাই আমাদের এইরূপ অনুকূল যে, এই সময়ে সাফল্যের উচ্চতম আশা পোষণ করিলেও অন্যায় হইবে না। যদি একবার আমাদের মধ্যেকার সমস্ত বিভেদ ভুলিয়া জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনায় আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করি, তবে এই অনুকূল অবস্থার পূর্ণতম সুযোগ গ্রহণ করিতে ও সুফল লাভ করিতে পারিব। জাতীয় জীবনে এইরূপ সুযোগ কদাচিৎ আসে, আমরা কি হেলায় সেই সুযোগ হারাইব?

দেশীয় রাজ্য—দেশীয় রাজ্যের নবজাগরণের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিবার সুযোগ যাহাতে গ্রহণ করিতে পারি, তদুদ্দেশ্যে নিখিল ভারত

দেশীয় প্রজাসম্মেলনের সহিত মহাত্মাগান্ধীর নির্দেশ ও সহযোগিতার আলোকে পূর্ণ সহযোগিতা করিতে হইবে।

ঐক্যের আহ্বান—স্বরাজলাভার্থ চূড়ান্ত সংগ্রাম আরম্ভ করিবার সমীচীনতার কথা বলিলাম। ইহার জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি ও আয়োজন চাই। প্রথমতঃ ক্ষমতালোলুপতাজনিত আমাদের মধ্যে যে দুর্বলতা ও দুর্নীতি প্রবেশ লাভ করিয়াছে কঠোরভাবে তাহার উচ্ছেদসাধন করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলন, কিষাণ আন্দোলন প্রমুখ সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রক্ষা করিয়া কাজ করিতে হইবে। দেশের আমূলপরিবর্তনপন্থী সকল বৈপ্লবিক আন্দোলনের সহিত পূর্ণ সঙ্গতি ও সহযোগিতা রক্ষা করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসসাধনের জন্য সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দলের সমবেত প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে। আজিকার দিনে কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থ আবহাওয়া মেঘাচ্ছন্ন। ইহার ফলে বিরোধ দেখা দিয়াছে। এইজন্য আমাদের বহু বন্ধু ও সহকর্মী নিরুৎসাহ ও বিষাদগ্রস্ত হইয়া আছেন। কিন্তু আমি চূড়ান্ত আশাবাদী। বর্ত্তমানের মেঘাড়ম্বর সাময়িক, আমার দেশবাসীর স্বদেশপ্রেমে আমার পূর্ণ আস্থা বর্ত্তমান। এবিষয়ে আমি নিশ্চিত যে অবিলম্বেই বর্ত্তমান বিরোধ দূরীভূত করিয়া আমাদের মধ্যে ঐক্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় আমরা সমর্থ হইব। ১৯৪২ সালের গয়া কংগ্রেসের কালে ও পরে দেশবন্ধু দাস ও পুণ্যস্মৃতি মতিলাল নেহরু যখন স্বরাজ্য পার্টি গঠন করেন, তখন কতকটা এই অবস্থা সঙ্কট ঘটিয়াছিল। আমার স্বর্গত গুরু ও শ্রদ্ধেয় মতিলালের ও ভারতমাতার অন্যান্য মহান সন্তানদের আত্মসাধনা বর্ত্তমান সঙ্কট-ত্রাণে আমাদিগকে উৎসাহিত ও প্রবর্ত্তিত করুক। মহাত্মা গান্ধী আমাদিগকে পরিচালনা করিবার ও আমাদের জাতীয় মুক্তিসাধনের জন্য এখনও আমাদের মধ্যে আছেন। তিনি বর্ত্তমান সঙ্কট দূরীকরণে আমাদের সহায় হউন—ইহাই আমার আকুল প্রার্থনা। "বন্দে মাতরম্"

চল্লিশ

ত্রিপুরীতে সুভাষচন্দ্র বৃটিশ সরকারকে ছয়মাসের চরম পত্র দিবার প্রস্তাব করিলেন ; কিন্তু কংগ্রেসী বড় কর্ত্তাদের নিকট হইতে তাহার যে উত্তর আসিল তাহা আদৌ রাজনৈতিক সমস্যাসম্পর্কিত নহে—তাহা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া দিয়া তাঁহাকে দক্ষিণপক্ষের কুক্ষিগত করিবার কূট ষড়যন্ত্রমূলক। যুক্তপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ এই অপকার্য্যের প্রধান সহায়ক হইয়া গণতন্ত্রের হত্যায় দক্ষিণ-পন্থীদের হাতিয়ারস্বরূপ ব্যবহৃত হইলেন। ত্রীপুরীতে অনুষ্ঠিত দক্ষযজ্ঞের হোতা পন্থজী যে প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন কংগ্রেসের ইতিহাসে তাহা পন্থ-প্রস্তাব নামে কুখ্যাত হইয়া থাকিবে। পন্থ-প্রস্তাব কংগ্রেসের ইতিহাসের শুভ্র ললাটে কলঙ্কতিলক আঁকিয়া দিয়াছে। ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচনের সূত্রপাত হইতে আরম্ভ করিয়া কলিকাতা ও ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নিখিলভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে রাষ্টপতির পদত্যাগ পর্য্যন্ত কংগ্রেস ইতিহাসের এই কয়টি পাতায় একখানি পূর্ণাঙ্গ বিয়োগান্ত নাটক রচিত হইয়াছে। পন্থ-প্রস্তাবের দ্বারা রাষ্ট্রপতিকে গান্ধীজীর কর্ত্তৃত্বাধীন করা হইল এবং রাষ্ট্রপতির প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করা হইল। পন্থ-প্রস্তাবটি এই—"গত কয়েক বৎসর যাবৎ মহাত্মা-গান্ধী নিরূপিত যে সব মূলনীতি অনুযায়ী কংগ্রেসের কর্ম্মপন্থা পরিচালিত হইয়াছে এই কমিটি সেই সব মূলনীতির প্রতি অবিচল আনুগত্য ঘোষণা করিতেছে এবং সুস্পষ্টভাবে এই অভিমত জ্ঞাপন করিতেছে যে, ঐ সব মূলনীতির কোন পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে না এবং ভবিষ্যতেও ঐ সব মূলনীতিই কংগ্রেসের কর্মপন্থা নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকিবে। এই কমিটি গতবৎসরের ওয়ার্কিংকমিটির কার্য্যে পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিতেছে

এবং ঐ কমিটির কোন কোন সদস্যের বিরুদ্ধে নিন্দাপ্রচার হইয়াছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। আগামী বৎসরে বিশেষ সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভবের সম্ভাবনা এবং যেহেতু ঐ সঙ্কটক্ষণে একমাত্র মহাত্মা গান্ধীই কংগ্রেস ও দেশকে বিজয়ের পথে পরিচালিত করিতে সক্ষম, সেই হেতু এই কমিটি মনে করে যে কংগ্রেসের কার্য-নির্বাহক কর্তৃপক্ষের প্রতি মহাত্মাগান্ধীর পূর্ণ আস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। অতএব, রাষ্ট্রপতির নিকট এই কমিটির অনুরোধ, তিনি যেন গান্ধীজীর ইচ্ছা অনুযায়ী আগামী বৎসরের ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করেন।”

পন্থজীর প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, অতীতে কংগ্রেসে গান্ধীজীর পরিচালনাধীনে একটি নির্দ্দিষ্ট কর্মপন্থা অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু, ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও পণ্ডিত মতিলালের নেতৃত্বে কংগ্রেসে স্বরাজ্যদল নামে একটি বিশিষ্ট দল গঠিত হয়। স্বরাজ্যদলের কর্মপন্থা মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশে উদ্ভাবিত ও অনুসৃত হয় নাই।

সুভাষচন্দ্র ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যের প্রতি অপমানসূচক উক্তি করিয়াছেন পন্থজীর প্রস্তাবে এইরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র নিজেই বহুবার বলিয়াছেন যে, তিনি কাহারও প্রতি বা কাহাকেও উদ্দেশ্য করিয়া কোনও অভিযোগ করেন নাই। তাঁহার সহিত দক্ষিণপন্থীদের যে পার্থক্য তাহা আদর্শ ও নীতির পার্থক্য—ব্যক্তিবিশেষের প্রশ্ন এখানে উঠে না। প্রস্তাবের উত্থাপক পন্থজী নিজেও স্বীকার করিয়াছেন, ব্যক্তিগতভাবে সভাপতির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করা তাঁহার অভিপ্রেত নয়। পন্থজী ও রাষ্ট্রপতির স্বীকারোক্তির পরেও ঐ অংশটি যে কেন তুলিয়া দেওয়া হইল না তাহা আমাদের বোধগম্য নয়। দক্ষিণপক্ষের জেদ—পন্থ প্রস্তাবের একটি ‘কমা’ও পরিবর্ত্তন করা চলিবে না!

কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র অনুসারে কংগ্রেস সভাপতি নিজমতানুযায়ী কর্ম-পরিষদ গঠনের সম্পূর্ণ অধিকারী। পন্থ-প্রস্তাবের দ্বারা সভাপতির

ন্যায়সঙ্গত অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে এবং কংগ্রেস সভাপতিকে মহাত্মা গান্ধীর 'রবার ষ্ট্যাম্পে' পরিণত করা হইয়াছে। গান্ধীজীকে কংগ্রেসের একচ্ছত্র অধিনায়ক করাই যদি গান্ধীবাদীদের আসল উদ্দেশ্য হয়, তবে গান্ধীজীকে কংগ্রেসের আজীবন সভাপতি (Life President) করিয়া রাখিলেই লেঠা চুকিয়া যাইত—নির্ব্বাচনের প্রহসন করিবার প্রয়োজন হইত না।

কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্র অনুসারে আইনসঙ্গত ভাবেই রাষ্ট্রপতি পন্থ-প্রস্তাবকে বিধিবহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিতেন, কিন্তু শুধুমাত্র নিয়ম শৃঙ্খলার দোহাই দিয়া প্রস্তাবটিকে বাতিল করিয়া দেওয়াকে তিনি কাপুরুষোচিত ও গণতন্ত্র-বিরোধী কাজ বলিয়া মনে করিলেন। উপরন্তু তিনি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে এই প্রস্তাবের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলিয়া এই প্রস্তাবের আলোচনাকেই তিনি প্রাধান্য দিলেন। দক্ষিণপন্থীরা পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন—ঐ দিন দক্ষিণপন্থীদেরই জয় হইল। সুভাষচন্দ্র যাহাদের উপর একান্তরূপে নির্ভর করিতেন তাহারাই শেষমুহুর্ত্তে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিপক্ষদলের জয়লাভে সহায়তা করিলেন। ঐক্যের দোহাই দিয়া অপরাপর বামপন্থীদলগুলি ঐক্য-প্রতিষ্ঠার মূলে কুঠারাঘাত করিল। জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদল ও সাম্যবাদীদল নিরপেক্ষ রহিল—এইরূপে বামপক্ষের সংহতি নষ্ট হইল। পণ্ডিত জওহরলালের হাতে যন্ত্রস্বরূপ থাকিয়া জয়প্রকাশ নারায়ণ নিখুঁত অভিনয় করিলেন। বাঙলার মধ্যে আজিকার বহুনিন্দিত মানবেন্দ্র নাথ রায়ই কেবল সেদিন সুভাষচন্দ্রের পক্ষে দক্ষিণপক্ষের বিরুদ্ধে লড়িয়াছিলেন।

পন্থ-প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে গণতন্ত্রবিরোধী। গণতন্ত্রের নামে এই গণতন্ত্র বিগর্হিত কার্য্যের নিদর্শন অতি অল্পই দেখা যায়। ইতিপূর্বে সর্দার প্যাটেল প্রমুখ নেতৃবর্গের আচরণে সাধারণ ভদ্রতাজ্ঞান ও শালীনতাবোধের

অভাব দেখা গিয়াছিল, কিন্তু ত্রিপুরীতে তাঁহারা নির্বাচিত সভাপতিকে অন্যের কর্তৃত্বাধীনে আনিবার হীন অভিসন্ধিমূলক নিয়মবহির্ভূত এক অদ্ভুত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া যে ঘৃণিত মনোবৃত্তির পরিচয় দিলেন তাহা কংগ্রেসের গৌরবময় অতীতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া গণতন্ত্রের স্থলে একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা করিল। বস্তুতঃপক্ষে সেদিন কংগ্রেসের অধিবেশনে অনেক দক্ষিণপন্থী নেতাই একনায়কত্বের অজস্র প্রশংসা করিয়া গুরুগম্ভীর বক্তৃতা করিলেন। পন্থজী মুক্তকণ্ঠে মুসোলিনীর ফ্যাসিষ্ট নীতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া ডিক্‌টেট্‌রসীপকেই একমাত্র প্রয়োজনীয় অস্ত্র হিসাবে ব্যাখা করিলেন। বক্তারা এক বাক্যে ঘোষণা করিলেন, কংগ্রেসই মহাত্মা—মহাত্মাই কংগ্রেস। সত্যমূর্ত্তি মহাত্মাকে ভগবানের অবতাররূপে বর্ণনা করিলেন। রাজাগোপালাচারী সুস্পষ্ট ভাবে জানাইয়া দিলেন, কংগ্রেস রাষ্ট্রতরীর মহাত্মাই একমাত্র সার্থক কর্ণধার। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শেঠ গোবিন্দদাস অধিকতর কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়া বলিলেন, মহাত্মার স্থান কংগ্রেসের উপরে—ফ্যাসিষ্টদের মধ্যে মুসোলিনীর যে স্থান, নাৎসীদের মধ্যে হিটলারের যে স্থান, কম্যুনিষ্টদের মধ্যে ষ্ট্যালিনের যে স্থান কংগ্রেসীদের মধ্যে গান্ধীজীর স্থানও ঠিক সেরূপ! গান্ধীজীকে সকলেই ভারতবর্ষের Non-violent Dictator বলিয়া ঘোষণা করিলেন। গান্ধী ডিক্‌টেটরের প্রশংসায় দিঙমণ্ডল মুখরিত হইল। 'মহাত্মাজী কী জয়! হিন্দুস্থান কী হিট্‌লার কী জয়!' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করিয়া তুলিল। গান্ধীবাদী দক্ষিণ পন্থীদের বিজয় উল্লাসের এইরূপ অর্থহীন প্রলাপোক্তি গান্ধীজীর কর্ণগোচর হইলে তিনি কি মনে করিতেন ভাবিয়া কৌতুক বোধ হইতেছে। গান্ধীজীর সহিত হিটলার-মুসোলিনীর তুলনা কতদূর অশোভন তাহা একবার গান্ধীজীর পাণ্ডাদের সুস্থমস্তিষ্কে ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল। ত্রিপুরীতে অভিমন্যুবধের পালা সমাপ্ত করিয়া প্রধান উদ্যোক্তা সর্দার

প্যাটেল বলিয়াছিলেন "লোকে আমাকে হিটলার বলে, আমি হিটলারের বাবা।" পন্থজীর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় পরক্ষণেই পণ্ডিত জওহরলাল যখন বৃটেনের পররাষ্ট্র নীতির নিন্দা করিয়া এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা করিলেন, বৃটেন ও ফ্রান্স গণতন্ত্রের হত্যা (Murder of Democracy) করিয়াছে, তখন অদৃশ্যদেবতা বোধ করি অলক্ষ্যে থাকিয়া গণতন্ত্রের হত্যাপরাধে অপরাধী দক্ষিণপন্থীদের মুখে বৈদেশিক শাসনে গণতন্ত্রহীনতার অভিযোগ শুনিয়া হাস্যসংবরণ করিতে পারেন নাই!

বামপন্থীদের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট হওয়ায় পন্থ-প্রস্তাব পাশ হইয়া গেল। সুভাষচন্দ্র নামে সভাপতি রহিলেন, কিন্তু কংগ্রেস তাঁহার মাথার উপর মহাত্মাজীকে বসাইয়া দিল। স্বাধীনভাবে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিবার ক্ষমতাও তাঁহার রহিল না। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে তখন দক্ষিণপন্থীদেরই সংখ্যাধিক্য।

পঁচিশ

ত্রিপুরীর অধিবেশন সমাপ্ত হইল—এইবার ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের পালা। পন্থজীর প্রস্তাবানুসারে সুভাষচন্দ্র ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে গান্ধীজীর নির্দ্দেশ চাহিয়া পাঠাইলেন। সুভাষচন্দ্র চাহিলেনদক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী উভয়দলেরই প্রতিনিধি লইয়া সর্বদলীয় (Composite) ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে। কিন্তু মহাত্মাজী তাহাতে সম্মতি দিলেন না। গান্ধীজী বলিলেন, হয় কেবল বামপন্থী, না হয় কেবল দক্ষিণপন্থী লোক লইয়াই একদলীয় (Homogeneous) ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে হইবে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তাহাতে সম্মত হইলেন না।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের সঙ্কল্প স্থূল আদর্শবাদ বা কল্পনাবিলাসিতার পরিচায়ক নহে, উহা কংগ্রেসের অতীত ইতিহাসের সহিত সর্ব্বতোভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও তৎকালীন পরিস্থিতির সূক্ষ্ম বিজ্ঞান-সম্মত বিশ্লেষণ ও গভীর রাজনীতিজ্ঞানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। অতীতে কংগ্রেসের কর্ম-পরিষদ কখনই একমতাবলম্বী লোক লইয়া গঠিত হয় নাই। পূর্ববর্ত্তী পরিষদেও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও পণ্ডিত জওহরলালকে দক্ষিণপন্থী বলা চলে না।

মহাত্মাজীর সহিত সুভাষচন্দ্রের এই বিষয়ে অনেক পত্র ও টেলিগ্রাম আদান-প্রদান হয়, কিন্তু মতভেদ দূর হয় নাই। শ্রীযুক্ত বসু তাঁহার পত্রে অসঙ্কোচে ও খোলাখুলিভাবে গান্ধীজীকে সমস্ত বিষয় জানাইয়াছেন। প্রত্যেকটি ঘটনা ও তাহার কার্য-কারণ যথাযথরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার পত্র পড়িয়া তাঁহার মনোগতভাব ঠিক ঠিক বুঝা যায়। কিন্তু গান্ধীজীর পত্র পড়িলে এই কথাই মনে হইবে যে তিনি যেন অত্যন্ত সাবধানে ও সতর্কতার সহিত প্রত্যেকটি কথা উচ্চারণ করিয়াছেন। সুভাষচন্দ্র নিজের মতামত নিঃশেষে ব্যক্ত করিয়া তাঁহার ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করিয়া লইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু গান্ধীজী তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিলেন না।

গান্ধী-বসু পত্রালাপ হইতে জানা যায়, রাজকোটে জনৈক সংবাদদাতা গান্ধীজীকে জানাইয়াছিলেন যে, ত্রিপুরীতে পূর্বতন ওয়ার্কিং কমিটির উপর আস্থা জ্ঞাপন করিয়া এক প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে। ইহাও প্রকাশ, গান্ধীজী উক্ত সংবাদদাতার নিকট এই প্রস্তাবের বিষয়ে তাঁহার সম্মতি জ্ঞাপন করেন। অবশ্য ইহা জানা যায় নাই, উক্ত সংবাদদাতা গান্ধীজীকে পূর্ণ প্রস্তাবটি শুনাইয়াছিলেন কিনা—বিশেষ করিয়া নূতন কর্ম-পরিষদ গঠন সম্পর্কিত অংশটি। শ্রীযুক্ত বসু এক পত্রে গান্ধীজীকে লিখিয়াছিলেন, "ত্রিপুরীতে জোর গুজব রটিয়াছে যে, পন্থ-প্রস্তাব আপনার সমর্থন

ও অনুমোদন লাভ করিয়াছে। আপনি সম্ভবতঃ অবগত আছেন যে, যাঁহারা পন্থ-প্রস্তাবের পক্ষে ভোট সংগ্রহের জন্য প্রচারকার্য্য চালায় তাঁহারা সকলকে এই কথাই বলিয়া বেড়ায় যে রাজকোটের সহিত টেলিফোনযোগে কথাবার্ত্তা হইয়াছে এবং গান্ধীজী তাঁহার পূর্ণ সমর্থন জানাইয়াছেন। ঘরোয়া বৈঠকের আলোচনায় ইহাও প্রকাশ করা হয় যে সম্পূর্ণ পন্থ-প্রস্তাবের উপর কোন সংশোধন বা ছাঁট-কাটেই গান্ধীজী ও তাঁহার গোঁড়া ভক্তগণ সন্তুষ্ট হইবেন না। ব্যক্তিগতভাবে আমি যদিও এই সকল গুজবে বিশ্বাস করি না, কিন্তু এই সকল অমূলক প্রচারকার্য্য ভোট-অর্জ্জনের পক্ষে নিঃসন্দেহে অনেকখানি সহায়তা করিয়াছে।" আশ্চর্য্যের বিষয় এই গুরুতর অভিযোগের উত্তর দেওয়া গান্ধীজী প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

যিনি কংগ্রেসের চার আনার সদস্য থাকিতেও অস্বীকৃত তাঁহাকে প্রস্তাবের দ্বারা কার্য্যতঃ ডিক্‌টেটরের ক্ষমতা দান কতদূর শোভন ও কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্র সঙ্গত তাহা বিবেচনা-সাপেক্ষ। মহাত্মা কি কংগ্রেসের চার আনা সদস্য হইতে ও কংগ্রেসের কার্য্যে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হইতে সম্মত হইতেন? বল্লভ-কোম্পানীর উচিত ছিল পূর্ব্বাহ্ণে গান্ধীজীর নিকট হইতে এ বিষয়ে তাঁহার সম্মতি লাভ করা।

১৯৩৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর গান্ধীজী কংগ্রেসের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। উক্ত ঘোষণায় তিনি বলেন, "কংগ্রেসের স্বাভাবিক বিকাশের পথে আমি সহায়ক না হইয়া অন্তরায় হইয়াছি। কংগ্রেস গণতান্ত্রিক ও প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান না হইয়া আমার নিজ ব্যক্তিত্বের দ্বারাই সমধিক প্রভাবান্বিত হইয়াছে। এই কারণে কংগ্রেসের মধ্যে সহজ সরল যুক্তির স্বাভাবিক বিকাশলাভের এখন কোন সুযোগ নাই।" কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে গান্ধীজীকে তাঁহার এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করিতে অনুরোধ করা হইলে

তদুত্তরে তিনি বলেন, "কংগ্রেস যাহাতে স্বাভাবিক পরিণতির পথে অগ্রসর হইতে পারে ও সহজভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হইতে পারে তাহার জন্যই আমি কংগ্রেসের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ ছিন্ন করিতে মনস্থ করিয়াছি। যে ভাবেই হউক, বর্ত্তমান সময়ে আমার উপস্থিতিতে কংগ্রেসের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে বিঘ্ন উৎপন্ন হইতেছে! ইহা এখন একটি কৃত্রিম ও জবরদস্তি-মূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে—যে কোন প্রতিষ্ঠান বা জাতির উন্নতির পথে এইরূপ অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ও অনিষ্টকর।" গান্ধীজীর এই ঘোষণা বলবৎ থাকা সত্ত্বেও গান্ধীজীর অনুচরবর্গ যে তাঁহার সম্মতি ব্যতিরেকেই গান্ধীজীর উপর সমস্ত দায়িত্বভার অর্পণ করিতে সাহসী হইলেন—ইহাই আশ্চর্য্য! আর যদি গান্ধীজীর সম্মতি প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়াই থাকে তাহা হইলে পূর্বোক্ত ঘোষণার সহিত পন্থ-প্রস্তাবের সামঞ্জস্য বিধান করা যায় কিরূপে?

ওয়ার্কিং কমিটির বার জন সদস্য তাঁহাদের পদত্যাগ পত্রে রাষ্ট্রপতিকে লিখিয়াছিলেন "আমাদের মনে হয়, আপনার মনোমত কর্ম-পরিষদ গঠনে আপনাকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়াই কর্ত্তব্য।" মহাত্মা গান্ধীও তাঁহার সমর্থকদের কংগ্রেসের বাহিরে থাকিয়া একনিষ্ঠভাবে দেশের সেবা করিয়া যাইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু পন্থ-প্রস্তাবের ফলে ত্রিপুরীতে গান্ধীবাদীদের যে স্বরূপ প্রকাশ পাইল তাহাতে সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচন ব্যাপারটিকে তাঁহারা যে সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না। সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁহাদের বিদ্বেষভাব এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে তাঁহারা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য বৃহত্তর জাতীয় কল্যাণকে বিসর্জ্জন দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। সুভাষচন্দ্র তাঁহার মনোনীত বামপন্থী কর্মীদের লইয়া অনায়াসে নিজ কর্মপরিষদ গঠন করিতে পারিতেন কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে কোনরূপ ভেদসৃষ্টি করা ও পন্থ-প্রস্তাবের অন্যথাচরণ করা তাঁহার অভিপ্রেত নয়

বলিয়াই তিনি বারংবার হাই কমাণ্ডের সহযোগিতা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সুভাষচন্দ্র যে একদলীয় ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে সম্মত হন নাই—আপাত-দৃষ্টিতে অনেকের নিকট দুর্ব্বলতাপ্রসূত বলিয়া মনে হইলেও ইহা তাঁহার বিশেষ রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। দুই বিরুদ্ধ দলের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিয়া কংগ্রেসকে ও জাতীয় আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে সুভাষচন্দ্র দক্ষিণপন্থীদের দ্বারস্থ হওয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছিলেন। ত্রিপুরী অভিভাষণে সুভাষচন্দ্র বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট চরম পত্রের আকারে জাতীয় দাবী পেশ করিবার যে সঙ্কল্প জানাইয়াছেন সেই চরম পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে ব্যাপক গণ-আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে। সেই গণ-আন্দোলন ব্যাপক আকারে সম্ভব হইতে পারে যদি কংগ্রেসের নির্দ্দেশ ও নেতৃত্বের পিছনে সমস্ত রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা থাকে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীসভার উপযোগিতা ও প্রয়োজন অপরিহার্য্য। অপরপক্ষে একদলীয় মন্ত্রীসভার দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীসভা গঠনের পক্ষে ইহাই সুভাষচন্দ্রের অন্যতম প্রধান যুক্তি।

মহাত্মা গান্ধী যখন কার্য্যতঃ সুভাষচন্দ্রকে নিজ মতানুযায়ী কর্মপরিষদ গঠন করিতে পরামর্শ দিলেন তখন যদি তিনি সেই পরামর্শানুসারেই মন্ত্রীসভার সভ্য মনোনয়ন করিতেন তাহা হইলে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর নির্দ্দেশের অনুরূপ কাজ করিতেন বটে কিন্তু তাহাতে পন্থ-প্রস্তাবের সর্ত্ত সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইত না। পন্থ-প্রস্তাবের সর্ত্তানুসারে কেবল ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে গান্ধীজীর নির্দ্দেশ লইলেই চলিবে না, ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য-গণ গান্ধীজীর আস্থাভাজন হওয়া চাই। কিন্তু মহাত্মাজী যখন সুভাষচন্দ্রকে তাঁহার Vote of Confidence দেন নাই তখন সুভাষচন্দ্রের মনোনীত সভ্যরা গান্ধীজীর আস্থাভাজন হইবে ইহা বলা চলে না। কংগ্রেসের পরবর্ত্তী

অধিবেশন পর্য্যন্ত গান্ধীজীর Vote of Confidence (সমর্থনের আশ্বাস) চাহিয়া পাঠাইয়াও সুভাষচন্দ্র তাহার কোন জবাব পান নাই। এক পত্রে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীকে লিখেন, "যদি শেষাবধি আপনি এই মতই পোষণ করেন যে সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীসভা কার্য্যকরী হইবে না ও একদলীয় মন্ত্রীসভাই একমাত্র অন্যতর উপায় এবং আপনি যদি আমাকেই আমার পছন্দমত মন্ত্রীসভা গঠন করিতে বলেন তাহা হইলে আমি আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইব যে, আপনি অন্ততঃ আগামী অধিবেশন পর্য্যন্ত আমার প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করুন।"

নিঃসংশয়ে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। ইহার পরে কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির দায়িত্ব যে কাহাদের তাহা সহজেই অনুমেয়।

ওয়ার্দ্ধায় গান্ধীজীর সহিত তিনঘণ্টাব্যাপী দীর্ঘ আলোচনা করিয়াও সুভাষচন্দ্র কোন মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য দেশবাসীর আকুল আবেদন ওয়ার্দ্ধাগঞ্জের নির্মম ও অবিচল মনোভাবে নিষ্ফল হইল। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের (মহাত্মার 'গুরুদেব') মধ্যস্থতায় কোন ফল হইল না। ১৬ই এপ্রিল তারিখে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এসোসিয়েটেড্ প্রেসের প্রতিনিধির মারফৎ স্বদেশবাসীর নিকট নিম্নলিখিত আবেদন জানান—"বর্ত্তমান অপ্রীতিকর অবস্থার কারণ ব্যক্তিগতই হউক বা রাজনীতিগতই হউক, এই অবস্থাঘটিত তিক্ততা নিবার্য্যই হউক কি অনিবার্য্যই হউক, এই বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, কোন পক্ষের রাজনৈতিক ক্ষমতা বা চাতুর্য প্রয়োগেই ইহার অবসান হইবে না। প্রায় সর্ববিধ বাস্তব উপকরণ ও উপায়ের অভাব সত্ত্বেও বিঘ্নজটিল পথে আমরা এখনও অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি ; এই সময়ে জাতীয় ঐক্যরূপ পরমতম প্রয়োজন সম্পর্কে

মারাত্মক বিস্মৃতি ও চেতনারাহিত্যের নানা কারণ ঘটিয়া থাকিলেও, যে মনোভাব ও চেতনা আমাদের ঐক্যবন্ধন দৃঢ় করিয়া তোলে, তাহার অপেক্ষা শ্রেয়ঃ ও পরম সম্পদ বর্ত্তমানে আমাদের আর কিছুই হইতে পারে না।

এই সময়ে পারস্পরিক সন্দেহ ও দোষানুসন্ধিৎসা আমাদের জাতীয় সংহতির যেরূপ হানিকর, এমন আর কিছুই নয়। কেবলমাত্র আমাদের নৈতিক বুদ্ধির প্রতি আবেদনেই, নৈতিক চেতনার উদ্বোধনেই এই সত্যের উপলব্ধি ঘটিতে পারে।

অতএব, মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ক্ষুদ্র বিষয়গুলিকে যেন আমরা পরম ক্ষমা ও উদারতার সহিত ভুলিয়া যাই—বাঙ্গালা তথা সমগ্র ভারতের স্বদেশীয়গণের প্রতি আমার এই ব্যাকুল আবেদন জ্ঞাপন করিতেছি।”

অবশেষে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের আভ্যন্তরিক অচল অবস্থা দূরীকরণের জন্য সর্ব্বশেষ প্রচেষ্টা হিসাবে রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দেওয়াই সাব্যস্ত করিলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯৩৯ সালের ২৮ শে এপ্রিল কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন আহূত হইল। এই অধিবেশন কলিকাতায় আহ্বান করাতে অনেকেই আশঙ্কা করিলেন বাঙলার জনসাধারণ এইবার ত্রিপুরীর অপমানের প্রতিশোধ লইবে। এই আশঙ্কার কথা জানিতে পারিয়া সুভাষচন্দ্র নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রচার করিয়া সকলকে আশ্বস্ত করিলেন। “যাহারা এই প্রকার আশঙ্কা পোষণ করেন আমার মতে তাঁহারা বাঙলাকে চেনেন না। কোন প্রদেশে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন আহ্বান করা সেই প্রদেশের পক্ষে গৌরবের বিষয় এবং সেই প্রদেশের উচিত এই অমূল্য সুযোগ সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া তাহার যথোচিত সদ্ব্যবহার করা। এই উপলক্ষে বাঙলার জনসাধারণ ও বিশেষ করিয়া কলিকাতাবাসীদের গৃহে ভারতের অন্য সকল প্রদেশের অধিবাসী অতিথি হইবেন। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, বাংলাদেশ যে দেশপ্রেম

ও আতিথেয়তার ঐতিহ্যের অধিকারী বলিয়া যথার্থই গর্ব অনুভব করিতে পারে সেই ঐতিহ্যের ধারা অব্যাহত রাখিয়া অভ্যাগতদের সাদরে অভ্যর্থনা করিবে ও বাঙলার চিরাচরিত অতিথিপরায়ণতার পরিচয় দিবে।" নির্দ্দিষ্ট দিনে কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অধিবেশন আরম্ভ হইল। এই অধিবেশনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা—সুভাষচন্দ্রের পতন ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের অভ্যুত্থান!

সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করিতে উঠিয়া তাঁহার পদত্যাগের কারণ সম্বন্ধে বলিলেন,—'আমার উপর মহাত্মাজীর নির্দ্দেশ, আমি যেন পূর্বতন ওয়ার্কিং কমিটির যে কয়জন সদস্য পদত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের বাদ দিয়া নূতন বৎসরের ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করি। কয়েকটি কারণে আমি গান্ধীজীর এই নির্দ্দেশের অনুরূপ কাজ করিতে পারিতেছি না। তন্মধ্যে দুইটি প্রধান কারণ উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। প্রথমতঃ, গান্ধীজীর নির্দ্দেশানুসারে নিজমতানুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিলে তাহা পন্থজীর প্রস্তাবের সর্ত্তবিরোধী হইত। কারণ, পন্থজীর প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, আমি যে শুধু গান্ধীজীর ইচ্ছানুসারে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিব তাহাই নয়—আমার নির্ব্বাচিত ওয়ার্কিং কমিটির উপর গান্ধীজীর পূর্ণ আস্থা থাকা চাই। কাজেই এমতাবস্থায় আমি নিজে কর্মপরিষদ গঠন করিলে আপনাদিগকে এই আশ্বাস দিতে পারিতাম না যে আমার নির্বাচিত কর্মপরিষদ গান্ধীজীর বিশ্বাসভাজন হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আমার স্থির বিশ্বাস—আমরা অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে ও ভারতের বহির্দ্দেশে যে সঙ্কটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে চলিয়াছি সে অবস্থায় আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য খুব বেশী সংখ্যক কংগ্রেসকর্মীর সমর্থন পাইতে পারে এইরূপ সর্বদলীয় মন্ত্রীসভা গঠন করা। এবং এইরূপ সর্বদলীয় মন্ত্রীসভা কংগ্রেসের গঠন-প্রকৃতির অনুরূপ হইত।'

'আমি যখন মহাত্মার উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলাম

না। তখন মহাত্মাজীকে পুনরায় অনুরোধ করা ছাড়া আমার অন্য উপায় রহিল না যে, ত্রিপুরীতে তাঁহার উপর যে দায়িত্বভার ন্যস্ত হইয়াছে তিনি যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক সে দায়িত্ব নিজেই বহন করেন এবং পন্থ-প্রস্তাবানুযায়ী নিজেই ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য মনোনীত করেন। আমি তাঁহাকে ইহাও বলিয়াছি যে, তিনি যে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিবেন তাহা মানিয়া লইতে আমি বাধ্য থাকিব, যেহেতু পন্থ-প্রস্তাবকে কার্য্যকরী করাই আমার স্থির সঙ্কল্প। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় মহাত্মাজী কর্মপরিষদ গঠনে তাঁহার চূড়ান্ত অক্ষমতা (utter incompetency) জ্ঞাপন করিয়াছেন।' অতঃপর সুভাষচন্দ্র বলেন যে, তিনি গান্ধীজীর দ্বিতীয় নির্দ্দেশক্রমে পূর্বতন সদস্যদের সহিত ঘরোয়া বৈঠকে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌছিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, কিন্তু সে চেষ্টাও ফলবতী হয় নাই। এমতাবস্থায় অনন্যোপায় হইয়া তিনি পদত্যাগ করিলেন। সুভাষচন্দ্রের শেষ কথাগুলি এই,—"আমি গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্মুখে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার কোনরূপ সমাধান করা যায় কিনা। যতই ভাবিয়াছি এই কথাই আমার মনে হইয়াছে যে বর্ত্তমান অবস্থায় আমার সভাপতিপদে বহাল থাকাই সমস্যা সমাধানের পথে প্রতিবন্ধক হইয়াছে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি হয়ত এমন কর্মপরিষদ গঠন করিতে চাহেন যেখানে সভাপতিপদে আমি অনুপযুক্ত বিবেচিত হইব। আমি ইহাও মনে করি যে, নূতন সভাপতি থাকিলে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পক্ষে এই সমস্যার সমাধান করা অধিকতর সহজ হইবে। কাজেই বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া ও বর্ত্তমান অবস্থায় আমার পদত্যাগ মঙ্গলজনক ও কমিটির কার্য্যের সহায়ক হইবে বিবেচনা করিয়াই আমি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে আপনাদের সমক্ষে আমার পদত্যাগ পত্র উপস্থিত করিলাম।"

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতি পদ ত্যাগ করায় কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ পুরী হইতে তারযোগে তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন—"অত্যন্ত বিরক্তিকর ও উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও তুমি যে ধৈর্য্য ও মর্য্যাদা বোধের পরিচয় দিয়াছ তাহাতে তোমার নেতৃত্বের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উদ্রেক হইয়াছে। আত্মসম্মান রক্ষার জন্য বাঙলাকে এখনও সম্পূর্ণরূপে ধীরতা ও ভদ্রতাবোধ অব্যাহত রাখিতে হইবে। তাহা হইলেই আপাত দৃষ্টিতে যাহা তোমার পরাজয় বলিয়া মনে হইতেছে তাহাই চিরন্তন জয়ে পরিণত হইবে।"

সুভাষচন্দ্র সভাপতির পদ ত্যাগ করিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির প্রবীণতমা সদস্যা সরোজিনী নাইডুকে সভানেত্রীর আসনে বসাইয়া দক্ষিণপন্থীরা লুণ্ঠিতদ্রব্য অশোভন ব্যস্ততার সহিত আত্মসাৎ করিতে লাগিয়া গেলেন! পণ্ডিত জওহরলাল অবশ্য সুভাষচন্দ্রকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন, কিন্তু এই প্রস্তাবের যে কোন ফল হইবে না তাহা একরূপ অবধারিতই ছিল। সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগ পত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত না হইতেই ঐ দিনই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিলেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ কেবল দক্ষিণপন্থীদের লইয়াই ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিলেন। মিঃ এম, এস্ অ্যানি ও মিঃ এম, এন্, রায় Point of Order তুলিতে গেলে তাঁহাদিগকে বক্তৃতা করিবার সুযোগই দেওয়া হইল না।

মহাত্মার ইচ্ছানুসারে ওয়ার্কিং কমিটি মনোনয়ন হইয়াছে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন, পন্থ-প্রস্তাব তাঁহার উপর প্রযোজ্য নহে! নেহাৎ চক্ষুলজ্জাবশতঃ পণ্ডিত জওহরলাল প্রথমে ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যপদ গ্রহণ করিলেন না—নিরপেক্ষ রহিলেন। কয়েকমাস পরেই অবশ্য তিনি ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রবেশ করেন।

ছাব্বিশ

ছাত্রজীবন হইতেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সুভাষচন্দ্র কোন-দিন পশ্চাৎপদ হন নাই। কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ও অসঙ্গত প্রভুত্বস্পৃহা তাঁহার অন্তরের বিদ্রোহীকে আবার ক্ষেপাইয়া তুলিল। কংগ্রেসকে একটি সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সুভাষচন্দ্রের অনেক দিনের লক্ষ্য ছিল। দক্ষিণপন্থীদের বিপ্লববিমুখতা ও আপোষমুখী মনোভাবের দরুণই তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা রক্ষা করা সম্ভব হইল না। কিন্তু পরাজয়ের গ্লানি কোনদিন যাঁহাকে স্পর্শ করে নাই এই আঘাতে হাল ছাড়িয়া দিবার পাত্র তিনি নহেন। সুভাষচন্দ্র এইবার কংগ্রেসের বামপন্থীদল ও কংগ্রেসের বাহিরের অন্যান্য সংগ্রামশীল দলগুলিকে সংঘবদ্ধ করিয়া একটি অখণ্ড বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার কার্য্যে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ছাত্রপ্রতিষ্ঠানগুলি তাঁহার এই সংগ্রামাত্মক নীতি গ্রহণ করিবে ও দেশের সমস্ত গণ-আন্দোলনই তাঁহার সংগ্রামশীল নেতৃত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিবে। সুতরাং, সমস্ত বামপন্থী উপাদানকে সংহত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি দেশবাসীর নিকট আবেদন জানাইলেন। এই হইতেই অগ্রগামী দল "ফরওয়ার্ড ব্লক"-এর উৎপত্তি।

অনেকের ধারণা, ত্রিপুরীতে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সুভাষচন্দ্র 'ফরওয়ার্ড ব্লক'-এর সংগঠনে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু এই ধারণা সত্য নহে। বস্তুতঃ পক্ষে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের একটি প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল সমস্ত প্রগতিপন্থী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ ও সংহত করিয়া ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য চূড়ান্ত সংগ্রাম আরম্ভ করা। তাঁহার রাজনৈতিক কর্মধারায় এই প্রগতি-প্রবণ চিন্তা বহু পূর্বেই বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৯২৭ সালে মান্দালয়

জেল হইতে মুক্তিলাভের পর হইতে তিনি কংগ্রেসের আপোষমূলক ও নরমপন্থী প্রত্যেকটি নীতি ও কার্য্যের বিরোধিতা করেন। মাদ্রাজ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবে সুভাষচন্দ্রের সহিত দক্ষিণপন্থীদের সর্বপ্রথম মতবিরোধ ঘটে। ইহার পরে স্বায়ত্ত-শাসনের ভিত্তিতে রচিত 'নেহরু কমিটি' প্রণীত ভারতবর্ষের গঠনতন্ত্র অনুমোদন করিবার উদ্দেশ্যে লক্ষ্ণৌয়ে যে সর্ব্বদলীয় সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয় সেখানে তিনি কংগ্রেসের এই আপোষমূলক নীতির তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং জওহরলাল ও অন্যান্য বামপন্থী নেতৃবৃন্দের সহায়তায় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে Independence League নাম দিয়া একটি বামপন্থী প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে সক্ষম হন। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে বাৎসরিক অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনে স্বাধীনতা লীগের সভ্যগণ কংগ্রেসের উদ্দেশ্য যাহাতে পূর্ণ স্বাধীনতা বলিয়া ঘোষিত হয় তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এই সময় হইতেই কংগ্রেসের এই বামপন্থী প্রতিষ্ঠানটি পরবর্ত্তী অধিবেশনের জন্য শক্তি সঞ্চয় করিতে ও প্রস্তুত হইতে থাকে এবং তদুদ্দেশ্যে ছাত্র, শ্রমিক, কিষাণ, সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীদের সংঘবদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হয়। ফলে, কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ-স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯৩০ হইতে ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেসের ইতিহাস গভর্ণমেণ্টের সহিত সর্বপ্রকার অসহযোগ ও ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলনের ইতিহাস। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ায় কংগ্রেসের রক্ষণশীল ও প্রগতিপন্থীদলের মধ্যে কোন প্রভেদ রহিল না। কিন্তু, ১৯৩৩ সালে গান্ধীজী কর্ত্তৃক আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের ফলে পুনরায় বামপন্থীদলের প্রয়োজন দেখা দিল। সুভাষচন্দ্র এই সময় স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ভিয়েনায় ছিলেন। গান্ধীজীর কার্য্যের নিন্দা করিয়া পরলোকগত বিঠঁলভাই প্যাটেলের সহিত যুক্তভাবে তিনি এক বিবৃতি প্রচার করেন। ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস

সমাজতন্ত্রীদল গঠিত হয়। এই দলের আদর্শে কংগ্রেসের সংগ্রাম-বিমুখ নীতির পরিবর্ত্তন সূচিত হইতেছে দেখিয়া সুভাষচন্দ্র সমাজ-তন্ত্রী দল গঠনে আনন্দিত হন। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের সমস্ত প্রগতিপন্থী মুক্তিকামী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী উপদানগুলিকে ন্যূনতম সাধারণ কর্ম্মপন্থার ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ করার প্রয়োজন তিনি বিশেষরূপে উপলব্ধি করেন। হরিপুরার পর হইতে তিনি এই বামপন্থীদল গঠনে বিশেষরূপে আত্মনিয়োগ করেন। হরিপুরা ও ত্রিপুরীর মধ্যবর্ত্তী সময়ে তিনি এই কার্য্যে অনেকদূর অগ্রসর হন। সুতরাং 'ফরওয়ার্ড ব্লক'কে কেহ যেন ত্রিপুরীর ঘটনার ফলস্বরূপ মনে না করেন। ইহা আদৌ দক্ষিণ পন্থীদের প্রতি প্রতিহিংসা বা বিদ্বেষভাব প্রসূত নহে। পাঠকদের সন্দেহ নিরসনকল্পে সুভাষচন্দ্রের লিখিত বিবৃতি হইতে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিলাম।

'১৯৩৭ সালের মার্চ্চ মাসে মুক্তিলাভ করিয়া ঐ বৎসরই অক্টোবর মাসে আমি কলিকাতায় ও পর বৎসর ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হরিপুরায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় যোগদান করি। হরিপুরায় আমি লক্ষ্য করিলাম, বামপন্থীরা পূর্ববৎসর অপেক্ষা শক্তিশালী না হইয়া শক্তিহীন হইয়াছে। হরিপুরার পরে বিভিন্ন মনোভাবসম্পন্ন ও বিভিন্ন মতবাদের বামপন্থীদের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে আমি এই কথা উল্লেখ করি যে, বামপন্থীদের অনুসৃত নীতি ও কর্মপন্থায় নিশ্চয়ই এমন কোন ত্রুটি বা অভাব রহিয়াছে যাহার জন্য তাহাদের এই পতন ঘটিয়াছে।

এই সময়কার কংগ্রেস সংগঠনে কয়েকটি প্রধান প্রধান পার্টি বা গ্রুপ্ লক্ষ্য করা যায়। প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ পরিচালিত সরকারী কংগ্রেস (official block)। বামপন্থীদের আবার তিনটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও সুনির্দ্দিষ্ট দল রহিয়াছে—এই তিনটি দলের অনুবর্ত্তীদের সংখ্যাও বিভিন্ন। ইহারা কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট,

চরম বামপন্থী ও রায়পন্থী। এই দলগুলির মধ্যে আবার অসংগঠিত আমূল-পরিবর্ত্তন-পন্থী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী উপাদান রহিয়াছে। ইহারা সংখ্যায় বহু ; কিন্তু, ইহারা যে কারণেই হউক উল্লিখিত বামপন্থী দলগুলির কোনটিতেই যোগদান করে নাই। আমার মনে হইয়াছিল যে, যতদিন এই "আমূল পরিবর্ত্তনবাদী" উপাদানগুলি একটি নির্দ্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সংঘবদ্ধ না হইবে ততদিন বামপন্থী আন্দোলন যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিবে না। সুতরাং, এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ন্যূনতম কর্মপন্থার ভিত্তিতে একটি নূতন বামপক্ষ দল গঠন করা হইবে এবং ইহা 'Leftist Bloc' নামেই অভিহিত হইবে। বর্ত্তমান সময়ে যে সব পার্টির অস্তিত্ব রহিয়াছে তাহারা ইহাতে যোগদান করিতে পারিবে এবং বিক্ষিপ্ত ও অসংবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী উপাদানগুলিকেও ইহাতে যোগদান করিতে আহ্বান করা হইবে। আমার এই পরিকল্পনা বর্ত্তমান বামপন্থী দলগুলি প্রথম প্রথম খুবই উৎসাহের সহিত গ্রহণ করে এবং মনে হইয়াছিল যেন অচিরেই তাহারা নূতন পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবে। ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে বৈঠক হয় সেখানে এই দিকে আরও একটু অগ্রসর হওয়া গিয়াছিল। এই বৈঠকে জনৈক চরম-বামপন্থী নেতা এই উদ্দেশ্যে একটি ইস্তাহারের খসড়া প্রস্তুত করেন। এই বিজ্ঞপ্তিটি কংগ্রেসের মধ্যে যাঁহারা বামপন্থী চিন্তাধারার পোষকতা করেন তাঁহাদের মতামত জানিবার জন্য প্রচার করা হয়।

তৎপরে সোশ্যালিষ্টদের মধ্যে মতের পরিবর্ত্তন দেখা দেয় ; এমনকি কয়েকজন প্রভাবশালী কংগ্রেসী সমাজতন্ত্রী নেতা প্রকাশ্যেই এইরূপ একটি বামপন্থী ব্লক গঠনের বিরুদ্ধে মত প্রচার করেন। তাঁহাদের এই মত পরিবর্ত্তনের ফলে অপর কোন বামপন্থী দল উক্ত পরিকল্পনাকে কার্য্যে রূপ দিতে পারে নাই। অবশ্য বামপন্থী ব্লক গঠনের এই পরিকল্পনা

তখনও একেবারে পরিত্যাগ করা হয় নাই এবং কতিপয় প্রসিদ্ধ কংগ্রেস-কর্মী এই দিকে তাঁহাদের চেষ্টা চালাইতে থাকেন। ১৯৩৯ সালের ২৯শে জানুয়ারী কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচনের পরে ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে কলিকাতায় আমূলপরিবর্ত্তনপন্থী ও বামপন্থী কংগ্রেসকর্মীদের এক ঘরোয়া বৈঠক হয়। বামপন্থী দল গঠনের প্রশ্ন পুনরায় নূতন করিয়া আলোচিত হয়, কিন্তু, এবারেও কয়েকজন প্রসিদ্ধ সমাজতন্ত্রী নেতা এরূপ নিরুৎসাহ করেন যে, বোধ হইয়াছিল যেন ব্লক গঠনের কোন চেষ্টাই ফলবতী হইবে না।

কিন্তু তাহাতেও উদ্যোক্তারা দমিত হন নাই। ১৯৩৯ সালে এই উদ্দেশ্যেই ত্রিপুরীতে আর একটি ঘরোয়া বৈঠক হয়। যেহেতু কয়েকজন বিখ্যাত সমাজতন্ত্রী নেতা ইহার সহিত যুক্ত হইতে চাহেন নাই, কাজেই স্থির হয় যে, 'Left Bloc' নাম পরিবর্ত্তন করিয়া অপর একটি নামকরণ হইবে। কি কি কর্মপন্থা অনুসৃত হইবে ঘরোয়াভাবে তাহারও একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয় ও গৃহীত হয়। অতঃপর স্থির হয় যে পরবর্ত্তী নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। যদিও প্রথম হইতেই আমি এই পরিকল্পনার পক্ষে ছিলাম তথাপি এই সময়ে আমার নিকট মনে হইয়াছিল যেন আমি নিজে ইহার সহিত যুক্ত না থাকিলেই উৎকৃষ্টরূপে দেশ সেবার কাজ করিতে পারিব। অবশ্য, সে ক্ষেত্রেও ইহার প্রতি আমার বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। পরিকল্পিত 'Left Bloc' এর উদ্যোক্তারা সকলেই আমার সহিত একমত হইলেন।

অবশেষে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত এক ঘরোয়া বৈঠকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সমস্ত আমূল-পরিবর্ত্তন-পন্থী ও প্রগতি-প্রবণ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী উপাদানগুলিকে ন্যূনতম কর্মপন্থার ভিত্তিতে সংহত ও সংঘবদ্ধ করিতে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। এই ন্যূনতম

কর্মপন্থা বিভিন্ন মতবাদসম্পন্ন বামপন্থী দলগুলির মধ্যে যথাসম্ভব অধিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করিবে।

ইহাও স্থির হয়, এই দলের 'Forward Bloc' এই নূতন নামকরণ হইবে। পূর্বতন 'Left Bloc' এর স্থলে এই 'Forward Bloc' কোন একটি বিশেষ পার্টি বা দল হইবে না; পক্ষান্তরে, যাহারাই এই ব্লকের কর্মপন্থা গ্রহণ করিবেন ইহা তাহাদের সকলেরই সংযোগস্থল হইবে। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমানে কংগ্রেসের বামপক্ষে যে সমস্ত অসংবদ্ধ ও বিশৃঙ্খল আমূল-পরিবর্ত্তন-পন্থী দলের অস্তিত্ব রহিয়াছে তাহাদের এই ব্লকে যোগদানের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। বস্তুতঃপক্ষে, তাহারা সাদরে অভ্যর্থিত হইবে। এইরূপ আশা হয়, কালক্রমে এই ব্লক কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত আমূল-পরিবর্ত্তন-পন্থী ও সমাজতন্ত্রী উপদানগুলিকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করিতে সক্ষম হইবে।'

জাতীয় আন্দোলনের ক্রমবিকাশ ও অন্তর্প্রেরণায় কংগ্রেসের বিবর্ত্তনের ফলে ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই 'ফরওয়ার্ড ব্লক'-এর উৎপত্তি হইয়াছে। ব্লকের গঠনতন্ত্র ও কার্য্যক্রম হইতে আমরা জানিতে পারিব যে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' কংগ্রেসের সহিত একই আদর্শনিষ্ঠ কংগ্রেসেরই অন্তর্গত একটি প্রতিষ্ঠান; এবং কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত বামপন্থী উপাদান ও দলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া একটি অখণ্ড ঐক্য স্থাপনই ইহার উদ্দেশ্য। 'ফরওয়ার্ড ব্লক' কংগ্রেস-বিরোধী দল নহে। কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা-কামী সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দলগুলির মিলন ক্ষেত্র; অতএব, কংগ্রেসের অন্তর্ভূত কি বহির্ভূত অপরাপর সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রতিষ্ঠানের সহিত কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সহযোগিতা থাকা বাঞ্ছনীয়। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও স্বাধীনতা-যুদ্ধে ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাহাদের আদর্শগত কোন পার্থক্য নাই।

নিম্নোক্ত বিবৃতির দ্বারা সুভাষচন্দ্র নিজেই বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তিগুলি খণ্ডন করিয়া 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠনের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন—

'কংগ্রেসের official (সরকারী) bloc এর সাংগঠনিক ভিত্তি 'গান্ধী-সেবা-সংঘ'। এক্ষণে, বামপন্থীদের ভিত্তি কি? এখনও কোন ভিত্তি নাই বটে, তবে আশা করা যাইতেছে, 'ফরওয়ার্ড ব্লক' পূর্ণ সমৃদ্ধি লাভ করিয়া সমস্ত সরকারী কংগ্রেস বহির্ভূত (non-official) রেডিক্যাল ও সমাজতন্ত্রী উপাদান সমূহের সাংগঠনিক বনিয়াদের কাজ করিবে। কেবল তখনই কংগ্রেসের বামপক্ষ স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা প্রাপ্ত হইবে।

আমাদের সমালোচকেরা যুক্তি দেখাইতে পারেন—'ফরওয়ার্ড ব্লক'-এর গঠন কংগ্রেসের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করিয়া জাতীয় ঐক্য নষ্ট করিবে। জিজ্ঞাসা করি, 'গান্ধী-সেবা-সংঘ' গঠনে যদি বিচ্ছেদ সৃষ্টি না হইয়া থাকে তবে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠনেই বা তা হইবে কেন? বামপক্ষের এই সংহতিই আমার মতে প্রকৃত জাতীয় ঐক্যসৃষ্টির সোপান হইবে; এবং, এই ঐক্য কার্য্যক্ষেত্র ও বাস্তবক্ষেত্রের সক্রিয় ঐক্য—নিষ্ক্রিয় ঐক্য নহে। বামপক্ষের সংহতি ভিন্ন প্রকৃত জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার আমি ত আর কোন পথ দেখি না।

'ফরওয়ার্ড ব্লক' কংগ্রেসের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে কাজ করিবে। ইহা কংগ্রেসের বর্ত্তমান গঠনতন্ত্র, মতবাদ, নীতি ও কর্মপন্থা গ্রহণ করিবে। এই প্রতিষ্ঠান মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্বের প্রতি সর্ব্বোচ্চ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে এবং জাতির নিকট মহাত্মার দান তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদ অহিংস অসহযোগ নীতিতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিবে। কিন্তু, ইহার দ্বারা এই বুঝাইতেছে না যে, 'ফরওয়ার্ড ব্লক'-এর বর্ত্তমান কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের প্রতিও আস্থা থাকিবে। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বর্ত্তমান সঙ্কটকালে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' সৃষ্টি করিয়া কেন আমরা কংগ্রেসের

অভ্যন্তরে গোলযোগ সৃষ্টি করিতেছি। ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা, যেহেতু বর্ত্তমান কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ড ভিন্নমতাবলম্বী কংগ্রেস কর্মীদের প্রতি আপোষহীন মনোভাবের পরিচয় দিতেছেন এবং তাঁহারা যুগোপযোগী কর্মপন্থা অনুসরণ করিতে পারিতেছেন না তাহাতে আজ হউক কাল হউক এইরূপ আভ্যন্তরিক বিভেদ ও গোলযোগ অনিবার্য্য। উচ্চমণ্ডলের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিলে আজিকার এই গোলযোগ ও বিচ্ছেদ এড়ানো যায়, কিন্তু আত্মসমর্পণ করিয়া এই অবশ্যম্ভাবী ভেদসৃষ্টি স্থগিত রাখিলে আমাদের কি উপকার হইবে? যে অকল্যাণ একদিন আসিবেই তাহাকে কেবল আজিকার মত সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিয়া কি হইবে? আমরা অতি শীঘ্র বহির্জাগতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইতেছি। বহির্জাগতিক সঙ্কট দেখা দিলে সে সময়ে অন্তর্বিরোধ নিরতিশয় ক্ষতিকর হইত। তাহার চেয়ে ইহাই বরং সমধিক বাঞ্ছনীয় যে, আমরা অন্তর্গোলযোগের সম্মুখীন হইয়া বহির্জাগতিক সঙ্কট আসিবার পূর্বেই এই গোলযোগ কাটাইয়া উঠিব ও পূর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হইব।

যদি বলি রাজনৈতিক অগ্রগতির পক্ষে কোন কোন সময় বিচ্ছেদের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে কিছু মারাত্মক ভুল করা হইবে না। ১৯১৮ সালে নরমপন্থীদের বিচ্ছেদ, ১৯২০ সালে অসহযোগের বিরুদ্ধবাদীদের বিচ্ছেদ কেবল অবিমিশ্র অকল্যাণই ডাকিয়া আনে নাই। পক্ষান্তরে, ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতির পক্ষে উহা অবশ্যম্ভাবী ও প্রয়োজন ছিল। বৈদেশিক ইতিহাসেও এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না। ১৯০৩ সালে রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির বিচ্ছেদ না হইলে বলশেভিক পার্টির উদ্ভব ও সমৃদ্ধিলাভ কখনই হইত না। অতএব, আমি আমার দেশবাসীকে অনুরোধ করিব, 'ফরওয়ার্ড ব্লক' যে বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য দায়ী হইতে পারে তাহার সম্বন্ধে তাঁহারা যেন অগভীরভাবে চিন্তা না করেন।

১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসে স্বরাজ্যদলের বিদ্রোহ কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে কিছু সময়ের জন্য ভ্রান্ত-ধারণা, বিরোধ এমনকি তিক্ততার সৃষ্টি করিয়াছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেস স্বরাজ্যদলের কর্মপন্থা গ্রহণ করিয়া নূতন পরিস্থিতির সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিতে বাধ্য হয়। বর্ত্তমান-ক্ষেত্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইতে পারে। ইহা যেন কেহ বিস্মৃত না হন যে কংগ্রেসের আভ্যন্তরিক ঐক্য বজায় রাখিতে দক্ষিণ পক্ষের চেয়ে বামপক্ষ কম উদ্‌গ্রীব। এই কারণেই বামপক্ষ সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীসভা গঠনের পক্ষপাতী। অপরপক্ষে, দক্ষিণপক্ষ একদলীয় মন্ত্রীসভা গঠন করিতে আগ্রহান্বিত। ফলতঃ, বামপক্ষ কংগ্রেসের মধ্যে স্থায়ী ও খাঁটি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্যই কাজ করিতে থাকিবে। এই সঙ্কট সময়ে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনের এই উদ্যম ও চেষ্টা অনিবার্য্য কারণে ও দক্ষিণপন্থীদের অনমনীয় মনোভাবের দরুণই অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে।'

গত ২৫ বৎসরের কংগ্রেসের ইতিহাস আলোচনা করিলে কংগ্রেসের মধ্যে বিভিন্ন দলের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইবে। 'অহিংস অসহযোগ' গ্রহণের পর হইতে কংগ্রেস কর্মিগণ বহুদিন পর্য্যন্ত স্বরাজ্যদল ও 'নো-চেঞ্জার' দলে বিভক্ত ছিল। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই সময়ে "কংগ্রেস ন্যাশনালিষ্ট" নামে অপর একটি দলেরও অস্তিত্ব ছিল—বাঙলায় এই দলটি একসময়ে বেশ শক্তি-শালী হইয়া উঠিয়াছিল। কিষাণ সভার অনেক সদস্যই কংগ্রেসকর্মী ও কংগ্রেসের সভ্যশ্রেণীভুক্ত—শ্রমিকদলের মধ্যে কংগ্রেস সদস্যের সংখ্যা কম নহে। গান্ধী-সেবা-সংঘের সভ্যরা কংগ্রেসের কার্য্যকলাপের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন এবং দক্ষিণপন্থীদের সহিত যুক্ত হইয়া রাষ্ট্রনীতিক আলোচনার অংশ গ্রহণ করিতেন। কাজেই দেখা যাইতেছে, কংগ্রেসের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেসকর্মিগণ একাধিক দলের সহিত যুক্ত ছিলেন ও এখনও আছেন। এই দিক হইতে বিচার

করিলে 'ফরওয়ার্ড ব্লক'-এর সৃষ্টির মধ্যে কোনই নূতনত্ব নাই—কংগ্রেসের অভ্যন্তরে স্বতন্ত্র দল গঠন কংগ্রেসের ইতিহাসে এই প্রথম বা অভূতপূর্ব ও নহে। এই কারণেই 'ফরওয়ার্ড ব্লক'-এর কর্মপদ্ধতির সহিত মতবিরোধ থাকিলেও দক্ষিণপন্থীরা ব্লকগঠনে যুক্তিসঙ্গতভাবে কোনরূপ বাঁধা দিতে পারেন নাই। একই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে ভিন্নধর্মী লোকের একত্র সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার নজিরও কংগ্রেসে মিলিবে। ত্রিপুরী কংগ্রেসে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলকে মতবৈষম্য সত্ত্বেও দক্ষিপন্থীদলের সহিত সহযোগিতা করিতে দেখা গিয়াছে। অতএব, সুভাষচন্দ্র ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনের দ্বারা কংগ্রেসের আনুপূর্বিক ইতিহাসের ধারা ও নিয়মশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে কোন কাজ করেন নাই।

'ফরওয়ার্ড ব্লক' কেন?

লেখক: শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বলিতে এমন একটি আন্দোলন বুঝায় ভারতের মাটিতেই যাহার উদ্ভব। ইহা ভারতের জনগণের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রচেষ্টা ও আদর্শের প্রতীক। এই প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধি ও বিস্তারের অফুরন্ত সম্ভাবনা ইহার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। অন্যান্য বাহ্যিক কারণ বর্তমান থাকিলেও প্রধানতঃ অন্তপ্রেরনার ফলেই ইহার ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে। এই অন্তপ্রেরণা হইতেই 'ফরওয়ার্ড ব্লক'-এর জন্ম। কোন ব্যক্তিগত বা আকস্মিক কারণ দ্বারা ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এই অভিনব ঘটনার উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না। ক্রমবিকাশের পথে কংগ্রেসের আন্দোলন এক নব পর্য্যায়ে উত্তীর্ণ হইবে বলিয়াই 'ফরওয়ার্ড ব্লক'-এর সৃষ্টি হইয়াছে।

২। কংগ্রেসের এই বিবর্ত্তন কিভাবে ঘটে? ইহার মূলে কোন নিয়ম কাজ করিতেছে? ইহার ব্যাখ্যায় অনেক মতবাদের অবতারণা করা যায়, কিন্তু আমার নিকট হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন ও বস্তুনিষ্ঠ বলিয়া মনে হয়।

প্রগতির পথ সরল রৈখিক নয়, ইহার প্রকৃতিও সর্ব্বদা শান্তিপূর্ণ থাকে না। অনেক সময় বিরোধের মধ্য দিয়াই প্রগতির সম্ভব হয়।

৩। সঙ্গতি (Thesis) ও অসঙ্গতি (Antithesis)র দ্বন্দ্ব হইতেই সমন্বয়ের (Synthesis) জন্ম হয়। বিবর্ত্তনের নবপর্যায়ে এই সমন্বয়ই আবার 'সঙ্গতি' রূপে দেখা দেয়। এই 'সঙ্গতি' পুনরায় 'অসঙ্গতি'র সৃষ্টি করে—এবং উভয়ের দ্বন্দ্বের ফলে পুনরায় "সমন্বয়" ঘটে। প্রগতির চক্র এইরূপেই আবর্ত্তিত হইয়া চলিতে থাকে।

৪। যাহারা সময়ে অসময়ে ঐক্যের কথা বলে, এবং সর্ব অবস্থায়ই ও যে কোন মূল্যে ঐক্য বজায় রাখিবার জন্য আবেদন করে, তাহারা বিবর্ত্তনের এই মূল সূত্রেই বিস্মৃত হয়। প্রকৃত ঐক্য ও মিথ্যা ঐক্য—সক্রিয়তার ঐক্য ও নিষ্ক্রিয়তার ঐক্য—যে ঐক্যের ফল প্রগতি ও যে ঐক্যের ফল নিশ্চেষ্টতা—ইহাদের প্রভেদ বিচার করিতে হইবে। যাহারা চলার বেগ হারাইয়াছে, বৈপ্লবিক প্রেরণা যাহাদের নাই, সর্বাবস্থায় ও যে কোন মূল্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার সহজ বুলি আজিকার দিনে তাহাদেরই মুখে শোভা পায়। এইরূপ ঐক্যের মোহে পড়িয়া আমরা পথভ্রষ্ট হইব না।

৫। প্রত্যেক জীবন্ত ও গতিশীল আন্দোলনের মধ্যে বামপন্থী চিন্তাধারা গুপ্ত আছে—ইহাকে গুপ্ত "অসঙ্গতি"ও বলিতে পারি। সময় পূর্ণ হইলে, এই গুপ্ত বামপক্ষ আত্মপ্রকাশ করে ও ইহার মধ্য দিয়াই ক্রমবিকাশের ধারা চলিতে থাকে। কোন বিশেষ অবস্থায় বামপক্ষ কীরূপে সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ কর্মপন্থা অনুসরণ করিবে, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে রাজনৈতিক ও কখন কখনও দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন। সময়

সময় এমনও হয় যে, দক্ষিণ পক্ষের সহিত আপোষ ও সহযোগিতা সহায়েই বামপক্ষ শক্তিসংগ্রহ ও প্রভাব বিস্তার করে। আবার বিভিন্ন প্রকার অবস্থায় এইরূপ সম্ভব নাও হইতে পারে। তখন, দক্ষিণ-পক্ষের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া ও প্রসার ও প্রতিপত্তিলাভে তৎপর হওয়াই বামপন্থী দলের কর্ত্তব্য। এইরূপ অবস্থায়, বেদনাদায়ক হইলেও সুস্পষ্ট বিরোধ বস্তুতঃপক্ষে প্রগতির সহায়ক ও অপরিহার্য্যও বটে। সাংগঠনিক বিকাশের ফলে একটি বামপক্ষের আবির্ভাব ও বৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়মেই অনিবার্য হইয়া উঠে। সহযোগিতার সহায়েই অথবা সংঘর্ষের ভিতর দিয়াই হউক বামপক্ষ বিকাশলাভ করিতে করিতে অবশেষে সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিকে অধিকার করিয়া লয় অথবা দক্ষিণপন্থীদিগকে নিজের দলে টানিয়া আনে। এই সাফল্য লাভের পরে বামপন্থীদের (অধুনা সংখ্যা-গরিষ্ঠ দল) বিকাশের সম্ভাবনা নিঃশেষ হইয়া গেলে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে, এবং নূতন বামপক্ষ জন্মলাভ করিয়া কালক্রমে প্রাক্তন বামপন্থীদের বিতাড়িত করে।

১৯২০ সালের গান্ধীপন্থীদল কংগ্রেসে বামপন্থী থাকিলেও বর্ত্তমানে আর তাহারা বামপন্থী নয়। প্রায়ই দেখা যায়, গতকল্যকার বামপন্থীরা আগামীকল্যের দক্ষিণপন্থীতে পরিবর্ত্তিত হয়।

আজিকার কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণ ও বামপক্ষের কোন প্রভেদ রাখা উচিত নয়, বর্ত্তমানে সমগ্র কংগ্রেসই একটি বামপন্থী প্রতিষ্ঠান—এই ধরণের কথা বলা চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা। এমন একটি সন্ধিক্ষণে আমরা উপস্থিত যখন অপ্রীতিকর হইলেও আমাদিগকে বাস্তব সত্যের সম্মুখীন হইতে হইবে।

৬। ১৯৩৩ ও ১৯৩৮ সালের মধ্যে কংগ্রেসের বামপন্থীদল দক্ষিণ-পন্থীদের সহিত সহযোগিতা রক্ষা করিয়া বিকাশলাভ করিয়াছে। ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দক্ষিণপন্থীদের তরফ হইতে এই চীৎকার উঠিল যে,

আর বামপন্থীদের সহিত সহযোগিতা সম্ভব নয়—বামপন্থীরা বড়ই অশান্তি ও বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে।

৭। পরিশেষে ১৯৩৯ সালে এই অভিযোগ চরম পরিণতি লাভ করিল—দক্ষিণপন্থীদল ইচ্ছা করিয়াই বামপন্থীদের সহিত সহযোগিতা লোপ করিতে সিদ্ধান্ত করিলেন।

একমতাবলম্বী মন্ত্রণা পরিষদ বা ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের জন্য বর্ত্তমানে দক্ষিণপন্থীদের এই জেদের গভীরতর তাৎপর্য ত ইহাই। তিন বৎসর যাবৎ তাহারা বামপন্থীদের সহিত একযোগে কাজ করিতে পারিল, কিন্তু আর তাহারা এইরূপ করিতে পারিবে না কেন? কারণ এই যে, কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধি দক্ষিণপন্থীরা নিরুদ্বেগে আর সহ্য করিতে পারিতেছে না।

যখন নূতন মন্ত্রণা-পরিষদ বা ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের এই সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৩৯ সালের ২৯ শে এপ্রিল কলিকাতায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বৈঠক বসিল, তখন দেখা গেল যে, দক্ষিণপন্থীদের সহিত সহযোগিতাকামী বামপন্থীদল বিভিন্ন মতাবলম্বী বা মিশ্র ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে আগ্রহশীল। কিন্তু দক্ষিণপন্থীদল বামপন্থীদের সহিত সহযোগিতা রক্ষা করিতে চাহিল না—একমতাবলম্বী ওয়ার্কিং কমিটি গঠনই তাহাদের একমাত্র শ্লোগান হইয়া উঠিল। ফলে. দক্ষিণপন্থীরাই আপোষ, সহযোগিতা ও ঐক্যের মূলোৎপাটন করিল।

বামপন্থীদের পূর্ণ আত্মসমর্পণ—ইহাই বর্ত্তমানে দক্ষিণীদের কামনা। ঐক্যের খাতিরে কি বামপক্ষ ইহাতে সম্মত হইবে? দক্ষিণীদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে ইহার ফলাফল কি হইবে? ইহাতে কি প্রগতি দ্রুতায়িত হইবে, না প্রতিক্রিয়াশীল দলেরই শক্তিবৃদ্ধি হইবে?

দক্ষিণপন্থিগণ বামপন্থীদের সহিত সহযোগিতা স্থাপনে অস্বীকৃত; তবুও ঐক্যপ্রতিষ্ঠার খাতিরে আমরা বামপন্থী দল তাহাদের নিকট আত্ম-

সমর্পন করিতে পারিতাম যদি দক্ষিণপন্থীদল এখনও সংগ্রামশীল ও প্রগতিমুখী কর্মপন্থা গ্রহণ করিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় গত মার্চ ও এপ্রিল মাসে মহাত্মা গান্ধীর সহিত আমার যে পত্রালাপ হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, আসন্ন সংগ্রামের দিক হইতে গান্ধীজী এখন আর চিন্তা করিতেছেন না। কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ ও তাহাদের চালক কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষেরও সংগ্রাম আরম্ভ করিবার কোন অভিপ্রায় নাই। এই অবস্থায় দক্ষিণপন্থীদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া ঐক্যের ঠাট বজায় রাখার অর্থ কংগ্রেসে প্রতিক্রিয়াশীলতা ও নিষ্ক্রিয়তাকেই চিরস্থায়ী করা। আমরা এইরূপ করিতে পারি না— আমাদের এইরূপ করা উচিত নয়।

অতএব, বর্ত্তমানে বামপক্ষের প্রথম কর্ত্তব্য দক্ষিণপক্ষের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া। এই কার্য্য সম্পন্ন হইলে, বামপন্থীদল কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া কংগ্রেসের নামে স্বাধীনতা-সংগ্রাম সুরু করিতে পারিবে। ইহাই আজিকার দিনে বামপন্থীদের একমাত্র কর্ত্তব্য। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই 'ফরওয়ার্ড ব্লক'-এর আবির্ভাব।

বর্ত্তমান বামপন্থী দলগুলির উচিত ছিল—তাহাদের মধ্যে সংহতি স্থাপনের এই ব্রত গ্রহণ করা। কিন্তু যে কারণেই হউক তাহারা এই কর্ত্তব্যসাধনে অগ্রসর হয় নাই। গত বৎসর বামপন্থী কংগ্রেস-কর্ম্মিগণ বামপন্থী ব্লক গঠনের প্রস্তাব আলোচনা করেন—তখন মনে হইয়াছিল, বামপন্থী দলসমূহ এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু পরে, তাহাদের মত পরিবর্ত্তন হয়। তাই বামপন্থী দলসমূহের অভ্যন্তরস্থিত নবীন কর্মীদের সহায়তায় 'ফরওয়ার্ড ব্লক' প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অপরিহার্য হইয়া পড়িল। কাজেই, 'ফরওয়ার্ড ব্লক'-এর আবির্ভাবের মূলে কেবলমাত্র কংগ্রেসের

অভ্যন্তরস্থ অন্তঃপ্রেরণাই নয়, ঐতিহাসিক প্রয়োজনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। অধিকন্তু, বর্ত্তমান সময়ের ঘটনাসমূহ ইহার উৎপত্তির উপযোগিতা প্রতিপন্ন করিতেছে। এই প্রকারে ও এই অবস্থার মধ্যে যাহার জন্ম, সেই 'ফরওয়ার্ড ব্লক-এর মৃত্যু নাই। আমাদের রাজনৈতিক বিবর্ত্তনের ক্ষেত্রে ইহা একটি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা।

স্থায়িত্বের অক্ষয় পাথেয় লইয়া এই প্রতিষ্ঠান কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে—কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা ক্রমবর্দ্ধমান ব্যাপ্তি ও শক্তিলাভ করিয়াই চলিবে। আমার এই উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে যাঁহারা সন্দেহ পোষণ করেন, তাঁহারা ধৈর্য্য সহকারে কংগ্রেস ও 'ফরওয়ার্ড ব্লক'-এর অনাগত কালের ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিতে থাকুন।

("ফরওয়ার্ড ব্লক"—৫।৮।৩৯)

ইংরাজী হইতে অনূদিত।

'ফরওয়ার্ড ব্লক'-এর গঠন-তন্ত্র

নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের বোম্বাই সম্মেলনে নিম্নোক্ত গঠনতন্ত্র গৃহীত হয়।

গঠনতন্ত্রের বিধান :—

(১) এই প্রতিষ্ঠান "ফরওয়ার্ড ব্লক" নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই ব্লক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেরই অন্তর্গত একটি প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেসের অন্তর্গত সমস্ত বামপন্থী দলের সাধারণ মিলন স্থল হিসাবে এই ব্লক কাজ করিবে।

(৩) 'ফরওয়ার্ড ব্লক' ও ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির লক্ষ্য অভিন্ন —অর্থাৎ, সর্বপ্রকার বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ।

(৪) কংগ্রেসের যে সকল প্রাথমিক সভ্য ব্লকের কর্মপন্থায় বিশ্বাসী, তাহারা সকলেই ইহার সভ্য হইতে পারে।

(৫) নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির (এ. আই. সি. সি.) যে সকল সদস্য ব্লকের কর্মপন্থায় আস্থাবান তাহাদের নিয়াই ব্লকের নিখিল ভারত পরিষদ গঠিত হইবে। পরিষদের সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের অনধিক অতিরিক্ত সদস্য নির্বাচনের অধিকার এই সদস্যদের থাকিবে।

(৬) ব্লকের কর্মপন্থায় বিশ্বাসী কংগ্রেসের প্রাদেশিক, জেলা ও অন্যান্য অধীন কমিটিগুলির সভ্যদের লইয়া ব্লকের প্রাদেশিক, জেলা ও অন্যান্য অধীন পরিষদগুলি যথাক্রমে গঠিত হইবে।

(৭) একজন সভাপতি, দুইজন সহ-সভাপতি, একজন সাধারণ সম্পাদক, চারজন সম্পাদক ও একজন কোষাধ্যক্ষ (এই কয়জন কর্মকর্তা) নিখিল ভারত পরিষৎ কর্তৃক নির্বাচিত হইবে।

(৮) নিখিল ভারত পরিষৎ ব্যতীত অন্যান্য পরিষদগুলি ব্লকের কার্য্যকরী সমিতি হিসাবে কাজ করিতে পারে অথবা পরিষদগুলির সদস্যদের মধ্য হইতে নির্বাচিত ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে পারে।

(৯) কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থ যে সকল বামপন্থী দল বর্ত্তমানে ব্লকে যোগদান করে নাই—তাহাদের সহিত ব্লকের সমন্বয় সাধনকল্পে নিখিল ভারত পরিষদ যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত বামপন্থী উপাদান ও দলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া একটি অখণ্ড ঐক্য স্থাপনই এইরূপ সমন্বয় সাধনের লক্ষ্য থাকিবে।

(১০) ব্লকের প্রাথমিক সদস্যের রেজিষ্টার বহি প্রদেশ কর্ত্তৃক নিযুক্ত সাব-কমিটি দ্বারা পরীক্ষিত হইবে। সভ্য-তালিকার সংশোধন করা ও তালিকা হইতে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের বাদ দেওয়ার অধিকার এই সাব-কমিটির থাকিবে। সাব-কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নিখিল ভারত কমিটির নিকট আপীল চলিবে।

১। **ব্লকের কার্য্যক্রম**—প্রত্যেক ভারতবাসীর নিজ নিজ ধর্মসম্মত উপাসনা করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু রাজনীতিতে ও রাজনৈতিক সমস্যাসমূহ কেবলমাত্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই আলোচিত হইবে।

২। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তনের পর হইতে প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা উৎকটরূপে বিস্তারলাভ করিতেছে। ইহাদের উচ্ছেদ সাধনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে।

৩। কংগ্রেস শাসনযন্ত্র অধিকার করিবার ফলে অথবা আইনসভায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ফলে কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে বর্ত্তমানে কোন প্রকার দুর্নীতি দেখা দিয়া থাকিলে তাহার মূলোৎপাটন করিতে হইবে।

(৪) সর্বপ্রকার কায়েমী স্বার্থের প্রভাব তথা কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার প্রাধান্য বিস্তার হইতে কংগ্রেসকে মুক্ত রাখিতে হইবে। বর্ত্তমান এক-কর্ত্তৃত্বের প্রভাবের পরিবর্ত্তে কংগ্রেসে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশে কংগ্রেসের আমূল সংস্কার সাধন করিয়া ইহাকে একটি সক্রিয় প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করিতে হইবে।

(৫) আমূল পরিবর্ত্তনকামী বৈপ্লবিক মনোভাব নিয়া কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারি কার্য্যক্রম অধিকতর উদ্যমের সহিত বাস্তবে পরিণত করিতে হইবে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের রক্ষণাধীনে নয়—কংগ্রেসেরই রক্ষণাধীনে কংগ্রেস-মন্ত্রিসভা কাজ করিবে। প্রতিদ্বন্দ্বী গভর্ণমেণ্ট স্থাপনের উদ্দেশ্য লইয়াই সমগ্র দেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ও কংগ্রেসী প্রতিষ্ঠানগুলি কাজ করিয়া যাইবে।

(৬) অর্থনৈতিক মুক্তিলাভের জন্য কৃষক ও শ্রমিকদের সংগ্রাম সক্রিয়ভাবে সমর্থন করা হইবে।

(৭) কিষাণ সভা, ট্রেড ইউনিয়ন, ইয়ুথ লীগ, ছাত্র ফেডারেশন প্রভৃতি অপরাপর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সঙ্ঘগুলি ও কংগ্রেসের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে।

(৮) সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়িয়া তুলিতে হইবে।

(৯) দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট ও ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের সঙ্ঘগুলিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণতি দানকল্পে দেশীয় রাজ্যে প্রজাদের সঙ্ঘসমূহ ও কংগ্রেসের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও সহযোগিতা গড়িয়া তুলিতে হইবে। সমগ্র দেশে দেশীয় রাজ্য প্রজা আন্দোলনের পরিচালনা ও সহায়তার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা করিতে হইবে।

(১০) ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আপোষহীন শত্রুতাসাধন করিতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট উক্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ভারতীয় জনগণের উপর চাপাইবার চেষ্টা করিলে সর্বপ্রকার বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংগ্রাম পরিচালনা করিতে হইবে।

(১১) গ্রেট ব্রিটেন কর্তৃক ভারতবর্ষ কোন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে জড়িত হইয়া না পড়ে ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ভারতের ধনবল ও জনবলের শোষণ হইতে না পারে তদুদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে।

(১২) পুনরায় ব্রিটিশ দ্রব্য ও বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন আন্দোলন তীব্রতর করিয়া তুলিতে হইবে। কেবলমাত্র ভারতের স্বদেশীশিল্প ও তাহাতে নিযুক্ত শ্রমিকদের সহায়তার জন্য নহে, পরন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর প্রচেষ্টা ব্যাহত করিবার জন্যও ব্রিটিশ পণ্য ও বিদেশী বস্ত্র বর্জন আন্দোলন প্রয়োজন।

(১৩) সমস্ত রাজনৈতিক কর্মীদের যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১৪) পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম শীঘ্র আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্যে দেশীয় পণ্য প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা এখন হইতেই করিতে হইবে।

(১৫) জাতীয় পুনর্গঠনক্ষেত্রে ফরওয়ার্ড ব্লক পরিকল্পনায়, বিশেষভাবে শিল্পোন্নতির পরিকল্পনায়, বিশ্বাসী। সময় ও সুযোগ উপস্থিত হইলে ফরওয়ার্ড ব্লক রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্বে শিল্পপ্রসার সাধনে সচেষ্ট হইবে। অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রতিষ্ঠান সমূহের সহিত পরামর্শক্রমে ফরওয়ার্ড ব্লক ভূমি-ব্যবস্থা সম্পর্কেও প্রগতিশীল নীতি গ্রহণ করিবে।

উপরি-উক্ত কর্মপন্থা কার্য্যকরী করিতে ফরওয়ার্ড ব্লক যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্ত্তৃক যাহাতে এই কর্মপন্থা গৃহীত হয়, তদুদ্দেশ্যে ইহার অনুকূলে প্রচার কার্য্য চালাইবে।

গত ১৯৪১ সালে আগষ্ট মাসে কংগ্রেসের "ভারত ত্যাগ কর" প্রস্তাবের ভিত্তিতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে ব্যাপক গণ-আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মিগণ তাহাতে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে এবং অশেষ নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা ভোগ করে। সংগ্রাম-বিমুখ দক্ষিণ-পন্থীদের সহিত বামপন্থী ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে যে মতভেদ ছিল আগষ্ট আন্দোলনের ফলে তাহা বিদূরিত হয়। ব্লকের অনেক কর্মী দীর্ঘকাল যাবৎ কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা আজিও প্রত্যাহৃত হয় নাই। আগষ্ট আন্দোলনের দ্বারাই প্রমাণিত হইল যে, মূল কংগ্রেসের সহিত বামপন্থীদলগুলির যে মতানৈক্য তাহা কেবল কর্মপন্থার—একান্তই বাহ্যিক। সংগ্রামাত্মক পরিকল্পনার ভিত্তিতে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী দলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা অতিশয় সহজসাধ্য। ফরওয়ার্ড ব্লক ও কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল প্রভৃতি বামপন্থী প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কংগ্রেসের মনোভাব এখন পর্য্যন্ত পরিষ্কাররূপে জানা যায় নাই। অথচ গত আগষ্ট আন্দোলনে এই সকল প্রতিষ্ঠানই অধিকতর কষ্টস্বীকার ও দুঃখবরণ করিয়াছে। ইহাদেরই প্রচেষ্টায় আগষ্ট আন্দোলন কিয়ৎ পরিমাণে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে—নেতৃবৃন্দের গ্রেফ্‌তারের পর এই সকল

প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাই প্রস্তাবিত আন্দোলনের অসম্পূর্ণ পরিকল্পনাকে একটি সম্পূর্ণ রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি প্রতিকূলাচরণ করিলে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তার হানি হইবে। ইহাদের সম্পর্কে কংগ্রেস কি নীতি অনুসরণ করিবে তাহা সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করা প্রয়োজন।

সাভাশ

ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনের দ্বারা বামপক্ষকে সংহত করিয়া সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামের এই আয়োজন দক্ষিণপক্ষের মনে স্বভাবতঃই আতঙ্কের সঞ্চার করিল। সুভাষচন্দ্রের সংগ্রামাত্মক পরিকল্পনাকে তাঁহারা যে বরদাস্ত করিবেন না, ইহা আদৌ বিস্ময়কর নহে। সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলে কংগ্রেস নায়কগণ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—The work of twenty years has been undone overnight (বিশ বৎসরের সাধনা রাতারাতি নষ্ট হইল)! তাঁহারা জানিতেন সুভাষচন্দ্র তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও বিপুল সংগঠন শক্তি প্রভাবে অচিরাৎ সকল কংগ্রেসকর্মী ও স্বাধীনতাকামী সমস্ত দেশবাসীকে আপন সুদক্ষ নেতৃত্ব ও পরিচালনাধীনে একই আদর্শ ও কর্ম্মপন্থায় উদ্বুদ্ধ করিয়া সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সংঘবদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব এতদূর আন্দোলনবিমুখ হইয়া উঠিয়াছিল যে পাছে এই সংগ্রামশীল শ্রেণী কোথাও সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া দেয় এই ভয়ে মে মাসে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস কমিটির সভায় দুইটি প্রস্তাব পাশ করাইয়া লয়। প্রথম প্রস্তাবে বলা হয়, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অনুমতি ব্যতীত কেহ

সত্যাগ্রহ করিতে পারিবে না। দ্বিতীয় প্রস্তাবের দ্বারা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহিত কংগ্রেসী মন্ত্রীদলের সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। শেষোক্ত প্রস্তাবের দ্বারা কংগ্রেস মন্ত্রিবর্গকে কংগ্রেস কমিটির ঊর্দ্ধে স্থান দেওয়া হয়। সুভাষচন্দ্র সে সময়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্ত্তৃক ঐ দুইটি প্রস্তাব গ্রহণের ফলে সুভাষচন্দ্রের সহিত কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয়দের পুনরায় বিরোধ উপস্থিত হয়। সুভাষচন্দ্রের মতে ঐ প্রস্তাব দুইটি কার্য্যে পরিণত হইলে কংগ্রেস নিয়মতান্ত্রিকতার দিকে বেশীরকম ঝুঁকিয়া পড়িবে এবং নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটিতে সাধারণ কংগ্রেস কর্মীর অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবে। 'These resolutions were calculated to strengthen the position of the Rightists and to take the Congress away from the path of mass struggle.' ৯ই জুলাই সুভাষচন্দ্র নিখিল-ভারত প্রতিবাদ দিবস পালনের নির্দ্দেশ দিলেন। কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ ইহাকে বিদ্রোহ বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে আর এক দফা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন।

অহিংস উপায়ে যাহারাই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে দল বা প্রতিষ্ঠান নির্ব্বিশেষে কংগ্রেস এ যাবৎ সে সমস্তেরই মিলনক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু ত্রিপুরীর পরে একদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের ফল এই হয় যে, কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক ও সর্ব্বজনীন রূপ বিলুপ্ত হয়। একদলীয় মন্ত্রিসভার প্রতি অবিচলিত আস্থা ও দ্বিধাবিহীন আনুগত্যই কার্য্যতঃ এখন কংগ্রেসকর্মী হইবার পক্ষে একটি প্রধান সর্ত্ত হইয়া দাঁড়াইল। জাতীয় মহাসভা একটি Totalitarian প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল। একদলীয়ত্বের নীতি মন্ত্রিসভা হইতে দ্রুত সমস্ত কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে সংক্রামিত হইল। কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের কর্ম্মপদ্ধতির প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ আস্থা নাই তাঁহাদিগকে অর্থাৎ সমস্ত বামপন্থীদের কংগ্রেস হইতে

বিতাড়িত করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিরোধের জন্য সত্যাগ্রহ করিবার অধিকার কংগ্রেসসেবী মাত্রেরই আছে। সুতরাং এই প্রস্তাবের দ্বারা সর্ব্বপ্রথম কংগ্রেস কর্মীর সেই মূল অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইল। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম ও প্রধানতম, 'গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার সুদৃঢ় ভিত্তি'র উপর প্রতিষ্ঠিত, জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের মধ্যে এই অনাচার নিবারণকল্পে চিরবিদ্রোহী সুভাষচন্দ্র মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন।

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ অবিলম্বে কৈফিয়ৎ তলব করিয়া পাঠাইলেন। সুভাষচন্দ্র যে কৈফিয়ৎ দিলেন তাহাতে তিনি সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিলেন, প্যাটেল প্রস্তাবের বিরোধিতা করিবার ও উহার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করিবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার তাঁহার আছে এবং সেই অধিকার সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক ও কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রসিদ্ধ অধিকার (Constitutional and democratic right)। উপসংহারে তিনি কংগ্রেস সভাপতিকে লিখিলেন —"If you decide to resort to disciplinary action, I shall gladly face it for the sake of what I regard as a just cause. In conclusion, I have to request that if any Congressman is penalised in connection with the events of the 9th July, then you will also take action against me. If the observance of the All India Day of the 9th July is a crime, then I confess, I am the arch-criminal."

অবশেষে ওয়ার্কিং কমিটি ওয়ার্দ্ধায় অনেক শলাপরামর্শ করিয়া নিম্নলিখিত হুকুমনামা জারি করিলেন :—

"কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে যে, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু শৃঙ্খলাভঙ্গের গুরুতর অপরাধে বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতিপদের ও ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাস হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত

কোন নির্ব্বাচিত কংগ্রেস কমিটির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হওয়ার অনুপযুক্ত বলিয়া ঘোষিত হইলেন।"

সুভাষচন্দ্র শান্তভাবে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত শুনিলেন—তাঁহার উপর কংগ্রেসী বড় কর্ত্তাদের মনোভাব কাহারও অবিদিত নাই। সিদ্ধান্ত শুনিয়া তিনি কেবল বলিলেন—"Is that all ?" ইহা অপেক্ষা গুরুতর শাস্তির জন্য যেন তিনি পূর্ব হইতে প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন! কিন্তু এই প্রস্তাবের দেশব্যাপী প্রতিক্রিয়া বড় গুরুতর হইয়া দেখা দিল। সর্ব্বত্র অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ঘনাইয়া উঠিল। ২৫শে আগষ্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভায় এই বিষয়ে যেপ্রস্তাব গৃহীত হয় তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সর্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত সভাপতিকে বিধিবিরুদ্ধভাবে, জবরদস্তিপূর্বক ও সম্পূর্ণ যুক্তিহীনতার সহিত পদচ্যুত করিয়া যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, এই সভা তাহার তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছে।"

"এই সভা শ্রীযুক্ত বসুর প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিয়া দৃঢ়তার সহিত এই মত ব্যক্ত করিতেছে যে, এই প্রদেশে কংগ্রেসের কার্য্যকলাপ সাফল্যের সহিত সুনির্ব্বাহ করিতে হইলে তাঁহার নেতৃত্ব অপরিহার্য্য।"

উক্ত প্রস্তাবে ইহাও উল্লেখ করা হয় যে, "যেহেতু বিদায়ী সভাপতির (সুভাষচন্দ্রবসুর) পদত্যাগ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্ত্তৃক গৃহীত হইবার পূর্বেই নূতন সভাপতি (ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে) মনোনয়ন দ্বারা নিয়মতন্ত্রবিরুদ্ধ কাজ করা হইয়াছে, যেহেতু বর্ত্তমান ওয়ার্কিং কমিটি অধিক সংখ্যক প্রতিনিধির সমর্থন পাইবে কিনা সে বিষয়ে সন্দিহান হইয়া নূতন সভাপতিকে সমগ্র প্রতিনিধিমণ্ডলীকর্ত্তৃক যথারীতি নির্ব্বাচিত হইবার সুযোগ দেন নাই এবং যেহেতু তৎকালীন সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু প্রারম্ভেই ঘোষণা করেন যে তিনি গঠনতন্ত্রবিরোধী

কাজ করিতে যাইতেছেন ও সভানেত্রীর এই ঘোষণার পরে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছে সেই কারণে বর্ত্তমান ওয়ার্কিং কমিটির শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে কিনা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ পোষণ করে।" পরিশেষে বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটি ওয়ার্কিং কমিটিকে তাহার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিয়া জানাইয়া দেয় যে, ওয়ার্কিং কমিটির নিকট হইতে উত্তর না আসা পর্য্যন্ত বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ অপূর্ণ থাকিবে ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর নির্দ্দেশক্রমেই কমিটির কাজ চলিতে থাকিবে।

সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ায় সমস্ত দেশে তুমুল বিক্ষোভ দেখা দিলেও মহাত্মাজী বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। এই প্রসঙ্গে তাঁহার যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহা এই—"In my opinion the action taken by the Working Committee was the mildest possible." পরে অবশ্য প্রকাশ পায়, গান্ধীজীর নির্দ্দেশক্রমেই সুভাচন্দ্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। গান্ধীজীর উক্তি—"I must confess that the Subas Babu resolution was drafted by me (সুভাষবাবু সম্পর্কিত প্রস্তাবের খসড়া যে আমিই প্রস্তুত করিয়াছি, ইহা আমি অবশ্যই স্বীকার করি)।"

ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রচার করেন :—

"কার্য্যতঃ আমাকে তিন বৎসরের জন্য কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত করিয়া ওয়াকিং কমিটি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন আমি সেই সিদ্ধান্ত সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেছি। গত কয়েক বৎসর যাবৎ দক্ষিণ পক্ষকে সংহত করিবার যে প্রচেষ্টা চলিতেছে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ফলে যাহা

অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে এই সিদ্ধান্ত তাহারই ফল। ওয়াকিং কমিটির এই কার্য্যে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ও সেই দলের কার্য্যকলাপের স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। আমার উপর যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে তাহা তাঁহাদের দৃষ্টির সম্পূর্ণ সমীচীনই হইয়াছে। নিয়মতান্ত্রিকতা ও সংস্কারপন্থার দিকে কংগ্রেস যে ক্রমশঃই বেশী ঝুঁকিয়া পড়িতেছে তাহার বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়া, জনগণের বৈপ্লবিক চেতনাকে নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে কংগ্রেস যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে তাহার বিরোধিতা করিয়া, বামপক্ষকে সংহত করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রচারকার্য্য চালাইয়া এবং সর্বোপরি দেশকে আগামী আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হইতে ক্রমাগত আবেদন জানাইয়া দক্ষিণপন্থীদের বিচারে আমি এমন এক অপরাধ করিয়াছি যাহার জন্য আমাকে শাস্তি পাইতেই হইবে। আমার উপর এই দণ্ডাদেশ আমার দেশবাসী অনেকের মনে আঘাত দিয়া থাকিলেও আমি ইহাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হই নাই--এবং এই দণ্ডাজ্ঞা আমার নিকট অপ্রত্যাশিতও নহে। নিয়মতান্ত্রিকতা ও গণ-আন্দোলন এই দুইয়ের প্রকৃতিগত বিরোধের সম্পূর্ণ যৌক্তিক পরিণতি ইহাই। আমাদের রাজনৈতিক বিবর্ত্তনধারার ইহা একটি ক্রম। এই জন্য আমার মনে কিছুমাত্র তিক্ততা বা বিদ্বেষের ভাব নাই। আমার শুধু এই ভাবিয়া দুঃখ হইতেছে যে, ওয়ার্কিং কমিটি এখন ইহা বুঝিতে পারিতেছে না যে এই ধরণের কার্য্যে আমার চেয়ে তাহারাই অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

ফরওয়ার্ড ব্লকের সভ্যগণ, সকল বামপন্থী ও আপামর জনসাধারণকে এই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যেও সম্পূর্ণ শান্ত থাকিয়া ক্রমবর্দ্ধমান সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের সহিত কাজ করিয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছি। আমি দণ্ডিত হইলে কি আসে যায়? এখন আমি অধিকতর নিষ্ঠার সহিত কংগ্রেসের কাজে আত্ম-নিয়োগ করিব ও জাতির দীনসেবক

হিসাবে অবিরত দেশ ও কংগ্রেসের কাজে লাগিয়া থাকিব। সকলের নিকট আমার অনুরোধ, আপনারা দলে দলে ফরওয়ার্ড ব্লকের সভ্য হউন। আমরা সংঘবদ্ধ হইলেই অগণিত কংগ্রেস কর্মীদের আমাদের মতানুবর্ত্তী করিতে পারিব ও বর্ত্তমান নিয়মতান্ত্রিকতা ও সংস্কারপন্থী মনোভাবের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিব—আমাদের সংঘবদ্ধ ও সম্মিলিত শক্তি স্বাধীনতার যুদ্ধে নিয়োজিত করিতে পারিব।

উপসংহারে আমি সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই, আজ যাহা ঘটিয়াছে তাহা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি মাত্র। কয়েকবৎসর পর্বেও একবার বামপন্থীদিগকে কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছিল ; কিন্তু, অনতিকাল পূর্বেই তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া কংগ্রেসকে তাঁহাদের নীতিও কর্মপন্থা মানিয়া লইতে বাধ্য করে। আমার কোনও সন্দেহ নাই যে, আমরা বামপন্থীরা যে আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করি তাহা ন্যায্য এবং ন্যায্য বলিয়াই ওয়াকিং কমিটির প্রতিকূলতার দ্বারাই ইহা সমধিক পুষ্টি লাভ করিবে। ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ফরওয়ার্ড ব্লকের সমর্থনে যে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গিয়াছে তাহাতে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, অনতিবিলম্বেই আমরা কংগ্রেসকে সম্পূর্ণ নূতন ভাবে গড়িয়া বিপ্লবাত্মক কর্মপন্থায় ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইব ও কংগ্রেসের নামে পুনরায় সংগ্রাম সুরু করিতে পারিব।”

ফরওয়ার্ড ব্লক ও বামপন্থীদের প্রতি কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের মনোভাব নির্লজ্জ আকারে প্রকাশ পাইল। কংগ্রেসের প্রধান নেতারা মায় মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত প্রকাশ্যভাবে ইহাদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। পণ্ডিত জওহরলাল ফরওয়ার্ড ব্লককে 'an evil' ও বামপন্থীদের 'a group of opportunists and disgruntled elements' বলিয়া অভিহিত করিলেন। করাচী হইতে ফৈজপুর পর্য্যন্ত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যে সংগ্রামশীল ও প্রগতিমুখী মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে

পণ্ডিতজীর এই রূপান্তর (metamorphosis) তৎকালে দেশবাসীর মনে গভীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। মহাত্মাগান্ধী হরিজন পত্রে The Congressman নামক প্রবন্ধে বামপন্থী দলগুলির সম্পর্কে মন্তব্য করিলেন —"I am afraid that these groups contain in themselves the seeds of the decay of the Congress." (এই দলগুলির মধ্যে কংগ্রেস ধ্বংসের বীজ বর্ত্তমান)।

এদিকে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ দাবানলের মত চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। বল্কান রাজ্যগুলি একে একে জার্মানীর পদানত হইয়া পরাধীনতার নিগড় পায়ে পড়িতেছে। ভারতীয় জাতীয় মহাসভা কিন্তু ইয়োরোপের এই সংকটকালে বামপন্থীদলগুলিকেই তাহাদের প্রধান শত্রু বলিয়া জানিলেন ও বর্দ্ধিত উৎসাহে বামপন্থীদলনে লাগিয়া গেলেন। ২৫শে নভেম্বরের ফরওয়ার্ড ব্লক পত্রে "Whom They Fight ?" শিরোনামায় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সুভাষচন্দ্র লিখিলেন, "for the Rightists, British Imperialism is a lesser enemy than Indian leftism. You can compromise with the former, bnt in the case of the latter, war to the bitter end. And perhaps if British Imperialism strikes at Indian Leftism, our Rightist friends will have no cause for regret."

১৯৩৮ সালে কংগ্রেস সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্র আবেগময়ী ভাষায় বলিয়াছিলেন, ইয়োরোপে অর্থ নৈতিক রেষারেষির ফলে ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বণ্টন বৈষম্যের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, আগামী ছয়মাসের মধ্যে ইয়োরোপে সাম্রাজ্য-বাদী লড়াইয়ের পৈশাচিক তাণ্ডব-নৃত্য সুরু হইবে ; সুতরাং, এই যুদ্ধের পূর্ণ সুযোগ আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। তাই তিনি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে ছয়মাসের সময় দিয়া চরমপত্র দিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু কংগ্রেস

তখন ত এই সংগ্রামশীল নীতি গ্রহণ করেনই নাই, এমন কি বৃটেন যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার এক মাসের মধ্যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে অক্টোবর মাসে যুদ্ধ সম্পর্কিত যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহাতে বলা হইল—"The A. I. C. C. however does not wish to take any decision precipitately and without giving opportunity for the war and peace aims of the British Government to be clarified with particular reference to India." কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ 'India cannot accept any settlement of freedom issue which pledges in advance her support in the war.'—এই মর্ম্মে যে সংশোধন প্রস্তাব আনয়ন করেন তাহাও অগ্রাহ্য হয়। বৃটিশগভর্ণমেণ্ট ভারতীয় জনগণের সম্মতি ব্যক্তিরেকেই ভারতকে যুদ্ধলিপ্ত দেশ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তথাপি কংগ্রেস কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিতে কিম্বা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। কংগ্রেস নেতৃত্বের এই শোচনীয় ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করিয়া সুভাষচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"The whole world prepared itself for the crisis but not the Indian National Congress." অবশেষে যখন দেখা গেল যে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া ত দূরের কথা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নির্ভরযোগ্য কোন আশ্বাস বাণীও পাওয়া গেল না—দিল্লীতে ভারতের মহামান্য রাজপ্রতিনিধি ও দেশ নায়কদের দীর্ঘ আলোচনা অক্টোবর মাসে এক ঘোষণার দ্বারা চরম ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল তখনও কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীর পদত্যাগ ভিন্ন অপর কোন পন্থাই কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ ভাবিয়া পাইলেন না। প্রথমে জনসাধারণ এই ভাবিয়া আশান্বিত হইয়াছিল যে, মন্ত্রিমণ্ডলীর পদত্যাগের পরে কংগ্রেস নিশ্চয়ই কোন সক্রিয় ও সংগ্রাম-মূলক কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিবেন; কিন্তু, গান্ধিজীর উক্তি শীঘ্রই সব আশা

নির্ম্মূল করিয়া দিল। এই সময়কার হরিজন পত্রে "Causes" নাম দিয়া এক প্রবন্ধে মহাত্মা স্পষ্টরূপেই জানাইয়া দিলেন—"There is no question of civil disobedience for there is no atmosphere for it—at any rate there is no question of civil disobedience in the aggressive sense as we launched in 1930 and 1932."

বামপন্থীরা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির 'মন্ত্রিত্ব ত্যাগ রূপ' এই তথাকথিত 'Big step'এর সিদ্ধান্তকে আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করেন—অবশ্য পদ্ধতি সম্বন্ধে কংগ্রেস নেতৃবর্গের সহিত তাহাদের মতভেদ ছিল। সুভাষচন্দ্রের অভিমত ছিল,—'In the prevailing atmosphere the decision was good so for as it went but was not in keeping with what we regard as sound tactics. Instead of throwing up the sponge, the Congress Ministers should have stuck to their posts, should have gone on implementing the Congress programme and should have invited dismissal while discharging their legitimate duties.'

বৃটেনের ঔপনিবেশিক অধিকার হস্তচ্যুত করিবার কোন সদিচ্ছাই যে নাই ভারতবর্ষের নজির তুলিয়া নাৎসী নায়ক হিটলার নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাহা প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—"If Britain started granting her Empire full liberty by restoring the freedom of India, we should have bowed before her." কিন্তু, কংগ্রেসী বড় কর্ত্তাদের চৈতন্যোদয় হওয়া ত দূরের কথা তাঁহারা সকলকে পরিষ্কাররূপেই জানাইয়া দিলেন—"The Working Committee will continue to explore all means of arriving at an honourable settlement even though the British Government have banged the door in the face of

the Congress." অধিকন্তু, যুদ্ধের সূচনা হইতেই মহাত্মা গান্ধী বিনাসর্ত্তে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য দানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। মহাত্মাজী অপূর্ব মহানুভবতার শিখর দেশ হইতে ঘোষণা করিলেন—"The Congress must not embarrass them (Government) in its (war's) prosecution". "I will resist civil disobedience unless I find the Country prepared for it." এই প্রস্তুতির পরিমাপ হিসাবে এইবার কংগ্রেস স্বাধীনতার সঙ্কল্পবাক্যে চরকা-খাদি ও হরিজন সম্বন্ধীয় দুইটি নূতন সর্ত্ত যোজনা করিয়া দিল এবং গান্ধীজী চরকা ও অহিংসাকে স্বরাজ-লাভের একমাত্র অস্ত্র বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। 'Charka is the yard-stick for gauging the Nation's preparedness for struggle.' শুধু তাহাই নয়, গান্ধীজী অহিংসার উপরেও অভূতপূর্ব গুরুত্ব আরোপ করিলেন। "I connot identify with any civil disobedience unless I am convinced that Congressmen believe in non-violence with all its implications". হরিজন আন্দোলন ও অনুরূপ সমাজ-সংস্কার মূলক কাজই এখন কংগ্রেসের কর্মতালিকায় প্রাধান্য পাইল। কংগ্রেস নায়কগণ এই অজুহাতও দেখাইলেন যে, আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিলে হিন্দু-মুসলমানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই সময়কার ওয়ার্কিং কমিটির এক প্রস্তাবে বলা হইয়াছে—The Working Committee desire to make it clear that the true test of preparedness for C. D. lies in Congressmen themselves spinning and promoting the cause of Khadi to the exclusion of Mill-cloth and deeming it their duty to establish harmony between the Communities by personal acts of service to

those other than members of their own community and individual Hindu Congressmen seeking an occasion for fraternising with Harijans as often as possible. The Congress organisations and Congressmen should therefore prepare for future action by promoting this programme."
গান্ধীজী "স্বরাজের জন্য সুতা কাটুন" এই slogan তুলিলেন। এই সকল গঠনমূলক কাজের প্রতি অস্বাভাবিক গুরুত্ব আরোপ করাকে বামপক্ষ কংগ্রেসের সংগ্রাম বিমুখতার পরিচায়ক বলিয়া ধরিয়া লইলেন। তাঁহাদের অভিমত এই যে, এই সময় রচনাত্মক কর্মক্রমের উপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব প্রদান আমাদিগকে মূল লক্ষ্য পথ হইতে সরাইয়া লইয়া যাইবে। লক্ষ্ণৌয়ে ছাত্রদের এক সভায় সুভাষচন্দ্র বলেন—"Swaraj cannot he achieved through the plying of Charka and by using Khadi. It would come only through mass organisations and sacrifices"

এই সময়ে কংগ্রেস একদিকে গঠনমূলক কর্ম্মপন্থার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন, অপরদিকে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি হইতে সরিয়া গিয়া গণপরিষদের Constituent Assembly দাবি করিলেন। কংগ্রেস নেতৃত্বের এই আপোষমুখী মনোভাবের কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। "ভারত যদি স্বাধীন হয় তবে আমাদের দ্বারাই হইবে, নতুবা হইয়া কাজ নাই"—কংগ্রেসের কর্ণধারগণের মনোগত ভাব ইহাই। সংগ্রাম আরম্ভ করিলে পাছে ক্ষমতা জনগণের হাতে চলিয়া যায় এই ভয়েই তাঁহারা সংগ্রামকে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য পিছাইয়া দিতে চাহিতেছেন ও বিক্ষুব্ধ জনগণকে গঠন মূলক কাজের ভাওতা দিয়া সংগ্রামের পথ হইতে সরাইয়া লইতে চাহিতেছেন।

কংগ্রেসের এই সময়কার কর্ম্মধারা এবং এমতাবস্থায় বামপন্থীদলের কর্ত্তব্য কি সুভাষচন্দ্র ফরওয়ার্ড ব্লক পত্রে 'The Correct Line' শীর্ষক

এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তাহা বিবৃত করেন। অন্তকার মন্ত্রীমিশন প্রস্তাবিত Constituent Assembly (গণপরিষদ) গঠন সংক্রান্ত আলোচনায় সুভাষচন্দ্রের মতামত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রয়োজনবোধে এই প্রবন্ধটি আমরা বিস্তৃতাকারে উদ্ধৃত করিলাম—

"To examine how the Congress Working Committee has so far succeeded in resisting mass pressure would be indeed an interesting study. Having suspended the fight with Imperialsm, it has been conducting a ruthless and continuous drive against the Left and particularly against the Forward Block. This serves to divert public attention from the path and the duty that lie ahead of us. To bewilder the public and thereafter scare it away from the path of struggle, bogeys have been created from time to time. Before the war, we were told that a forward move was impossible, because there was corruption within the Congress and because a forward move, when launched, would lead to an outbreak of violence. Since September last thay have had a brain-wave and and we are now told that if the Congress starts a Satyagraha compaign, Hindu Muslim riots will inevitably follow. We are awaiting the invention of fresh argument for desisting from a dynamic policy. The tragedy that has overtaken the upper ranks of Congress leadership is due primarily to demoralisation that followed in the wake of office acceptance. The demora-

lisation was altogether unexpected. Who had ever expected that even those who have fought for years for India's freedom and who have braved the rigours of prison life would thus fail us in the most fateful hour of our history ?

The latest stunt which has been devised to stave off struggle and which may in time prove to be the greatest fraud perpetrated on the Indian people by their own leaders is the proposal of a Constituent Assembly under the aegis of an Imperialist Government. We have made some serious study of history and politics, and in our view, a Constituent Assembly, if it is not a misnomer, can come into existence only after the seizure of power. If for instance the Congress and British Government are engaged in struggle over the Indian problem, the Congress will first have to come out victorious and form a Provisional Government to take over power. Only such a Provisional National Government can summon a Constituent Assembly for framing a detailed constitution for India. The Assembly that is now being proposed by the Congress Working Committee may be a glorified All-Party Conference but it is certainly not a Constituent Assembly. It will meet with the fate of the Irish Convention which was the creature of Mr. Lloyd George. The Indian people should have nothing to do with such

an Assembly the only purpose of which would be to side-track us from our principal task, as the Harijan Movement did in 1932 and 1933.

Our own path is clear. We are now passing through the anti-imperialist phase of our movement. We have to rally all uncompromisingly anti-imperialist elements for the next move. The problem to-day is not merely to force the hands of the Congress Working Committee. That we must do. But even if we succeed therein, with Mahatma Gandhi at our helm, there will always be the danger of another Chauri-Chura, or another Harijan Movement or another Gandhi-Irwin Pact. For that danger we must prepare in advance, so that we may be able to meet it successfully when the time comes."

আটাশ

১৯৪০ সালে রামগড়ে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন হয়। বাংলায় কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচন ব্যবস্থার পরিচালনা লইয়া কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতির সহিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মতান্তর হয়। মূল কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতি বাংলায় নির্বাচন কার্য নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বিশেষ সমিতি (Ad-hoc Committee) গঠনের আদেশ দেন। বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির তৎকালীন সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু কংগ্রেস কমিটির এই আদেশ গণতন্ত্রবিরোধী বলিয়া ঘোষণা করেন। সুভাষচন্দ্রের

সভাপতিত্বে বাংলার এক বিপুল জনসভা একযোগে এই অভিমত ব্যক্ত করে যে, কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী দল বামপন্থীদিগকে কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত করিবার জন্যই এই কাণ্ড করিতেছে। বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির পরিচালকগণ এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, 'মূল কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি বাংলার উপর এক বিশেষ সমিতি চাপাইয়া দিয়াছেন। তাহাদের এই কার্য্য কংগ্রেসের আভ্যন্তরিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংসকর।' উক্ত প্রস্তাবে ইহাও বলা হয় যে "বর্ত্তমান বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটি নিয়মানুগভাবে গঠিত হইয়াছে। সুতরাং উহা কার্য করিতে থাকিবে এবং ইহার পরিচালনাধীন কংগ্রেস কমিটিগুলি বিশেষ (Ad-hoc) কমিটির সহিত কোনরূপ সহযোগিতা করিতে পারিবে না।"

কাজেই, ভারতের রাজনৈতিক জীবনের এক মহাসন্ধিক্ষণে বল্লভ-রাজেন্দ্র-শাসিত কংগ্রেসের সহিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বিরোধ অপরিহার্য হইয়া উঠিল। পুণা চুক্তির সময় ও সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয়বার সভাপতি নির্ব্বাচনের সময় হইতেই এই বিরোধ ঘনীভূত হইতে থাকে। এবার কংগ্রেসের সহিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিল। ১৯৪০ সালে ফেব্রুয়ারি-মার্চ্চ মাসে ওয়ার্কিং কমিটির পাটনা অধিবেশনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও তাহার কার্যকরী সমিতিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। বাংলার অধিকাংশ কংগ্রেসকর্মী ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিলেন—তাঁহারাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি পরিচালনা করিতেন। এখন তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া যে দল সংখ্যায় অল্প তাহাদের উপরেই প্রাদেশিক কংগ্রেসের পরিচালনাভার অর্পিত হইল। এই স্বেচ্ছাচারিতা ও অবিবেচনার ফলে বাংলার কংগ্রেস আন্দোলন শক্তিহীন হইয়া পড়ে।

১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা জেলার মালিকান্দা গ্রামে গান্ধী সেবা-সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধী বাংলায় আগমন

করেন। বহুদিন পরে মহাত্মা গান্ধী বাংলায় আসিলেও সেবার জনসাধারণের মধ্যে তাঁহাকে দেখিবার জন্য ও মহাত্মার বাণী শুনিবার জন্য তেমন আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা যায় নাই। বাংলার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নেতা সুভাষচন্দ্রের প্রতি ওয়ার্কিং কমিটির অবিচারের ফলেই বাংলাদেশ গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃবর্গের প্রতি পূর্ব্বেকার মত অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বিরত হইয়াছে, মহাত্মা তাহা নিজচক্ষেই দেখিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লকের সংগ্রামশীল কর্মপন্থা দিকে দিকে দেশের যুবশক্তিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। ফরওয়ার্ড ব্লক ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং ভারতের সর্বত্র শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া তাহারা কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত করিতে সক্ষম হয়। সুভাষচন্দ্রের আন্তরিকতা ও কর্মোদ্যম, ত্যাগ ও নিষ্ঠা, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ও সর্বোপরি তাঁহার চৌম্বক ব্যক্তিত্ব সকল বামপন্থী কংগ্রেসকর্মীদিগকেই ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতি আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয়। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী বহু বিশিষ্ট সভ্য ও ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান করে। সুভাষচন্দ্র ভারতের সর্বত্র এই নূতন দলের নীতি ও কার্যক্রম ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করেন ও সর্বত্রই জনসাধারণের মধ্য হইতে অদ্ভুত সাড়া পান। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত 'Glimpses of My Tour' নাম দিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই সময় ফরওয়ার্ড ব্লকের লক্ষ্য ছিল প্রধানতঃ তিনটি (ক) Left-consolidation (বাম পক্ষের সংহতি); (খ) Establishment of real and effective unity within the Congress (কংগ্রেসের মধ্যে প্রকৃত ও কার্য্যকরী ঐক্য প্রতিষ্ঠা); (গ) Resumption of National struggle in the name of the Congress (কংগ্রেসের নামে জাতীয় আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ করা)। দক্ষিণ পক্ষের প্রবল বিরোধিতাসত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র এই উদ্দেশ্যগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। অপরদিকে কংগ্রেস হাই কমাণ্ড ও গান্ধীপন্থী নেতারা

সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে তুমুল প্রচারকার্য চালাইতে থাকে। সমগ্র জাতীয় মহাসভার শক্তি ও প্রভাব তাঁহার বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয়। জাতীয় কংগ্রেস হইতে তিনি ত অপসৃত হইয়াছেনই তাহা ছাড়া জাতীয় কংগ্রেসের সমস্ত শক্তি ও প্রভাব জনসাধারণের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের প্রভাব খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে উদ্যত ও প্রযুক্ত হইল। অনেক স্থানে কংগ্রেসের চারি আনা সদস্যদের ও সুভাষচন্দ্রের সভা ও বক্তৃতাদিতে উপস্থিত থাকিতে নিষেধ করা হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্রু যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস কমিটিগুলির উপর হুকুমনামা জারী করেন, "to dissociate themselves from any tours or visits of leaders who undertake them independently of official Congress sanction."

পূর্বেই বলিয়াছি ইউরোপের যুদ্ধ সুরু হইতে না হইতেই কংগ্রেস সর্তাধীনে যুদ্ধ সমর্থন করিবার ইঙ্গিত দিতে থাকে; ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য ব্যাপারে কিছু সুবিধালাভের পরিবর্তে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ব্যবস্থায় সাহায্যদানের কথা উঠিতে থাকে। কংগ্রেস নেতৃবর্গ বোমাবিধ্বস্ত ইংলণ্ডবাসীর প্রতি সহানুভূতিতে গদ্‌গদ হইয়া উঠেন। মহাত্মা গান্ধী ত বিনাসর্তে সাহায্য করিতেও প্রস্তুত। তিনি একবাক্যে ঘোষণা করিলেন—My sympathies are wholly with the allies. পণ্ডিত নেহেরুও ইউরোপীয়-মার্কা তথাকথিত 'Progress ও Democracy'র ধুয়া তুলিয়া গান্ধীজীর পক্ষ সমর্থন করিলেন। কারণ, তাঁহার বিবেচনায় ভারতবর্ষের এমন কিছু করা উচিত নয় 'which might alienate the progressive forces of the world.' কংগ্রেসের 'Policy of Non-embarrassment' অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে। বিগত মহাযুদ্ধে ভারতীয়দের সাহায্য দানের চরম পুরস্কার জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের রক্তরঞ্জিত স্মৃতি মানসপট হইতে মুছিয়া না গেলেও মহাত্মা বৃটেনের এই দুর্দ্দিনের সুযোগ লইবেন না। "If the

British Government will not 'suo motu' declare India a free country, having the right to determine her own status and constitution, I am of the opinion that we should wait till the heat of the battle in the allied countries subsides and the future is clearer than it is. We do not seek our independence out of Britain's ruin."

গান্ধীজী ইহাও বলিলেন এই সময়ে যদি কোন আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয় তবে তিনি তাহা নিজের জীবন দিয়া প্রতিরোধ করিতেও পশ্চাৎপদ হইবেন না। চতুর বৃটিশ রাজনীতিকেরা কংগ্রেস নেতৃত্বের এই নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে ভারতের উপর যুদ্ধের দক্ষিণা চাপাইয়া দিলেন—অর্ডিন্যান্সের পর অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া জনসাধারণের মৌলিক অধিকারগুলিও একে একে হরণ করিয়া লইলেন; বড়লাটের সহিত নিষ্ফল আলোচনায় ও ক্রিপস্ প্রস্তাবের মহড়া দেখাইয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং ভারতের জনবল ও ধনসম্পদকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

কংগ্রেসের বাহির হইতে সুভাষচন্দ্র দাবী করিলেন, কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের এই ব্যাপারে অধিকতর সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় প্রদান করা উচিত। ভারতবর্ষের পক্ষে বড়লাটের যুদ্ধ ঘোষণাকে বাধাদানের জন্য জাতীয় কংগ্রেসের পরিচালনায় অবিলম্বে দেশব্যাপী তুমুল বিক্ষোভ ও আন্দোলন আরম্ভ করা উচিত। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে লিপ্ত গ্রেট্ বৃটেনের সহিত কোন প্রকার সহযোগিতা করার তিনি ঘোর বিরোধী। যাহারা মাঞ্চুরিয়া ও আবিসিনিয়ায় নাৎসী আক্রমণকে প্রশ্রয় দিয়াছে, স্পেন ও চেকোস্লোভাকিয়া গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে তাহাদের মুখে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও প্রগতির গালভরা কপট বুলি শুনিয়াই সংগ্রাম-ভীরু কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ বৃটিশের ভুয়া আশ্বাস বাণীতে আস্থা স্থাপন করিয়া

যে কি মহাসর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছেন সুভাষচন্দ্র বারংবার সে সম্বন্ধে দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিলেন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে তিনি দেশবাসীকে আহ্বান করিলেন। বিপ্লবী নেতার সংগ্রামের আহ্বানে দেশ বিরাটভাবে সাড়া দেয়। দেশের জাগ্রত যুবশক্তি ও বিপ্লবিগণ—কিষাণ, মজুর ও ছাত্রদল আপোষহীন সংগ্রামের পতাকাতলে সমবেত হইতে থাকে। পেশোয়ার হইতে আসাম পর্যন্ত, দক্ষিণে কুমারিকা পর্যন্ত ফরওয়ার্ড ব্লকের সংগঠন ছড়াইয়া পড়ে। ইতিমধ্যে রামগড়ে কংগ্রেসের ৫৩তম অধিবেশন আসিয়া পড়িয়াছিল।

এবার কংগ্রেসের সংগে সংগে রামগড়ে বামপন্থী নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে একটি আপোষ বিরোধী সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। মহাত্মা প্রমুখ কংগ্রেসের বর্ত্তমান পরিচালকগণ জাতীয় মহাসভার পূর্ণ আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিয়া ব্রিটিশ সরকারের সহিত আপোষ করিতে উদ্গ্রীব বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে মনোভাব জ্ঞাপনের জন্যই এই স্বতন্ত্র সম্মেলনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সুভাষচন্দ্র সমগ্র দেশের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা ভারতের ইতিহাসে অদ্বিতীয়। সুভাষচন্দ্রের সমর্থক দলের সংখ্যা যে কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃবর্গের সমর্থকগণের তুলনায় কম নহে রামগড় কংগ্রেসে তাহা প্রমাণিত হয়। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন অপেক্ষা আপোষ-বিরোধী সম্মেলনেই অধিক জনসমাবেশ হইয়াছিল। দলে দলে বিহার ও বাংলার কৃষক ও মজুরেরা রামগড় যাইয়া এই আপোষ-বিরোধী সম্মেলনে যোগদান করে। ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত কংগ্রেস পতাকা ও রক্তপতাকা উড্ডীন করিয়া সম্মেলনের সভাপতি সুভাষচন্দ্র নিম্নোক্ত অভিভাষণ প্রদান করেন—

'কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সমর্থকগণ যুক্তি দেখাইয়া থাকেন যে কংগ্রেসই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম আপোষ বিরোধী প্রতিষ্ঠান। পাটনায় কংগ্রেসওয়ার্কিং কমিঠির সর্ব্বশেষ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব কংগ্রেসের

আপোষ বিরোধী মনোভাবের নজির হিসাবে তুলিয়া ধরা হয়। কিন্তু পাটনা প্রস্তাব ও বিশেষ করিয়া উহার শেষাংশ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে উহাতে এমন কতকগুলি ছিদ্র আছে যাহা ঐ প্রস্তাবের আসল উদ্দেশ্যই নষ্ট করিয়া দিয়াছে। উপরন্তু, পাটনা প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সংগে সংগেই গান্ধীজী এক বিবৃতি দিয়া জানাইয়াছেন যে, আপোষ মীমাংসার জন্য ভবিষ্যৎ আলোচনার পথ রুদ্ধ হয় নাই। যুদ্ধ বাঁধিবার পরই গান্ধীজী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সহিত পরামর্শ না করিয়াই সিমলায় বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান এবং যুদ্ধ পরিচালনায় তিনি বিনাসর্ত্তে গ্রেটবৃটেনকে সাহায্যপ্রদানের আশ্বাস দেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া মাত্রই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আমাদের পূর্ণ স্বরাজের দাবীকে পাশ কাটাইয়া চলিতে আরম্ভ করেন ও তৎপরিবর্ত্তে কৃত্রিম গণ পরিষদের জিগির তুলিয়াছেন। দক্ষিণপন্থী বড় বড় নেতারা এমনকি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণও গণ পরিষদের যথার্থ তাৎপর্য ও গুরুত্ব বিস্মৃত হইয়া পৃথক নির্বাচন ও বর্ত্তমান আইনসভার সংকীর্ণ ভোটাধিকারের ভিত্তিতেই গণপরিষদ গঠনের স্বপ্ন দেখিতেছেন। কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীর পদত্যাগের পরও কতিপয় কংগ্রেসী মন্ত্রী মন্ত্রীত্বের মসনদে পুনরোপবেশন করিতে অতিমাত্রায় ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। সমস্ত দেশ আজ ওয়ার্কিং কমিটির নিকট হইতে সুস্পষ্ট ঘোষণা চাহিতেছে এই মর্মে যে সাম্রাজ্যবাদের সহিত সকলরকম আপোষ আলোচনার পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি এইরূপ ঘোষণা করিবেন কী? করিলে তাহা কবে করিবেন?

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও কংগ্রেসের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন না। তাহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে কংগ্রেসীরা যতই আস্ফালন করুক না কেন কার্য্যতঃ তাহারা সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবে না। গত ছয়মাস যাবৎ আমরা কেবল কথার জাল বুনিয়াছি

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সেই এক বহু বিঘোষিত উত্তরই পাইয়া আসিতেছি যে, হিন্দু মুসলমানে ঐক্য সংস্থাপিত না হইলে পূর্ণ স্বরাজের কথা উঠিতেই পারে না।

যে বিপদ আমাদের দ্বারদেশে উপস্থিত ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহা অভিনব হইলেও জগতের ইতিহাসে ইহা কিছু নূতন নয়। যুগ পরিবর্ত্তন-কালে এই রকম সংকটজনক পরিস্থিতি প্রায়ই দেখা দেয়। যে যুগ অতীত হইতে চলিয়াছে তাহার উপর আমরা যবনিকা টানিয়া দিতেছি এবং অপরদিকে আমরা এক নূতন যুগের তোরণদ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। আজ সাম্রাজ্যবাদের অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে এবং স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের যুগ আমাদিগের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। আজ ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণ উপস্থিত। যে পুরুষানুক্রম ও অতীত ঐতিহ্য সারা পৃথিবীর জন্য অপেক্ষা করিতেছে আমাদিগকে তাহার যোগ্য উত্তরাধিকারী হইতে হইবে।

পুরাতন কাঠামো যখন নিজের ভারেই ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং পুরাতনের ধ্বংসস্তূপ হইতে নূতনের আবির্ভাব সূচিত হয় তখন মানুষের সংস্কারদুষ্ট মন যে বিহ্বল হইয়া পড়িবে ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই; কিন্তু, এই অনিশ্চয়তার মুহূর্ত্তে আমরা যেন আমাদের নিজেদের প্রতি, দেশবাসীর প্রতি ও সমগ্র মানব সমাজের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া না ফেলি। আত্মবিশ্বাস লুপ্ত হইলে আমাদের বিপদ গুরুতর হইবে।

এই বিপজ্জনক অবস্থায় জাতির নেতৃত্বের চরম পরীক্ষা হয়। বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের নেতৃত্ব পরীক্ষিত হইয়াছে এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ এই নেতৃত্ব ব্যর্থ ও অভাবগস্ত প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান ও পর্য্যালোচনা করিলে আমরা ইতিহাসের শিক্ষালাভ করিতে পারিব এবং ভবিষ্যৎ প্রচেষ্টা ও সাফল্যের সুদৃঢ় ভিত্তিস্থাপন করিতে পারিব।

এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও অন্যান্য দেশ ও জাতির জীবনের এবম্বিধ সংকটময় অবস্থার সহিত আমাদের অবস্থার তুলনামূলক বিচার করিতে চাই। ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে রুশ বিপ্লবের যখন সূত্রপাত হয় তখন কাহারও মনেই কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না, কি ভাবে এই বিপ্লবকে সন্তোষজনক পরিণতির দিকে পরিচালিত করিতে হইবে। বলশেভিকদের অনেকেই অন্যান্য দলের সহিত কোয়ালিশন করার কথা ভাবিতেছিল। কিন্তু লেনিন কোয়ালিশনের সুখস্বপ্নকে বিচূর্ণ করিয়া দিয়া ধ্বনি তুলিলেন —'সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েটের হস্তে অর্পিবে।' সমস্ত রুশজাতি যখন সন্দেহ ও সংশয়ে দুলিতেছিল, সেই সময়ে লেনিনের এই সময়োচিত নেতৃত্ব না হইলে রাশিয়ার ইতিহাসে কোন্ পরিবর্ত্তন দেখা দিত কে জানে? লেনিনের দ্রষ্টাসুলভ ও নির্ভুল অন্তর্দৃষ্টি রাশিয়াকে দারুণ বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে নতুবা এই সে দিন স্পেনের যে শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল রাশিয়ার অবস্থাও হইত তদ্রূপ।

এখন আমি আর একটি বিরুদ্ধ ঘটনার উল্লেখ করিব। ১৯২২ সালে ইটালীর অবস্থা সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল ও আশাপ্রদ ছিল। অভাব ছিল কেবল লেনিনের ন্যায় একজন বিচক্ষণ নেতার। ইটালীর এই যুগসন্ধিক্ষণে উপযুক্ত নেতার আবির্ভাব হইল না, ফলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এই সুযোগ হাতছাড়া হইয়া গেল। ফ্যাসিষ্ট নেতা বেনিটো মুসোলিনী এই সুযোগ গ্রহণ করিলেন। তাঁহার রোম অভিযান ও রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ত করার ফলে ইটালীর ইতিহাসে এক অপ্রত্যাশিত সম্পূর্ণ নূতন পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। সমাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে ফ্যাসিষ্টতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল। ইতালীর নেতাদের মনে সংশয় ও সন্দেহ ঢুকিয়াছিল বলিয়াই তাঁহারা অকৃত-কার্য্য হইলেন; অপরপক্ষে, মুসোলিনীর এমন একটি প্রধান গুণ ছিল যাহা তাঁহাকে ত রক্ষা করিলই অধিকন্তু তাঁহার কণ্ঠে জয়মাল্য পরাইয়া দিল।

তাঁহার মনে দ্বিধা ও সংশয় ছিল না। ইহাই নেতৃত্বের প্রধান উপাদান।

আজ আমাদের নেতারা সন্দিগ্ধচিত্ত। ঐক্য ও শৃঙ্খলার সহজ বুলি শোনা যায় কিন্তু ইহাদের সহিত বাস্তবের কোন সম্পর্ক নাই। এইরূপ মোহকর বুলির কুহকে পড়িয়া তাঁহারা ভুলিতে বসিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ের বৃহত্তম প্রয়োজন হইতেছে জাতীয় সংগ্রামকে জয়যুক্ত করিতে সক্ষম এমন একটি বলিষ্ঠ ও আপোষহীন কর্মপন্থা। যাহাই আমাদিগের উদ্দেশ্যকে কার্য্যে পরিণত করিয়া তুলিতে সাহায্য করিবে তাহাকেই আমরা সাদরে গ্রহণ করিব এবং যাহা এই উদ্দেশ্যের পরিপন্থী তাহাকে নিঃসংশয়ে বর্জ্জন করিব। ঐক্য প্রতিষ্ঠার যে আকুতি দক্ষিণ পন্থীদের সহিত আমাদের সমন্বয়সাধনের প্রয়াসী তাহাকে কোনক্রমেই কল্যাণকর বলিতে পারি না। যদি সর্ব অবস্থায় ঐক্য সংস্থাপনই একমাত্র লক্ষ্য হয় তবে আমরা কংগ্রেসকে বরং নরমপন্থীদের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইতে পরামর্শ দিতে পারি।

এই সংকটসময়ে বামপন্থী মতবাদের চরম পরীক্ষা হইবে। যাঁহারা এই পরীক্ষায় অভাবগ্রস্থ বলিয়া প্রমাণিত হইবেন তাঁহারা কপট বামপন্থীরূপে পরিগণিত হইবেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের সভ্যদিগকে তাঁহাদের কার্য্য ও চিন্তাধারার মধ্য দিয়া ইহাই প্রমাণিত করিতে হইবে যে তাঁহারা বস্তুতঃই অগ্রগামী ও গতিশীল। এমনও হইতে পারে, আমরা আজ যে অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছি তাহাতে আজিকার দিনে যাঁহারা দক্ষিণ-পন্থী বলিয়া পরিচিত তাঁহারাই যথার্থ বামপন্থী বলিয়া প্রমাণিত হইবেন। বামপন্থী বলিতে কার্য্যক্ষেত্রে যাহারা বামপন্থী আমি তাহাদিগকেই বুঝিয়া থাকি।

আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের বর্তমান পর্য্যায়কে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পর্য্যায় বলিতে পারি। এই পর্য্যায়ে আমাদের প্রধান কর্তব্য সাম্রাজ্যবাদের বিলোপসাধন করা ও ভারতীয় জনগণের জন্য পূর্ণস্বাধীনতা

অর্জ্জন করা। স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইলে জাতীয় পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ হইবে—সেই যুগকে আমরা বলিব সমাজতন্ত্রের যুগ। আমাদের আন্দোলনের বর্ত্তমান ক্রমে যাঁহারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষ হীন সংগ্রাম চালাইবেন তাঁহারাই বামপন্থী বলিয়া অভিহিত হইবেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে সন্দেহ ও সংশয়ের প্রশ্রয় দিবেন এবং উহার সহিত আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করিবেন তাঁহারা কখনই বামপন্থী নহেন। আমাদের আন্দোলনের পরবর্ত্তী ক্রমে বামপন্থী ও সমাজতন্ত্রবাদ একার্থবোধক হইবে। সাম্রাজ্যবাদের সহিত সংঘর্ষে বামপন্থীরা যদি বলিষ্ঠ ও আপোষহীন নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে পারেন তবে তাঁহারাই ভবিষ্যৎ ভারতের ইতিহাস রচনা করিবেন।

যাঁহারা এখনও আপোষের কথা ভাবিতেছেন তাঁহাদের নিকট আয়রল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক ইতিহাস এবং ইঙ্গ-আইরিশ চুক্তির পরিনামফল বিশেষ শিক্ষাপ্রদ হইবে। এদেশে যদি সাম্রাজ্যবাদের সহিত কোনরূপ আপোষ সংঘটিত হয় তাহা হইলে বামপন্থীদের ভবিষ্যতে কেবল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেবাদের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে না, সাম্রাজ্যবাদের নবলব্ধ ভারতীয় মিত্রদের সহিতও সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আপোষ বিরোধী জাতীয় আন্দোলন সেক্ষেত্রে দারুণ অন্তর্যুদ্ধে পরিণত হইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভারতীয় মিত্রদের উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন হইতে আমি এই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিতেছি।”

ঊনত্রিশ

ফরওয়ার্ড ব্লকের আপোষ বিরোধী প্রচারকার্যে কংগ্রেস ও গান্ধীজী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পক্ষে জনমতের চাপ অনুভব করিলেন। কংগ্রেস আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের মুখোস খুলিয়া গেল। ভারতসচিব লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডের ঘোষণার উত্তরে গান্ধীজী কহিলেন—"I cannot conscientiously pray for the success of British arms if it means a further lease of life to India's subjection to foreign domination." রামগড় কংগ্রেসেই কংগ্রেসী নেতৃবর্গের সুর বদলাইয়া যায়। মূল প্রস্তাবে সুভাষচন্দ্রের চিন্তা ও কর্মপন্থার প্রভাব বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। কংগ্রেস প্রস্তাবের প্রয়োজনীয় অংশটি উদ্ধৃত করা গেল—"The Congress considers the declaration by the British Government of India as a belligerent country, without any reference to the people of India, and the exploitation of India's resources in this war as an affront to them, which no self-respecting and freeedom loving people can accept or tolerate. The recent pronouncements made on behalf of the British Government in regard to India demonstrate that Great Britain is carrying on her war fundamentally for imperialist ends and for the preservation and strengthening of her Empire, which is based on exploitation of the people of India, as well as of other Asiatic and African countries. Under these circumstances, it is clear that the Congress cannot, in any way, directly or

indirectly, be party to the war, which means continuance and perpetuation of this exploitation. The Congress, therefore, strongly disapproves of Indian troops being made to fight for Great Britain and of the drain from India of men and material for the purpose of the war. Neither the recruiting nor the money raised in India can be considered voluntary contributions from India. Congressmen, and those under the Congress influence, cannot help in the prosecution of the war with men, money or material."

এই প্রস্তাবে ভবিষ্যতের জন্য কোন সুনির্দ্দিষ্ট কর্মপন্থার নির্দেশ না থাকিলেও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার প্রতি ভারতবাসীর তীব্র অসন্তোষ ও অনাস্থা বলিষ্ঠ ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। কংগ্রেস নেতৃত্বের এই পরিবর্ত্তিত মনোভাবের জন্য ফরওয়ার্ড ব্লক অবশ্যই কৃতিত্ব দাবী করিতে পারে।

১৯৪০ সালে সুভাষচন্দ্র কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান পদে নির্বাচিত হন। রামগড়ে আপোষ-বিরোধী সম্মেলন হইতে ফিরিয়া আসিবার কিছুকাল পরেই সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে 'হলওয়েল মনুমেণ্ট' আন্দোলন আরম্ভ হয়। লালদীঘির কোণে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার নৃশংসতার অলীক কাহিনী বুকে লইয়া অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতিস্তম্ভ দণ্ডায়মাণ। ঐতিহাসিকের গবেষণার ফলে এই কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ইংরেজের গভীর দুরভিসন্ধিপ্রসূত ও স্বকপোল-কল্পিত বলিয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। বংলার শেষ স্বাধীন নবাবের নামে এই মিথ্যা কলঙ্কময় স্তম্ভ রাজধানীর বুক হইতে অপসারণের দাবী লইয়া ছাত্র-সমাজ ব্যাপকভাবে ধর্মঘট করে। সরকারী প্রতিরোধের মুখে কয়েকদিন

হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত আন্দোলন চলিতে থাকে। অবশেষে দমননীতির আশ্রয় লইয়াও যখন আন্দোলন বন্ধ করা গেল না তখন উক্ত মনুমেণ্ট অপসারিত করা হয়।

হলওয়েল মনুমেণ্ট আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বদিন ১৯৪০ সালের ২রা জুলাই একান্ত অপত্যাশিতভাবে ভারতরক্ষা আইনে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেফ্‌তার করা হয়। কিছুদিন পরে বিলাতের কমন্স সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে ভারতসচিব এমেরী ঘোষণা করেন যে হল্‌ওয়েল স্তম্ভ অপসারণের আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণের জন্যই সুভাচযন্দ্র কারারুদ্ধ হন। বন্দী অবস্থায় সুভাষচন্দ্র উপনির্ব্বাচনে ভারতীয় পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হন। জেলে থাকাকালীন সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে আরও দুইটি রাজদ্রোহের অভিযোগ আনীত হন। এক, ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতায় মহম্মদআলী পার্কে রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা প্রদান, অপরটি ১৯৩৯ সালের ১৪ই মে ফরওয়ার্ড ব্লক পত্রে The Day of Reckoning (হিসাব নিকাশের দিন) শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ।

আসল কথা, ইউরোপে যুদ্ধের অবস্থা তখন গ্রেটবৃটেনের প্রতিকূল। স্বাধীন ফ্রান্সের পতন হইয়াছে—গ্রেট বৃটেনও জার্মানীর কামানের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট দেখিলেন এই সময় সুভাষচন্দ্রকে বাহিরে রাখা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের ও যুদ্ধরত গ্রেট্‌-বৃটেনের পক্ষে বিপজ্জনক হইবে। কোন অজুহাতে তাঁহাকে আটক রাখাই এখন সরকারের আসল উদ্দেশ্য। কাজেই, বৎসরাধিক কালের পুরাতন অভিযোগ আনিয়া তাঁহাকে বিনাবিচারে কারাগৃহে বন্দী করিয়া রাখা হইল। অবশেষে ১৯৪০ খৃঃ ২০শে নভেম্বর সুভাষচন্দ্র অনশন ধর্ম্মঘট আরম্ভ করেন। অনশন ব্রত গ্রহণ করিবার পূর্বে তিনি বাংলার গভর্ণর, প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সহযোগী মন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে তাঁহার সিদ্ধান্ত জানাইয়া একখানি পত্র লিখেন। সুভাষচন্দ্র এই পত্রখানিকে "My Political

Testament" আখ্যা দিয়াছেন। সুভাষচন্দ্রের জীবনাদর্শের দিক হইতে এই পত্রখানির বিশেষ গুরুত্ব আছে। আমরা নিম্নে উহা হইতে কয়েকটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করিতেছি।—"বর্ত্তমান অবস্থায় আমার জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে। অবিচার ও অন্যায়ের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার সুযোগ গ্রহণ করা আমার পক্ষে আত্মমর্য্যাদাহানিকর। এভাবে জীবনকে ক্রয় করিবার পরিবর্ত্তে আমি জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যভাবে তাহার সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া আমাকে আটক রাখিতে বদ্ধপরিকর। ইহার বিরুদ্ধে আমি বলিতে চাই যে, আমাকে মুক্তি না দিলে আমি বাঁচিতে চাহি না। এভাবে বাঁচিয়া থাকা অথবা জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া সম্পূর্ণ আমার নিজের হাতে।"

"যদিও আমার মৃত্যুতে এখনই কোন বাস্তব ফল হইবে না তবুও কোন ত্যাগস্বীকারই বিফল হয় না। দুঃখ বরণ ও আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়াই যুগে যুগে, দেশে দেশে সমস্ত সংগ্রাম শক্তি ও প্রেরণা লাভ করে। সর্বদেশে সর্বকালে বীর শহিদের রক্তবিন্দু হইতেই ভবিষ্যৎ সংগ্রামের বীজ অঙ্কুরিত হয়।"

"এই মরজগতে সমস্তই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় কেবল আদর্শ, প্রেরণা ও বিশ্বাস বাঁচিয়া থাকে। একজনের আত্মত্যাগের আদর্শ সহস্রজনের মধ্যে নূতন প্রেরণা জাগাইয়া দেয়—সেই আদর্শ সহস্র জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠে। এই নিয়মেই বিবর্ত্তনশীল জগতে যুগ হইতে যুগান্তরে একের আদর্শ ও সাধনা সঞ্জীবিত ও সংক্রামিত হইয়া থাকে। দুঃখবরণ ও আত্মদান ব্যতীত কোন আদর্শ, কোন সংগ্রামই জয়যুক্ত ও সার্থক হয় না।"

"কোন আদর্শের বেদীমূলে জীবন বিসর্জ্জন অপেক্ষা মানবজীবনের আর কি কাম্য আছে? মানুষ যদি ত্যাগ ও কষ্টের দ্বারা পার্থিব জীবনে

কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে সে প্রতিদানে অমরজীবনের উত্তরাধিকারী হইয়া লাভবান হইবে। ইহাই আত্মার নীতি। জাতিকে বাঁচাইতে হইলে ব্যক্তির মৃত্যু চাই। ভারত স্বাধীন হইয়া গৌরবের সহিত যাহাতে বাঁচে সেজন্য আমাকে আজ মরিতে হইবে।"

"দেশবাসীর নিকট আমার অনুরোধ—ভুলিও না মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় অভিশাপ পরাধীন হইয়া থাকা। ভুলিও না অন্যায় ও অত্যাচারের সংগে আপোষ করা মহাপাপ। প্রকৃতির এই নিয়ম মনে রাখিও—কোন কিছু পাইতে হইলে অগ্রে কিছু দান করা প্রয়োজন। আরও মনে রাখিও জীবনের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ, যে কোন মূল্য দিয়াই অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করা।"

কর্তৃপক্ষ বুঝিয়াছিলেন, ইহা সুভাষচন্দ্রের কেবলমাত্র ভীতি প্রদর্শন নহে—ইহার মধ্যে যশ ও সুখ্যাতি অর্জ্জন করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নাই। যে জীবনাদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়া সুভাষচন্দ্র আজীবন দুঃখও নির্যাতন সহ্য করিয়া অবিরাম সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছেন ইহা সেই জীবনাদর্শ-প্রণোদিত স্থির সিদ্ধান্ত। সুভাষচন্দ্র মৃত্যুপণ করিয়া অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্কল্প হইতে কিছুতেই যে তাঁহাকে নিবৃত্ত করা যাইবে না সরকার ইহা ভাল ভাবেই জানিতেন। অবশেষে যখন অনশনের ফলে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের অবস্থা গভীর উদ্বেগের সঞ্চার করিল তখন ৫ই ডিসেম্বর সরকার বাহাদুর সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দিতে বাধ্য হইলেন।

সুভাষচন্দ্রকে কারাগৃহ হইতে মুক্তি দিয়া সরকারের দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে এই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক ব্যক্তিটিকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও কাজকর্ম করিতে দিলে সাম্রাজ্যবাদের নিরঙ্কুশ শোষণ-শাসন যে অব্যাহত ভাবে চলিতে পারিবে না—যুদ্ধ প্রচেষ্টা যে ব্যাহত হইতে পারে, এই আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া সরকার বাহাদুর সুভাষচন্দ্রকে স্বগৃহে অন্তরীণ অবস্থায় থাকিবার আদেশে জারী করিলেন।

অন্তরীণাবস্থায় ধ্যান-ধারণা ও যোগচর্চ্চায় সুভাষচন্দ্রের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন—আত্মীয় স্বজনের সংগে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া দিলেন। কেশ ও শ্মশ্রুগুম্ফাদি ধারণ করিয়া যোগীর ন্যায় কঠোর তপশ্চর্য্যায় নিমগ্ন রহিলেন। সকলেই ভাবিল, গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দয় অত্যাচার ও ক্রমাগত কারাবাস তৎসঙ্গে কংগ্রেসী বড় কর্ত্তাদের অশোভন ব্যবহার কর্মজীবনের প্রতি তাঁহাকে বীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। কাজেই, ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী তাঁহার রহস্যজনকভাবে অন্তর্দ্ধানের খবর প্রকাশিত হইলে সকলেই নিঃসন্দেহে ধরিয়া লইল যে, শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় সুভাষচন্দ্রও রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়াছেন।

নিঃস্ব ও নির্য্যাতিত ভারতবাসীর দুঃখ ও দুর্দ্দশা মোচনের দুর্বার আকাঙ্ক্ষার অপেক্ষা শেষে কি সুভাষচন্দ্রের জীবনে কৈশোরের স্মৃতি-বিজড়িত হিমালয়ের নির্জ্জন ও অনাসক্ত জীবনের আকর্ষণই প্রবলতর হইল? এই প্রশ্নের উত্তর মিলিল ১৯৪২ সালের ২৮শে মার্চ্চ। বিশ্বদূত রয়টার সংবাদ দিলেন—"টোকিও রেডিওতে বলা হইয়াছে যে, সুভাষচন্দ্র স্বাধীন ভারত কংগ্রেসে যোগদানের জন্য টোকিও যাইবার পথে জাপানের উপকূলে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন।" পরদিনই রয়টার জানাইলেন, এই সংবাদ ভুল—সুভাষচন্দ্র জীবিতই আছেন। কিয়ৎকাল পরে বোম্বাই ক্রনিকল্ এর লণ্ডনস্থিত সংবাদ-দাতার সংবাদে প্রকাশ পাইল, সুভাষচন্দ্র বার্লিনে আছেন। জার্মানীর ডিক্টেটর হের হিটলার তাঁহাকে "India's Fuehrer and Excellency" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন ও পররাষ্ট্রদূতের মর্য্যাদা ও সম্মান দিয়াছেন। জার্মানীতে থাকাকালীন সুভাষচন্দ্র ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের সংগঠিত করিয়া জাতীয় বাহিনী গঠন করেন। অতঃপর সেখান হইতে তিনি পূর্ব্বএশিয়াস্থ ভারতীয় স্বাধীনতালীগের সভ্যবৃন্দের আহ্বানে সিঙ্গাপুরে পৌছেন। এইখানেই

আরম্ভ হইল তাঁহার জীবনের এক বিচিত্র ও গৌরবময় অধ্যায়। কংগ্রেসের নেতা হিসাবে, অহিংস সংগ্রামের সৈনিক হিসাবে, আপোষ-বিরোধী বিপ্লবী হিসাবে যিনি ভারতীয় গণ-নায়কদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারিতেন আজ তাঁহারই নেতৃত্বে ও সংগঠনে গড়িয়া উঠিল স্বাধীন ভারত-বাসীর গভর্ণমেণ্ট ও সামরিক শক্তি। সমস্ত পৃথিবী বিস্ময়চকিত হইয়া দেখিল—রাইফেল হস্তে ভারতীয় ফৌজ তাহাদের স্বাধীন গভর্ণমেণ্টকে রক্ষা করিতেছে—মাতৃভূমির মুক্তির জন্য মৃত্যুপণ করিয়া লড়িতেছে।

কঠিন বিপদ তুচ্ছ করিয়া, নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া, দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া সেই আজীবন বিপ্লবী অকুতোভয়ে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদনে চলিলেন। যেদিন কারাগারে সুভাষচন্দ্র উপলব্ধি করেন যে কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ সংগ্রামেই দেশ স্বাধীন করা যাইতে পারে না সেইদিনই তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির হইয়া গেল।

ত্রিশ

সম্প্রতি উত্তমচাঁদ কর্ত্তৃক সুভাষচন্দ্রের ভারত ত্যাগ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকেই এই বৃত্তান্ত সত্য ঘটনা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। আবার এই বিষয়ে অনুরূপ বহু গুজব ও জনশ্রুতিও সংবাদ-পত্র মারফৎ প্রচারিত হইয়াছে। সে যাহাই হউক, একমাত্র সুভাষচন্দ্র ব্যতীত এই রহস্যের চূড়ান্ত সমাধান কেহই করিতে পারিবেন না। দেশবাসী স্বয়ং নেতাজির মুখ হইতেই তাঁহার দুঃসাহসিক অভিযানের রোমাঞ্চকর কাহিনী জানিতে পারিবে—এই আশায় আমরা এই বিষয়ে আলোচনায় ক্ষান্ত রহিলাম।

উত্তমচাঁদ বর্ণিত সুভাষচন্দ্রের ভারত ত্যাগের বৃত্তান্ত পড়িয়া আমরা জানিতে পারি যে, রাশিয়া যাওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। উত্তমচাঁদ ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে এই বিষয়ে যে আলোচনা হয় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

একদিন কথা প্রসঙ্গে বোসবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহার মস্কো যাইবার আসল উদ্দেশ্য কী? তদুত্তরে তিনি বলিলেন—'বর্ত্তমান সময়ে রাশিয়া ও জার্মানী পরস্পর অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ। জার্মানী বৃটেনের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত। রাশিয়াও বৃটেনের শত্রু। মস্কো যাইয়া ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রচারকার্য চালাইবার এখনই উপযুক্ত সময়।'

আমি কহিলাম, রাশিয়ার সহিত জার্মানীর বর্ত্তমানে চুক্তি রহিয়াছে বটে কিন্তু উহাদের মধ্যে আদর্শগত মিল আদৌ নাই। বন্ধুত্বের আড়ালে এখনই যে উভয় দেশে যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে না, সে কথাই বা কে বলিতে পারে? সেক্ষেত্রে রাশিয়ানরা কি আপনাকে ব্রিটীশের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইতে দিবে? উত্তরে বোসবাবু বলিলেন, 'হয়ত জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে মিত্রতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না; হয়ত তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিবে। ...জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে ভিতরে ভিতরে একটী বৈরীভাব থাকিলেও ইংরাজরাও তো কিছু রাশিয়ার বন্ধু নয়। কাজেই আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, রাশিয়ানরা আমাকে ইংরাজদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইতে দিবে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি মনে করেন, শুধু প্রচারকার্য্যের দ্বারাই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারিবে? বোস বাবু বলিলেন, 'আমার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস যে, রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের দ্বারা ইংরাজদের তাড়াইয়া না দিলে তাহারা কখনই ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া যাইবে না। তাহারা কখনই কোন দেশকে শান্তভাবে স্বাধীনতা দেয় নাই। আয়ারল্যাণ্ডের কথাই ভাবুন না কেন? মনে রাখিবেন

আইরিশরা ইংরাজদের জ্ঞাতি। তথাপি সাত শত বৎসর সংগ্রাম ও দুঃখ ভোগের পর আয়ারল্যাণ্ড যখন স্বাধীনতা অর্জ্জন করিল, তখনও ইংরাজরা আয়ারের কিয়দংশ নিজেদের জন্য রাখিয়া দিল। কাজেই তারা স্বেচ্ছায় ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইবে কিরূপে? একথা সত্য যে বিদেশে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচার কার্য্যের দ্বারাই স্বাধীনতা লাভ হইবে না। কিন্তু এক্ষণে তাহারা জীবন মরণ সংগ্রামে লিপ্ত—আমার প্রচারকার্য্য নিশ্চয়ই তাহাদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করিবে।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তাহ'লে আপনি কি মনে করেন যে আয়রল্যাণ্ডে যেরূপ বিপ্লব হইয়াছিল ভারতবর্ষে সেরূপ বিপ্লব ঘটিতে পারে না? তিনি কহিলেন—'ইংরাজরা ভারতবর্ষের যে অবস্থা করিয়াছে তাহাতে ঐরূপ বিপ্লব সম্ভব নয়। তাহাদের ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করা যাইতে পারে এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করাও দুঃসাধ্য। আবার, কোন বৈদেশিক শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে ঐরূপ বিপ্লব সৃষ্টি করাও সম্ভব নয়। এমন কি রুশ বিপ্লবের পশ্চাতেও ছিল জার্মানরা—ফরাসীদের সহায়তায়ই আমেরিকা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার কথার তাৎপর্য্য কি ইহাই যে, আপনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য রাশিয়ার সাহায্য সংগ্রহ করিতে যাইতেছেন? বোসবাবু বলিলেন—'হ্যাঁ, ইহাই আমার আসল উদ্দেশ্য। রাশিয়ানরা যাহাতে আমাদের সাহায্য করিতে সম্মত হয়, তাহার জন্যই আমি চেষ্টা করিব। এই চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও ইংরাজদের বিরুদ্ধে সব সময়ই আমি প্রচারকার্য্য চালাইয়া যাইতে পারিব। কিন্তু আমি যদি ভারতে পড়িয়া থাকিতাম তাহা হইলে যতদিন যুদ্ধ চলিত সরকার ততদিন আমাকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিত। আমার স্থির বিশ্বাস দেশের বড় বড় নেতারা সকলেই কারারুদ্ধ হইবেন। জেলখানায় বসিয়া পচা অপেক্ষা দেশের স্বাধীনতার জন্য যতটুকু পারি তাহার জন্য পলায়ন করাই আমি ভাল

মনে করিলাম।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এখান হইতে যদি আপনাকে সরাসরি মস্কো যাইতে না দেওয়া হয় তবে আপনি কি করিবেন? তিনি বলিলেন, 'যাইবার পথে প্রথমেই আমি মস্কোতে নামিয়া সেখানে থাকিয়া যাইবার জন্যই চেষ্টা করিয়া দেখিব। যদি না পারি বার্লিন ও রোমের রুশদূতের মারফৎ ব্যবস্থা করিব। ঐ সকল স্থানে দূতাবাসের সহিত সহজেই যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। কাজেই ভরসা হয়, কোন-না-একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করিয়া উঠিতে পারিব। যে ভাবেই হোক, শীঘ্রই মস্কোয় পৌঁছিতে পারিব বলিয়া আশা করি।'

চক্রশক্তি তাঁহাকে মস্কো যাইতে দিবে কিনা সে বিষয়ে আমি সন্দেহ প্রকাশ করিলাম। চক্রশক্তি যদি এ সময়ে তাঁহার ন্যায় প্রভাবশালী কোন ভারতীয়কে পায় তবে তাঁহাকে রাশিয়ার কাজে লাগাইতে না দিয়া নিজেদের কাজে লাগাইবার চেষ্টাই করিবে। বোসবাবু বলিলেন—'চক্রশক্তি যে আমাকে সহজে রাশিয়ানদের হাতে ছাড়িয়া দিবে না একথা আমিও জানি। তবুও আমি মস্কো যাওয়ার জন্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। বর্ত্তমান সময়ে একমাত্র রাশিয়াই ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা অর্জ্জনে সাহায্য করিতে পারে। অপর কোন দেশই আমাদিগকে সাহায্য করিবে না। এই জন্যই আমি মস্কো ছাড়া অন্য কোথাও যাইতে চাহি না। এই যুদ্ধের মধ্যেই যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে না পারে তবে আর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে না। অবশ্য যদি তাঁহার পূর্ব্বেই কোন সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটিত হয়, তবে সে কথা স্বতন্ত্র।'

উত্তমচাঁদ বর্ণিত সুভাষচন্দ্রের অন্তর্দ্ধান কাহিনী হইতে আমরা জানিতে পারি, রাশিয়ান দূতাবাসের সহিত মস্কো যাইবার ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে না পারায় অগত্যা সুভাষচন্দ্র ইতালিয়ান দূতাবাসের সহিত কথা-বার্ত্তা বলেন। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও তিনি মস্কো যাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন নাই। প্রথমেই ভগৎরাম ওরফে রহমৎ খাঁর মুখে শুনিতে পাই—"আমরা চক্রশক্তির

একটির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছি বটে কিন্তু বোসবাবু বার্লিন বা রোমে যাইতে ইচ্ছুক নহেন।" এই প্রসঙ্গ উঠিলেই সুভাষচন্দ্র বলিতেন —'আমি মস্কো ছাড়া অন্য কোথাও যাইতে চাহি না।' উত্তমচাঁদ যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—যদি মস্কো যাওয়ার ইচ্ছাই থাকে তবে ইতালীয়ানদের শরণ লইলেন কেন? সুভাষচন্দ্র বলিলেন—'মস্কো যাওয়ার ইচ্ছা আমি ছাড়ি নাই। বাধ্য হইয়াই ইতালীয়দিগের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছি।' তিনি আরও বলিলেন—'এখন এখান হইতে ইউরোপ যাইবার একটি মাত্র পথ রহিয়াছে, তাহা হইতেছে মস্কোর পথ। হয় আমি মস্কো নামিব, না হয় বার্লিন বা রোমস্থিত রুশ দূতের সহিত ব্যবস্থা করিয়া মস্কোতে ফিরিয়া আসিব। * * ইতালীয়ানদের সহিত সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হইয়া যাওয়ার পরও যদি রাশিয়ানরা আমাকে আশ্রয় দিতে রাজি হয় তাহা হইলে আমি আমার ব্যবস্থা বদল করিব।' এমনকি বুখোর পথে আফগান সীমান্ত অতিক্রম করিয়া থাঙ্গো নদী পার হইয়া সর্বাপেক্ষা বিপদসঙ্কুল ও দুর্গম পথে মস্কো যাইতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। অবশেষে যখন ইতালীয়ানরা সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে তখনও তিনি এই বলিয়া তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করিলেন, 'মস্কোতে যাওয়াই আমি সর্ব্বাগ্রে কামনা করি; তবে এই স্থান অপেক্ষা রোম বা বার্লিন হইতে মস্কো যাওয়াই সহজ হইবে।'

একত্রিশ

সুভাষচন্দ্রের সাধনা ও রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা—সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ নির্ণয় করিতে হইলে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীজি ও সুভাষচন্দ্রকে পাশাপাশি রাখিয়া আলোচনা করা প্রয়োজন। বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, রাজা গোপাল আচারিয়া, এমন কি, জওহরলাল নেহরু প্রভৃতি সর্বভারতীয় প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দ

গান্ধীজির ব্যক্তিত্বের চৌম্বক প্রভাবে পড়িয়াই ভারতের মুক্তি সংগ্রামে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের বেলায় এই কথা প্রযোজ্য নয়। বিভিন্ন পরিবেশ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনে দীক্ষার কারণ। মহাত্মাগান্ধী যখন সক্রিয়ভাবে কংগ্রেসে যোগদান করেন নাই, ১৯১৫-১৯১৯ সনের সেই সময়েই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য নির্দিষ্ট হইয়া যায়। পিতৃদেবের সন্তোষ বিধানের জন্যই কেবল তিনি আই-সি-এস পরীক্ষা দিয়াছিলেন। "কোন প্রকার আপোষ না করিয়া বৈদেশিক শাসনের উচ্ছেদ ও ভারতের মুক্তি-সাধন"—তাঁহার জীবনের এই লক্ষ্য যৌবনারম্ভেই নির্দিষ্ট হইয়া যায়। ১৯১৯ সালে অমৃতসর কংগ্রেসে গান্ধীজি যখন ব্রিটিশের সহিত সহযোগিতার জন্য আবেদন জানাইতেছিলেন, তখনই সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ সরকারের সহিত সহযোগিতা বর্জন করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের সংগ্রামপন্থার কল্পনা করিতেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীই অন্যান্য জননায়কদের রাজনৈতিক জীবনের দীক্ষাগুরু। তাই, সম্পূর্ণভাবে গান্ধীজির মত ও পথ অনুমোদন ও অনুসরণ তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সুভাষচন্দ্র রাজনীতিতে যোগদান করিয়াছেন—জীবন দেবতার দুর্বার আহ্বানে। অতএব রাজনৈতিক জীবনের সর্বক্ষণে সুভাষচন্দ্র নিজের সচেতন আদর্শ, প্রত্যয়, বিচারবুদ্ধি অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছেন—ইহাই স্বাভাবিক। এই কারণেই বহুক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির মত ও পথ স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহার রাষ্ট্রিক জীবনের ভাবনা ও প্রেরণা গান্ধীজির আদর্শ হইতে মূলতঃ পৃথক। এই দুই রাষ্ট্রবীরের রাজনীতি ও কর্মজীবনের উৎস বিভিন্ন বলিয়াই ভারতের বিভিন্ন সমস্যায় মৌলিক বিষয়ে ইঁহারা কেহই স্বকীয় আত্মপ্রত্যয়, মূলনীতি ও বিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারেন নাই। গান্ধীজিকে সুভাষচন্দ্র শ্রদ্ধার মহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু নিজের বিবেক ও বিশ্বাসকে তিনি মহত্তর ও উচ্চতর আসনে স্থাপিত করিয়াছেন।

২১শে অক্টোবর ১৯৪৩ সাল সোনানে আজাদ হিন্দ সরকার
প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে নেতাজীর প্রতিকৃতিসহ জনতার দৃশ্য

ইংলণ্ডে থাকাকালে আয়ারল্যাণ্ডের সিন্ ফিন্ আন্দোলন তাঁহার চিত্তে গভীর রেখাপাত করে। আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তখনকার সময়ে সিন্ফিনদল বামপন্থী ছিল; "পূর্ণ স্বাধীনতা" ছাড়া কিছুই গ্রহণ করিতে তাহারা স্বীকৃত হয় নাই। ক্ষুদ্র দল হইলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রবল অন্দোলনের সৃষ্টি করিতে তাহারা সর্ববিধ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। জগতের সমস্ত সাফল্যমণ্ডিত বিপ্লব-আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি অনুধাবন করিয়া সুভাষচন্দ্র রাজনীতিক্ষেত্রে কঠোর বাস্তববাদী হইয়া উঠেন। জগতের সার্থক বিপ্লব-আন্দোলন আলোচনায় দেখা যায় যে, সর্বক্ষেত্রেই মুষ্টিমেয় বামপন্থীদের সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও আপোষ-বিহীন সংগ্রাম-নিষ্ঠার বলেই আন্দোলন সফল হইয়াছে। তাই, সুভাষ-চন্দ্রকে বামপন্থীদলের আদর্শ নায়ক হিসাবেই আমরা দেখিতে পাই।

১৯০৫ সালের গৌরবময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ সন্তান, দেশসেবার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত সুভাষচন্দ্র ১৯২১ সালে ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িবার দুর্বার বাসনায় পূর্বাপর বিভিন্ন পর্য্যায় বুঝিয়া লইবার জন্য গান্ধীজির নিকট গমন করেন। এই প্রথম সাক্ষাৎকারেই ভারতের রাজনীতিতে দুই স্বতন্ত্র আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির সংঘর্ষ প্রতিভাত হয়। ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার "সত্য" "অহিংসা" "প্রেম", "ন্যায়", ইত্যাদি দার্শনিক আলোচনা ও সমস্যার উপর অতিরিক্ত মাত্রায় গান্ধীজি জোর দেওয়ায় সুভাষচন্দ্র মুশ্কিলে পড়েন। গান্ধীজি প্রবর্ত্তিত অহিংস সংগ্রাম পদ্ধতির উপযোগিতা সুভাষচন্দ্র নিঃসংশয়ে উপলব্ধি ও স্বীকার করেন। গান্ধীজির অহিংস নীতির উপর সুভাষচন্দ্রের সন্দেহ জন্মে নাই। কিন্তু, গান্ধীজির বিশিষ্ট রাজনৈতিক দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি, নীতিশাস্ত্র ও রাজনীতির মিশ্রণ, এক কথায় রাষ্ট্রিক আন্দোলনে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তির অত্যুগ্র আমদানী—ইহাতে সুভাষচন্দ্রের মনে বিশেষ খট্কা ও সন্দেহের সৃষ্টি হয়। গান্ধীজির সহিত প্রথম সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা

বর্ণনা প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বলেন—"আমার মনে হইল, গান্ধীজি যে পরিকল্পনা নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার মধ্যে স্পষ্টতার শোচনীয় অভাব আছে—যে সংগ্রাম ভারতকে স্বাধীনতার বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌছাইয়া দিবে, তাহার সম্বন্ধে গান্ধীজির নিজেরও সুস্পষ্ট ধারণা নাই।" পরবর্ত্তীকালে গান্ধীজির রাজনৈতিক মতবাদ বিশিষ্ট জীবনবাদে পরিণতি লাভ করিয়াছে, বাস্তববাদী সুভাষ ও আদর্শবাদী গান্ধীজির মতান্তরও অপনীত হয় নাই। শাসকের অত্যাচার, নির্য্যাতন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিশেষ ধরণের গণ-আন্দোলন হিসাবেই গান্ধীজি প্রথমতঃ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance) আন্দোলন প্রবর্ত্তন করেন—কিন্তু "এই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ" নীতিকেই তিনি এখন "অহিংসার ক্রীডে" (Creed of Non-violence) পরিণত করিয়াছেন। গণ-অন্দোলনের অভিনব কৌশল হিসাবে অহিংস নীতিতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। সুভাষচন্দ্রও "সত্যাগ্রহ অন্দোলনের" সার্থকতা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। রাজনৈতিক কার্যক্রমে "খাদি"র বিশিষ্টস্থান আছে—বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতীক হিসাবে "খাদি" র মর্য্যাদা সর্বস্বীকৃত—জনগণের চিত্তে "চরখা" আত্মপ্রত্যয়, আত্মসম্মান, ও আত্মনির্ভর জাগাইয়া তুলিয়াছে—ইহাও স্বতঃস্পষ্ট। কিন্তু এই সব বস্তুকে রাজনৈতিক সমস্যার সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশাইয়া ফেলা ও রাজনৈতিক দরকষাকষির বেলায় অত্যুদার সাধুতা প্রদর্শন—মহাত্মা গান্ধীর এই নীতি ও আচরণ আধুনিক মনের নিকট দুর্বোধ্য।

বাস্তববাদী সুভাষচন্দ্র অহিংসাকে নীতি হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। বিচ্ছিন্ন হিংসআন্দোলন দ্বারা যে কোন সুফল লাভ হইবে না—ইহা তিনি উত্তমরূপেই বুঝিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইহাও মনে করিতেন যে, শত্রুকে অপদস্থ করিবার ও বেকায়দায় ফেলিবার মত যথেষ্ট কূটনীতিজ্ঞান ও দূরদৃষ্টি সেনাপতির থাকা চাই—আবার ইহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অনুকূলে

বিশ্বের জনমত গঠন কল্লে আন্তর্জাতিক প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতে হইবে—তবেই এই অহিংস সংগ্রাম সাফল্য লাভ করিবে। উপযুক্ত সময়েই যদি অহিংস গণ-আন্দোলন পরিচালিত হয়, তবে ইহার দ্বারাই স্বাধীনতার চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়। অহিংস সংগ্রামকে সুভাষচন্দ্র এই ভাবেই দেখিয়াছেন। কিন্তু, উপযুক্ত পরিমাণে চরখা কাটিয়া দেশ প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া যদি গান্ধীজির মনে হয়, তবেই তিনি অহিংস অন্দোলন সুরু করিবেন—ইহাই গান্ধীজির নীতি। ব্রিটেনের সহিত আলোচনায় ও ব্যবহারে গান্ধীজি আন্তরিকতাপূর্ণ বন্ধুত্ব, উদারতা, অকপটতা, বিশ্বাস, আশা ও প্রেম প্রদর্শন করিয়া অহিংস সংগ্রামনীতির আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে চাহেন। পরাধীন ভারতের মুক্তিসাধনায় গান্ধীজি রাষ্ট্রনায়কের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন—কিন্তু নৈতিক ও নীতিধর্ম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিশ্বকল্যাণ ব্রত গ্রহণ করিয়া তিনি বিশ্ব-প্রচারক প্রফেট হইয়াছেন। গান্ধীজির জীবনের এই দ্বৈত উদ্দেশ্যই ভারতের রাজনৈতিক মুক্তিসাধনায় তাঁহার নেতৃত্বের মধ্যে বিশেষ দুর্বলতা ও ত্রুটির সৃষ্টি করিয়াছে। তাই সুভাষচন্দ্র মহাত্মাজী সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

"Whenever he talks to his people about Sworajya, he does not dilate on the virtues of Provincial Autonomy or Federation, he reminds them of the glories of Roma-Rajya (the Kingdom of Rama of old.) and they understand. And when he talks of conquering through love and Ahimsa (non-violence), they are reminded of Buddhas and Mohavira and they accept him······In many ways he is altogether an idealist and a visionary. The instinct or judgment, so necessary for political

bargaining, is lacking in him. Whenever he does go in for a bargain, as we shall see in 1931, he gives more than he takes ; on the whole, he is no match in diplomacy for an astute British Politician."

সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করিতেন, সংগ্রামমূলক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিলেই কেবলমাত্র ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান সাম্প্রদায়িকতার প্রতিরোধ করা যাইবে। সাইমন কমিশন বয়কট ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ই একমত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ভিত্তিতে গণ-আন্দোলন আরম্ভ করিবার জন্য সুভাষচন্দ্র গান্ধীজিকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। সেই সময়ে নেহ্রু রিপোর্ট-কথিত "ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস্" প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করুক গান্ধীজি এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। সুভাষচন্দ্র এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। এই সময়েই সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির নীতির বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম খোলাখুলি বিদ্রোহ প্রকাশ করেন। ১৯২৯ সালে লর্ড আরুউইন ভারতীয় নেতাদিগকে লইয়া "গোল টেবিল বৈঠক" (Round Table Conference) আহ্বানের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। গান্ধীজি এই প্রস্তাবে ব্রিটিশের সহিত সহযোগিতা করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। সুভাষচন্দ্র এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া সহযোগিতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি বলিয়াছিলেন, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ইহা এক নূতন ফাঁদ। পরবর্ত্তীকালে সুভাষচন্দ্রের আশঙ্কাই সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হয়। লাহোর কংগ্রেসেও সুভাষচন্দ্র "প্রতিদ্বন্দ্বী গভর্ণমেণ্ট (Parallel Government) স্থাপন করিয়া আন্দোলন সুরু করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাঁহার সেই প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হয়। অবশেষে ১৯৩০ সালে গান্ধীজি লবণ আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করিতে বাধ্য হন। বামপন্থী দলের তীব্র চাপেই

গান্ধীজি গণ-আন্দোলন আরম্ভ করেন। গান্ধীজি বরাবরই আপোষ-রক্ষার জন্য আগ্রহশীল। লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করা হইলেও "স্বাধীনতার সার" (Substance of Independence) পাইলেই গান্ধীজি আপোষ করিবেন—এই মর্মে ১৯৩০ সালের ৩০শে জানুয়ারি গান্ধীজি এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। এই বিবৃতিতে স্বাধীনতার সার বলিয়া যে ১১ দফা দাবি করা হয় তাহা হইতে বুঝা যাইবে গান্ধীজির মনোভাব মূলতঃ সস্কার-পন্থী (Reformist)। গান্ধীজির সহিত সুভাষচন্দ্রের যে সংঘর্ষ তাহা মূলতঃ "সংস্কার-পন্থী" আদর্শের সহিত বৈপ্লবিক আদর্শের সংঘর্ষ।

১৯৩১ সালের ৪ঠা মার্চ গান্ধী-আরুইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আন্দোলন চলিতে থাকা সত্ত্বেও আন্দোলনের এইরূপ অকাল পরি-সমাপ্তিতে সুভাষচন্দ্র তীব্র অসন্তোষ জ্ঞাপন করেন। গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিয়া গান্ধীজি হতাশচিত্তে বলেন "আমি দেখিলাম, এই বৈঠকে যে সকল প্রতিনিধি মনোনীত হইয়া আসিয়াছেন তাহারা দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধি নহেন—সরকারের স্বার্থে সরকার মনোনীত প্রতিনিধি"। বৈঠকে যোগদান করিয়াগান্ধীজি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন. করাচী কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়ে আহূত নিখিল ভারত নও-জোয়ান ভারত সভায় সভাপতির আসন হইতে সুভাষচন্দ্র অনুরূপ আশঙ্কাই জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্রের আশঙ্কাই ফলিয়া গেল। কাজেই আমরা দেখিতেছি, সুভাষচন্দ্র যে কোন সমস্যার প্রারম্ভেই বাস্তব ও দূরদৃষ্টি সহায়ে যে অভিমত জ্ঞাপন করেন, শেষ পর্য্যন্ত তাহাই ঘটে ও গান্ধীজিও তাহাই স্বীকার করিয়া লন। ১৯৩৩ সালের মে মাসে গান্ধীজি দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলন ছয় সপ্তাহের জন্য প্রত্যাহার করেন। পরে তিনি আরও ছয় সপ্তাহের জন্য ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করিয়া ব্যক্তিগত আইন অমান্য

আন্দোলন সমর্থন করিতে থাকেন। কিন্তু কিছুদিন পরে এই ব্যক্তিগত নিরুপদ্রব আইন অমান্য আন্দোলনও থামিয়া যায়। পরে গান্ধীজির পরামর্শে সমস্ত কংগ্রেস সংগঠনগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। গান্ধীজি কারণ দেখাইলেন—ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলনকালে গুপ্ত আন্দোলন কৌশল গ্রহণ করিয়া কংগ্রেসকর্মীরা সঙ্ঘগুলিকে দুর্নীতি যুক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। সংগ্রামকালে সমস্ত প্রতিষ্ঠানই গুপ্ত পন্থা অবলম্বন করে,—সংগ্রামশীলতা বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য গুপ্ত আন্দোলনই সংগ্রামের প্রাণ। কিন্তু গান্ধীজির কর্মপন্থায় গুপ্ত আন্দোলন বা কোন-প্রকার গোপনতার স্থান নাই। রাজনীতিতে গোপন কৌশল তিনি সমর্থন করেন না। শত্রুর সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াও শত্রুর নিকট সমস্ত কিছুই প্রকাশ্য ও প্রকাশিত রাথাই তাঁহার নীতি।

এই সময়ে ভিয়েনা হইতে সুভাষচন্দ্র ও বিঠলভাই প্যাটেলের এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয়। উহাতে বলা হয়, "আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, রাজনৈতিক নেতা হিসাবে মহাত্মাজি ব্যর্থকাম হইয়াছেন। বর্ত্তমানে কংগ্রেসদের মধ্যে আমূল পরিবর্ত্তন পন্থী (Radical) প্রতিষ্ঠান গঠনের সময় নূতন নেতার অনিবার্য্য প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। কারণ আজীবন অনুসৃত জীবন-নীতির বিরোধী কোন কর্মপন্থা গান্ধীজি গ্রহণ করিবেন ইহা আশা করা যায় না।" এই সময়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সমাজতান্ত্রিক দল বা "সোশ্যালিষ্ট পার্টি" গঠিত হয়। মার্ক্সের চিন্তাধারা ও রাশিয়ার সোভিয়েট রিপাব্লিকের মতবাদ এই দল গঠনের বিশেষ প্রেরণা যোগায়। সুভাষচন্দ্রও সোশ্যালিষ্ট পার্টির আদর্শের সমর্থন করেন। কিন্তু তাঁহার মতে, সমাজতন্ত্র আদর্শ ভারতের আশু প্রয়োজন নহে। ভারতের পক্ষে আশু ও অবিলম্বে স্বাধীনতা অর্জনই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কাজেই সমাজতন্ত্র আদর্শ অসময়ে টানিয়া আনিয়া সুভাষ-চন্দ্র স্বাধীনতা অর্জনের সর্বপ্রধান সমস্যাকে অযথা জটিলতর করিতে

চাহেন নাই। সুভাষচন্দ্র সমস্ত "ইজম (ism)" কে ইচ্ছা করিয়াই পরিহার করিয়া ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহার আদর্শবাদ (idealogy) বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—তাঁহার আদর্শ "Leftism" (বামপন্থী)। ১৯৪০ সালে মার্চ মাসে রামগড়ে আপোষ বিরোধী সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র বলেন—"বামপন্থী বলিতে আমরা কি বুঝি সেই সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। বর্ত্তমান যুগ আমাদের আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্তর। অনতিবিলম্বে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করা ও ভারতের জনগণের জন্য জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করা এই যুগে আমাদের কর্ত্তব্য। স্বাধীনতা আনিলে, জাতীয় পুনর্গঠনের যুগ হইবে আমাদের আন্দোলনের সমাজতান্ত্রিক স্তর। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম যাঁহারা পরিচালনা করিবেন তাহারাই প্রকৃত বামপন্থী।" নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের দ্বিতীয় সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র বলেন, ভারতীয় বিপ্লব "রক্তাক্ত বিপ্লব" হইবে না। এই বিপ্লব যথাসম্ভব শান্তিপূর্ণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। জনগণ স্বাধীনতা অর্জনে ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেই শান্তিপূর্ণ পরিবর্ত্তন সুনিশ্চিত হইবে।"

সুভাষচন্দ্র তথাকথিত মার্কস্‌বাদী (Morxist) ছিলেন না। তিনি দেশ-কাল অনুযায়ী মার্কস্‌বাদকে সংশোধিত করিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। জমিদারীপ্রথার বিলোপসাধন, ভূমির জাতীয়করণ, কৃষি ও শ্রমিকদিগের উন্নতির জন্য রাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার ব্যবস্থা এইসব তিনি চাহিয়াছেন। তিনি চাহিয়াছেন, শ্রমিক ও কৃষকের একটি শক্তিশালী দল ক্ষমতা অধিকার করিয়া পরিবর্ত্তনকালে কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার পরিচালনা করিবে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমন্বয় প্রতিভার সমস্ত আধুনিক মঙ্গলজনক ও প্রগতিশীল রাষ্ট্রিক আদর্শের কল্যাণময় নীতিই ভারতীয় পরিবেশে ও সংস্কৃতিরাগে রঞ্জিত হইয়া আদর্শ ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র দর্শনের সৃষ্টি হইবে। এই একান্ত অভিলাষ ও সাধনমন্ত্রেই সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন।

কী করিয়া শৃঙ্খলাপরায়ণ ও সুসংগঠিত সেনাবাহিনীর বিরাট ক্ষমতাবলে একটা জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়, ইয়োরোপে প্রবাসকালে সুভাষচন্দ্র তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন। ইটালিতে ফ্যাসিস্ত মুসোলিনীর ও জার্মানিতে নাৎসী হিটলারের অভ্যুত্থানের মূলে এই কারণ নিহিত ছিল। তাই সুভাষচন্দ্র ইটালী ও জার্মানির বাহিনীর আভ্যন্তরিক সংগঠন প্রনালী গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন ও পরীক্ষা করিয়াছেন। এইজন্য অনেকে সুভাষচন্দ্রকে ফ্যাসিস্ত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই প্রচারের প্রতিবাদ করিয়া সুভাষচন্দ্র জেনেভা হইতে এই মর্মে এক বিবৃতি দান করেন—"আমি বলিতে চাই যে আমার দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের কোন মৌলিক পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। আমার অভিমত এই যে, বর্ত্তমানের দেশবিদেশের বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে যাহা প্রয়োজনীয় ও মঙ্গলপ্রদ, ভারতকে তাহাদের সমন্বয় সাধন করিয়া এক বিশিষ্ট উপযোগী রাষ্ট্রাদর্শ নির্ণয় করিতে হইবে। এই জন্য ইয়োরোপ ও আমেরিকার সমস্ত রাষ্ট্রিক আন্দোলন ও পরীক্ষামূলক রাষ্ট্রিক পদ্ধতিই আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে আমাদের পুর্বগঠিত সংস্কার ও বিশেষ মতানুরক্তি পরিহার করিয়াই নিরপেক্ষ ও মুক্তদৃষ্টি লাভ করা প্রয়োজন।" এককালে ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড সুভাষচন্দ্রকে কারাগৃহে বন্দী রাখিবার যুক্তি হিসাবে বলিয়াছিলেন—He is a man of wonderful organising abilities—almost a genius; and the British Empire could not afford to keep him outside the prison" সংঙ্ঘ সংগঠনের অসামান্য প্রতিভা লইয়া সুভাষচন্দ্র জন্মিয়াছেন। ভারতের বাহিরে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনে সুভাষচন্দ্রের এই প্রতিভা চূড়ান্তরূপে স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে। মনে হয়, ভারতবর্ষে তাঁহার ন্যায় সংগঠন-বীর অধুনা আর জন্মগ্রহন করেন নাই। সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধীজি তাঁহার এই প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা

করিয়াছেন : "My relations with Subhas Babu were always of the purest and best. I always knew his capacity for sacrifice. But a full knowledge of his resourcefulness, soldiership and organizing ability came to me only after his escape from India."

বহুবর্ষ পূর্ব্বেই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সুভাষচন্দ্রের এই প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছেন। আপোষহীন সংগ্রাম পরিচালনের জন্য সুগঠিত কর্মী ও সৈনিক বাহিনীর যে অপরিহার্য্য প্রয়োজন আয়ারল্যাণ্ডের ডি ভ্যালেরার মতই সুভাষচন্দ্র তাহা মর্মে মর্মে বুঝিয়াছেন। নানা দিক্ দিয়া ডি ভ্যালেরার সহিত সুভাষচন্দ্রের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য বর্ত্তমান। স্বাধীনতালাভের অনির্বাণ কামনা ও আবেগ, আপোষহীন সংগ্রামে অটুট ও অটল বিশ্বাস উভয় নেতার মধ্যেই সমুজ্জ্বল। এই সংগঠন প্রতিভা ও প্রেরণা চালিত হইয়াই সুভাষচন্দ্র ইটালীর সমরবাদী যুব সংস্থাসমূহের, জার্ম্মানীর "লেবার সার্ভিস কোরে"র ও নাৎসীপার্টির লৌহকঠিন দলীয় শৃঙ্খলার আলোচনায় আকৃষ্ট হইয়াছেন ও তাহাদের সত্যমূল্য নির্ণয় করিয়াছেন। ভারতে তিনি জাতীয় স্বেচ্ছাবাহক বাহিনী গঠনের প্রয়োজন অকুণ্ঠ ভাষায় প্রচার করিয়াছেন। কাজেই শৃঙ্খলাপরায়ণতা ও সংগঠনের সাফল্যের রহস্য নিরূপণের জন্য সুভাষচন্দ্র ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদে আকৃষ্ট হইয়া থাকিলে তাঁহাকে ফ্যাসিস্ত বলা অক্ষম বিচারবিহীন মনেরই পরিচায়ক। সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী নহে। বিশ্বযুক্তরাষ্ট্র গঠন কল্পে এশিয়ার স্বাধীন জাতিসমূহের সমবায়ে "এশিয়াটিক ফেডারেশন" গঠনের মহৎ কামনা সুভাষচন্দ্র করিয়াছেন।

সুভাষচন্দ্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কার্য্যক্রম সোশ্যালিষ্টদের অনুরূপ। সমাজতন্ত্র ব্যতীত তিনি নব বিশ্ববিধান সৃষ্টির কল্পনা করিতে পারেন না। কিন্তু বাস্তববাদী সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-

বাদের উচ্ছেদ সাধনের প্রতিই সর্বাগ্রে মনোনিবেশ করিয়াছেন। হরিপুরা কংগ্রেসে তিনি বলিয়াছেন—"সমাজতন্ত্রবাদ আমাদের বর্ত্তমানে সর্বাগ্রে প্রয়োজন নহে। তথাপি সোশ্যলিজম গ্রহণ কল্পে ভারতকে প্রস্তুত করিবার জন্য সমাজতন্ত্রবাদের প্রচার প্রয়োজন।" অতএব, সুভাষচন্দ্রের সমগ্র কার্যাবলি বিচার না করিয়া তাঁহাকে ফ্যাসিস্ত বলা অমার্জনীয় অজ্ঞতা মাত্র।

কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্র দুই প্রধান কাজে শক্তিনিয়োগ করেন (১) স্বদেশবাসীদিগকে সংঘবদ্ধ করা—ঐক্য ও সংগঠনের বাণী প্রচার। (২) সংগ্রাম আরম্ভ করিবার জন্য গান্ধীজিকে সম্মত করা। প্রথমটির জন্য সুভাষচন্দ্র "ঝটিকা সফর" করেন। সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া তিনি এই কথাই বলিয়াছেন—"আমাদের সম্মিলিত দাবী পূরণের চাপ দিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের দাবী অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা বর্ত্তমানে ব্রিটেনের নাই। বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এই অপূর্ব সুযোগ যদি আমরা গ্রহণ করি, তবে অচিরে সংগ্রাম ব্যতীতই আমরা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব। এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণকল্পে আমাদিগকে সমস্ত শক্তি সুসংহত ও সুপরিচালিত করিতে হইবে।" কিন্তু সংগ্রাম আরম্ভ করিবার জন্য গান্ধীজিকে তিনি রাজী করিতে পারিলেন না। ১৯৩৮ সালে ইয়োরোপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি গান্ধীজির নিকট যান। গান্ধীজির এক কথা, সংগ্রামের জন্য দেশ প্রস্তুত নহে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের "যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা" সংশোধিত আকারে গ্রহণ করিবার আগ্রহ কোন কোন কর্ত্তৃস্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের মনে জাগিয়াছে সুভাষচন্দ্র সেই সময়ে ইহা বুঝিতে পারেন। কংগ্রেসের প্রধানদের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিকতার প্রতি এই ক্রমবর্দ্ধমান ঝোঁক দেখিতে পাইয়া তিনি প্রবল প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া দেশবাসীকে সাবধান করিয়া দেন। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস যে কিঞ্চিৎ ক্ষমতা লাভ করিয়াছে, তাহার ফলে কংগ্রেসের এক অংশে ক্ষমতালোলুপতা ও আদর্শচ্যুতি দেখা

দিয়াছে। তাহাদের মধ্যে সংগ্রামশীল মনোভাবের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের প্রশ্ন ও সংগ্রামের কথা ক্রমেই গৌণ হইয়া পড়ে। তাই সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতা ও সংগ্রামের প্রধান লক্ষের দিকেই দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এদিকে ইয়োরোপীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ফলিতে চলিল। সুভাষচন্দ্র পুনঃ পুনঃ এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে কংগ্রেস হাই কমাণ্ড ও গান্ধীজির নিকট আবেদন করিলেন। ইহারই ফলে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র ও কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের মধ্যে বিচ্ছেদ অনিবার্য হইয়া উঠিল। কংগ্রেসের প্রবীণ প্রধানগণ কংগ্রেসের রাজনীতি হইতে সুভাষকে অপসারিত করিতে মনস্থ করিলেন। সুভাষচন্দ্রের স্বাধীন প্রকৃতি ও অদম্যসংগ্রামপ্রবৃত্তি তাঁহাদের নিকট অসহ্য মনে হইল। এই কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, সুভাষচন্দ্র ও কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের এই বিচ্ছেদ কোন প্রকার ব্যক্তিগত বিদ্বেষজাত নহে। আদর্শ ও কর্মপন্থার সংঘাতেই এই বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। ত্রিপুরী কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহে দক্ষিণপন্থী ও সুভাষচন্দ্রের আদর্শের বিরোধ চরমরূপ পরিগ্রহ করে। ত্রিপুরী কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের সংগ্রাম আরম্ভ করিবার আবেদন ব্যর্থ হয়। ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, ত্রিপুরীর কংগ্রেস অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির কর্মপন্থা অগ্রাহ্য করিয়া কংগ্রেস স্বাধীনতা লাভের এক সুবর্ণ সুযোগ হেলায় নষ্ট করিয়াছে। সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরীতে যে বাণী প্রদান করেন, তাহা চিরকাল তাঁহার অভ্রান্ত দূরদৃষ্টি, অসম সাহস ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির অতুলনীয় জ্ঞানের সাক্ষ্য বহন করিবে। তিনি বলিয়াছিলেন—"The time has come for us to raise the issue of Swaraj and submit our National Demand to the British Government in the form of an ultimatum. The British Government to-day are not in a

position to face major conflict like an All-India Satyagraha for a long period......Shall we have political foresight to make the most of our present favourable position or shall we miss this opportunity which is the rare opportunity in the life of a nation?"

ভারতমাতার স্বাধীনতাই সুভাষচন্দ্রের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এই জন্য তিনি যে কোন সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে চাহিয়াছেন। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করা তাঁহার রাজনীতির অন্যতম প্রধান দিক্। কংগ্রেস কোন প্রকার সুচিন্তিত ও সুপরিচালিত পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করিতেছে না বলিয়া তিনি অস্বস্তি বোধ করিয়াছেন। বিশ্বের জনমত ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কোন মূল্য গান্ধীজি স্বীকার করিতে চাহেন না। আমরা দেখিতে পাই, কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া ১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধীজি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লণ্ডনস্থ শাখা তুলিয়া দেন। সুভাষচন্দ্র কিন্তু ভারতের অনুকূলে বিশ্বের জনমত গঠন ও বিশ্বপরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণকে তাঁহার কর্মপ্রণালীর অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন—"I attach great importance to the question of a foreign policy for India and of developing international contacts, because, I believe, in the years to come international developments will favour our struggle in India. But we must have a correct appreciation of the world situation at every stage and should know how to take advantage of it. The lesson of Egypt stands before us as an example. Egypt won her treaty of alliance with Great Britain without firing a shot, simply because he knew how to take advantage of

Anglo-Italian tension in the Mediterranean." দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের নিকট বার বার আবেদন জানাইয়াছেন সমস্ত ব্রিটিশ বিরোধী শক্তি সমূহের সহায়তায় স্বাধীনতার দাবীকে অমোঘ করিয়া তুলিবার জন্য। কিন্তু তাঁহার সেই আবেদন অরণ্যে রোদনমাত্র হইল। গান্ধীজি কিছুতেই সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন না। সেই সংগ্রাম শেষপর্যন্ত সুরু করিতেই হইল। ১৯৪২ সালের আগষ্ট প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করিল। কিন্তু তখন বহু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, প্রকৃত লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমরা দেখিলাম, ১৯২৮ সালে গান্ধীজিকে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিতে সুভাষচন্দ্র অনুরোধ করেন—গান্ধীজি অস্বীকৃত হন। দুই বৎসর পরে ১৯৩০এ গান্ধীজি প্রথম আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। ১৯৩৯ ও ১৯৪০ এ ও সুভাষচন্দ্র ভারতব্যাপী মুক্তি আন্দোলন আরম্ভ করিবার জন্য গান্ধীজির নিকট ব্যাকুল আবেদন জানান; ব্রিটিশের বিপন্ন অবস্থায় তাহার বিপদের সুযোগ গ্রহণ করিয়া কিছু করিতে গান্ধীজি রাজী হইলেন না। দুইবৎসর পরে ১৯৪২ সালে গান্ধীজি "ভারতত্যাগ কর" আন্দোলন শুরু করিলেন।

আপোষহীন সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার দুর্জয় সংকল্প লইয়া ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করিলেন। স্বাধীনতার সংগ্রামকে প্রবলতর করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই এই বৈপ্লবিক দল গঠিত হয়। এই ব্লক কংগ্রেসেরই অভ্যন্তরস্থ একটি দল হিসাবে সংগঠিত হয়। কংগ্রেস ও ব্লকের পার্থক্য প্রধানতঃ দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপন্থার পার্থক্য। কংগ্রেসের গান্ধীপন্থীদল আপোষ আলোচনাসহায়ে স্বরাজ লাভে প্রয়াসী। সুভাষচন্দ্রের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা—এইজন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোন প্রকার আপোষ করিতে তিনি চাহেন না। ফরোয়ার্ড ব্লকের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য অনেকে মনে করে ব্লক সহিংস পদ্ধতি গ্রহণ করিতে চায়। কিন্তু এই ধারণা সর্বৈব ভ্রান্ত। সুভাষচন্দ্র বগুড়া জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনে

ব্যাপক অহিংস অসহযোগ আন্দোলন কৌশল গ্রহণ করিবার জন্যই দেশবাসীকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ব্লকগঠনের পরও তিনি ব্যাপক অহিংস গণ আন্দোলন শুরু করিবার জন্যই আহ্বান জানাইয়াছেন। ব্লক গঠনের পরে সুভাষচন্দ্র ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করিবার আয়োজন ও দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করিলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি প্রথমতঃ স্থানীয়ভাবে গণ আন্দোলন শুরু করিতে মনস্থ করিলেন। ফরোয়ার্ড ব্লকের কার্য্যকলাপে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে ও সুভাষচন্দ্রের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য নিখিলভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্মতি ও অনুমোদন ব্যতীত কংগ্রেসকর্ম্মীরা আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিতে পারিবে না ইহাই এই প্রস্তাবের মর্ম। সমস্ত বামপন্থীকে বিতাড়িত করিয়া কংগ্রেসকে একটি একনায়কাধীন একদলীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। কংগ্রেস হইতে দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধবাদী সমস্ত কংগ্রেস কর্মিগণকে বিতাড়ন করা ইহার উদ্দেশ্য। প্রত্যেক কংগ্রেস-কর্মীরই ব্যক্তিগতভাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিবার অধিকার এই পর্য্যন্ত স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। এই প্রস্তাবে কংগ্রেসকর্মীকে সেই ব্যক্তিগত অধিকার হইতেও বঞ্চিত করা হইল। কংগ্রেসকর্মীদের নিয়মতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করায় ও তাহাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করার প্রচেষ্টায় সুভাষচন্দ্র প্রবল প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। এই প্রস্তাবকে তিনি ফ্যাসিস্ত মনোভাব সুলভ কার্য্য বলিয়া অভিহিত করেন ও ইহার বিরুদ্ধে এক সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবসের আয়োজন করেন। সুভাষচন্দ্রের এই প্রতিবাদকার্যের জন্য মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে তাঁহাকে কংগ্রেস হইতে বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু কংগ্রেসের এই কার্য্যের ফলে সুভাষচন্দ্রের প্রভাব খর্ব না হইয়া উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলে। সুভাষ বিতাড়নের ব্যবস্থায় কংগ্রেসের যে উদ্দেশ্য ছিল, তাহা সফল না হইয়া বিফলই হইল।

ইতিমধ্যে ১৯৩৯ এর ৩রা সেপ্টেম্বর মহাযুদ্ধ ঘোষিত হইল—এই বিশ্ব পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবার জন্য গান্ধীজি শাসিত কংগ্রেস মোটেই প্রস্তুত থাকে নাই। যুদ্ধ সমস্যায় কংগ্রেসের পররাষ্ট্রনীতির শোচনীয় অভাবের পরিচয় পাওয়া গেল—বিভিন্ন নেতা বিভিন্ন সুরে কথা বলিতে লাগিলেন। ব্রিটিশগভর্ণমেণ্ট ভারতকে যুদ্ধরত দেশ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কংগ্রেস কিন্তু এই সমস্যায় কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিল না—কংগ্রেস হাইকমাণ্ড যুদ্ধের বিভিন্ন সমস্যায় সরকারের সহিত একটা বোঝাপড়া করিবার আশায় দীর্ঘকাল পণ্ডিতসুলভ তর্কে প্রবৃত্ত রহিল, এই বিশ্বসঙ্কটে দেশকে কোন সুনির্দ্দিষ্ট কর্মপন্থা দিয়া পরিচালিত করিতে পারিল না। কংগ্রেসের উপর যে বিরাট দায়িত্ব পড়িল, সেই দায়িত্ববহনে কংগ্রেস অক্ষম বলিয়া মনে হইল। দার্ঘকাল ধরিয়া কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের আলাপ আলোচনার সুযোগে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধ প্রচেষ্টার অছিলায় ভারতের ধন জন ও সম্পদ শোষণ করিতে লাগিল। কংগ্রেস ব্রিটীশের এই শোষণ ও যুদ্ধ সংক্রান্ত নানা উৎপীড়নের কোন প্রতীকার করিতে পারিল না। মহাযুদ্ধের সঙ্কটক্ষণে কংগ্রেস নেতৃত্বের দুর্বলতা ধরা পড়িল। একদিকে কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের নিষ্ক্রিয়তা, অন্যদিকে "অহিংসা" প্রয়োগ সম্বন্ধে গান্ধীজি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যায় নিযুক্ত। গান্ধীজি এমন কথাও বলিলেন যে, এই সময়ে কোনপ্রকার আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইলে তিনি নিজের প্রাণ দিয়াও তাহার প্রতিরোধ করিবেন। কংগ্রেসের এই চূড়ান্ত নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ সরকার নিজের কাজ হাসিল করিতে লাগিল—দেশের উপর দিয়া যুদ্ধপ্রচেষ্টার "ষ্টীম রোলার" চালইতে থাকিল। যুদ্ধসমস্যাসম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের সহিত একটা আপোষ করিবার অত্যুৎসাহেই কংগ্রেস দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িল। গান্ধীজি ঘোষণা করিয়াছেন, তিনি আইন অমান্য আরম্ভ করিবেন না—কংগ্রেসও গান্ধীজির নির্দেশ ব্যতীত কোন

সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণ করিবে না। নেতৃবৃন্দের এই শোচনীয় অবস্থা ও দুর্বলতা ব্রিটিশের নিকট গোপন রহিল না। গভর্ণমেণ্টের অত্যাচার ও ও কংগ্রেসের দুর্বলতা এই দুইয়ে মিলিয়া যে দুর্গতির পথে দেশকে ঠেলিয়া দিল সুভাষচন্দ্র তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি আপোষ বিরোধী আন্দোলন চালাইতে ও গণ-আন্দোলনের জন্য দেশকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে স্বাধীনতালাভের সংগ্রামে গান্ধীজি "চরখা"র যে স্থান নির্দেশ করিলেন—চরখার উপর যেরূপ রাজনৈতিক গুরুত্ব আরোপ করিলেন, স্বাধীনতা অর্জ্জনের অস্ত্র হিসাবে "চরখা" বাদের যে ব্যাখ্যা করিলেন, সুভাষচন্দ্র তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। অবশেষে গান্ধীজি বুঝিতে পারিলেন যে,—"There was no meeting ground between the Indian Nationalists and British Imperialists." ১৯৪০এর ৮ই এপ্রিল প্যাটেল ঘোষণা করেন—"A fight is inevitable." অথচ, ১৯৩৮ সালেই সুভাষচন্দ্র এই কথা বলিয়াছিলেন। তথাপি সংগ্রাম আরম্ভ হইল না। ১৯৪০ এর ১লা জুন গান্ধীজি বলিলেন—"We do not seek our independence out of Britan's ruin. That is not the way of non-violence."

উপায়ান্তর না দেখিয়া সুভাষচন্দ্র নিজেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত সংগ্রামে জনগণকে চালনা করিবার নেতৃত্ব ও দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। এক বিন্দু রক্তপাত না করিয়াও স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা এই সময়ে তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করিয়াছেন যে আন্তর্জাতিক সংকটের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য ভারত যদি ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দাঁড়ায় তবে বিনারক্তপাতেই স্বাধীনতা আসিবে।

নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বলেন—"If we can develope sufficient unity and

solidarity among ourselves in good time, we may very well hope that the transference of power from the hands of the British Imperialism to those of the Indian people will take place in a peaceful manner. It is not necessary that the Indian Revolution should be a bloody one."
"All power to the masses—"জনগণের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা চাই—এই মন্ত্রে সুভাষচন্দ্র দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। জনগণকে সংগ্রামশীল করিবার জন্য, স্বাধীনতা লাভের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা তাহাদিগের মধ্যে সংক্রামিত করিবার জন্য সুভাষচন্দ্র বাংলাদেশে "হল্‌ওয়েল মনুমেণ্ট" ধ্বংসের আন্দোলন সৃষ্টি করিলেন। ১৯৪০ এর ৩রা জুলাই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু তাহাতে আন্দোলন প্রশমিত না হইয়া উত্তরোত্তর তীব্র হইতে লাগিল। অবশেষে গভর্ণমেণ্ট হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ করিতে বাধ্য হইল। সুভাষচন্দ্রের আন্দোলন সাফল্য লাভ করিল।

১৯শে নভেম্বর তারিখে গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারের প্রতিবাদ স্বরূপ বন্দী সুভাষ এক পত্রযোগে গভর্ণমেণ্টকে অনশন গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প জানান। ফলে ৫ই ডিসেম্বর সুভাষচন্দ্রকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহার কিছুদিন পরে ১৯৪১ সালে রহস্যজনক ভাবে সুভাষচন্দ্র ভারত ত্যাগ করেন।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে আমরা সুভাষচন্দ্রের মতবাদ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করিতে পারি। সুভাষচন্দ্র যথাস্থানে অহিংসা, চরকা ও কুটির শিল্পের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য প্রধানতঃ তিনি সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে শিল্পায়ন বা যন্ত্রশিল্পের ক্রমপ্রসারের পক্ষপাতী। ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র কর্তৃক National Planning Committee বা জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি

গঠনেই এই বিষয়ে তাঁহার কর্ম্মপন্থার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে একটি Federal Republic হইবে—শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে ইহাই তাঁহার আদর্শ। ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনকল্পে প্রয়োজন হইলে সুভাষচন্দ্র বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত নন—এমন কি, "ব্রিটিশবিরোধী শক্তির সহায়তা ও আন্তর্জাতিক সঙ্কটের সুযোগ গ্রহণ" এই নীতি সুভাষচন্দ্রের সংগ্রামপদ্ধতির একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ১৯৪১এ ভারত ত্যাগ করিয়াছেন। ভারতের অভ্যন্তরে অহিংস ব্যাপক গণ-আন্দোলনেই তিনি বিশ্বাসী। সর্বোপরি, চিরবিদ্রোহী ভারতসন্তান সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য নিরন্তর আপোষহীন সংগ্রামেই বিশ্বাসী। আলাপ আলোচনায়, আপোষ রফায় পূর্ণ স্বাধীনতা আসিতে পারে, ইহা তিনি বিশ্বাস করেন না। ভারতের এই অশান্ত ও অশ্রান্ত সন্তান স্বীয় আদর্শে অবিচলিত নিষ্ঠা রাখিয়া চূড়ান্ত ত্যাগ ও দুঃখবরণ করিয়াছেন—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহার অক্ষয় অবদান চিরকাল তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তাঁহার ত্যাগ, নিষ্ঠা, চরিত্রবত্তা ও দুঃখবরণ ব্যর্থ হইবে না—এই বিশ্বাসেই ভারতবর্ষ তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিবে। তাঁহারই অমরবাণী আবৃত্তি করিয়া আমরা বলিব—"No sacrifice is ever futile. It is through suffering and sacrifice alone that a cause can flourish and prosper and in every age and clime the eternal law prevails—the blood of the martyr is the seed of the church. In this mortal world every thing perishes but ideals and dreams do not. The individual must die, so that the nation may live." কবির ভাষায় এই বাণীই সুভাষচন্দ্র দেশবাসীর সমক্ষে রাখিয়াছেন—

"আমার জীবনে লভিয়া জনম জাগরে সকল দেশ।"

বত্রিশ

আজাদ-হিন্দ-ফৌজের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী—১৯৪৪ সালের প্রথমভাগে ভারতের দুর্ভেদ্য পূর্ব্বসীমান্ত অতিক্রম করিয়া যে নির্ভীক সেনাদল ভারতভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিল, তাহাদের হস্তে পররাজ্য-লোভী দস্যু আক্রমণকারীর উদ্যত অগ্নি-নালিক ছিল না, নৃশংস অত্যাচারের বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া তাহারা সমগ্র দেশকে বর্ব্বরতার লীলাভূমিতে পরিণত করিতে চাহে নাই, নিরপরাধ ও নিঃসহায় জনগণের রক্তে শ্যামলা বনভূমি রঞ্জিত করে নাই, তাহাদের দৃষ্টিতে হিংস্রতা ছিল না, আচরণে ক্রূরতার লেশমাত্র দৃষ্ট হয় নাই; তাহারা আসিয়াছিল স্বাধীনতার ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাহস্তে পরাধীন ভারতবাসীর মুক্তির বার্তা বহন করিয়া। তাহাদের আবির্ভাবের ফলেই দুইশত বৎসরের পদদলিত ও শৃঙ্খলিত ভারতবাসীর বন্ধন-মুক্তি সমাসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। কোহিমা-ডিমাপুরে ভারতের মৃত্তিকায় আজাদ-হিন্দ-ফৌজের যে দল আসিয়া স্বাধীনতার পতাকা প্রোথিত করে তাহাদের মূর্ত্তি অপূর্ব্ব সংযত—হিংস্র পাশবশক্তির উগ্রতা, উচ্ছৃঙ্খলতা তাহাদের চরিত্রে কালিমালেপন করে নাই। বিপ্লববহ্নিতে পরিশুদ্ধ হইয়া, দেশাত্মবোধের মর্ম্মান্তিক বেদনায় তাহারা বিপুল চারিত্রশক্তি ও সংযম লাভ করিয়াছে। এই বিপ্লবযজ্ঞে সাগ্নিক পুরোহিত সুভাষচন্দ্র।

মাতৃভূমির উদ্ধারসাধনকল্পে প্রবাসী দেশপ্রেমিকদের আত্মত্যাগ ও দুর্জ্জয় মুক্তি-প্রেরণায় গঠিত এইরূপ ফৌজের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ব্রহ্মদেশের বনাকীর্ণ অঞ্চলে আসামের গিরি-উপত্যকায়, আরাকানের পার্ব্বত্যভূমিতে ঘোর সংগ্রাম করিয়া এই মুক্তি-সেনাদল যে বিস্ময়কর ইতিহাস রচনা করিয়াছে, প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট তাহা পরম গৌরবের বস্তু। বিলাস ও ঐশ্বর্য্যের মোহ কাটাইয়া, সংসারের

সুখসম্ভোগ ও প্রতিপত্তির প্রলোভন ত্যাগ করিয়া, স্ত্রী-পুত্র ও আত্মীয় পরিজনের স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া এই ভারত-সন্তান-দল জীবনপণে মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে—অতুলনীয় মনোবলে বলীয়ান হইয়া নিতান্ত অপ্রতুল সমরোপকরণ লইয়া সম্মুখসমরে দুর্ধর্ষ ও শক্তিমদমত্ত ব্রিটিশ-বাহিনীকে বিপর্য্যস্ত করিয়া বীরত্ব ও সামরিক প্রতিভার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। আপাতপরাজয়ের গ্লানি এই ফৌজকে স্পর্শ করিবে না। ভারতবাসী জানে কেবলমাত্র সার্থকতা ও সাফল্যের মাপকাঠিতে তাহাদের বিপ্লব-প্রচেষ্টার মহিমাকে মাপা যায় না—এই সার্থকজন্মা মুক্তিসাধকদল দেশবাসীর অন্তরে চিরদিন অমলিন মহিমামণ্ডিত হইয়া বিরাজ করিবে।

পূর্ব্ব এশিয়ায় অস্থায়ী আজাদ-হিন্দ গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা ও আজাদ-হিন্দ-ফৌজের ভারত-অভিযান ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা চাঞ্চল্যকর ও অসমসাহসিক ঘটনা। সুশৃঙ্খল ও সুগঠিত বাহিনীর সহায়ে সম্মুখসংগ্রামে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করিবার এইরূপ চেষ্টা ভারতের ইতিহাসে আর হয় নাই। ১৮৫৭ সালের সিপাহী-বিদ্রোহ সমগ্র দেশকে বিপ্লব-প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহের পুরোভাগে কোন সবল, বিচক্ষণ, কুশলী ও সুসংহত রাষ্ট্রিক নেতৃত্ব ছিল না। আজাদ-হিন্দ-ফৌজের ভারত-অভিযান ভারতবর্ষের অগণিত অধিবাসীর চিত্ততলে, ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহাতে এই সত্যই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে, আপাতপরাজয় বরণ করিলেও এই ফৌজের উদ্দেশ্য বহুতর সিদ্ধিলাভ করিয়াছে—বিজিত হইয়াও এই বাহিনী প্রকৃত বিজয়-লাভে সমর্থ হইয়াছে। আজ কোটি কোটি ভারতবাসী আজাদ-হিন্দ-ফৌজের দুর্জ্জয় সংকল্প গ্রহণ করিয়া মাতৃভূমির স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগদান করিতে উন্মুখ। দেশের সর্ব্বত্র আজ যে ব্যাপক গণজাগরণ ও রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার পরিলক্ষিত হইতেছে, আজাদ-হিন্দ-ফৌজেরই

সাধনার ফলে ইহা সম্ভব হইয়াছে। কংগ্রেসের নেতৃবর্গও স্বীকার করিয়াছেন—"ষাট্ বৎসরে কংগ্রেস যাহা করিতে পারে নাই, অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট দুই বৎসরেই তাহা সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।" ভারতের বুকের উপর দিয়া বিরাট গণ-আন্দোলনের যে স্রোত বহিয়া যাইতেছে, তাহা যে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের বিপুল প্রভাব ও প্রেরণার সাক্ষাৎ সৃষ্টি—তাহা কে অস্বীকার করিবে? শৃঙ্খলিত, নির্যাতিত ও নিরস্ত্র ভারতবাসীর হৃদয়ে এই অভূতপূর্ব্ব উদ্দীপনা ও আত্মবিশ্বাস কোথা হইতে আসিল? আজাদ-হিন্দ-ফৌজের সাধনার ফলে ভারতবাসী আত্ম-শক্তির উৎসের সন্ধান পাইয়াছে—তাই আজ পূর্ণজাগরণ-প্রসূত দুর্জয় সঙ্কল্প ও সংগঠনশক্তি লইয়া ভারতবাসী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের উৎসাদনে শেষ ও চূড়ান্ত আঘাত হানিতে প্রস্তুত।

দেশবাসী একদিকে যেমন আজাদ-হিন্দ-ফৌজ ও অস্থায়ী জাতীয় সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছে, অপরদিকে তেমনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও বহু স্বার্থান্বেষী ও ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য-বাদের প্রসাদপুষ্ট রাজনৈতিক দল নানা ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করিয়া আমাদিগকে নানা বিষয়ে সন্দেহাকুল করিয়াছে। তাই আজ প্রশ্ন উঠিয়াছে—"আজাদ-হিন্দ-ফৌজ কি জাপানীদের হাতে ক্রীড়নকমাত্র ছিল? আজাদ-হিন্দ গভর্ণমেণ্ট কি কংগ্রেসের আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল না? বিদেশীদের সাহায্যে কি স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন সম্ভব? আজাদ-হিন্দ গভর্ণমেণ্ট সম্পর্কে এই সকল প্রশ্নের আলোচনা না হইলে উক্ত গভর্ণমেণ্টের প্রকৃত স্বরূপ ধারণা করা যাইবে না।

পূর্ব্ব এশিয়ায় আজাদ-হিন্দ-গভর্ণমেণ্ট ও ফৌজের গঠনই একক ঘটনা নহে। কেবল আজাদ-হিন্দ আন্দোলন নহে, অনুরূপ স্বাধীনতার আন্দোলন পূর্ব্বএশিয়ার জাপ-অধিকৃত প্রত্যেকটি দেশেই হইয়াছে। ইহার কারণ কী? পূর্ব্ব এশিয়ার সমস্ত নর-নারী কি ফ্যাসিষ্ট শাসন বরণ করিবার

জন্যই উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল? তাহারা কি "স্বাধীনতা" অর্থে এক প্রভুর স্থলে অন্য প্রভুর শাসনই শুধু বুঝিত? প্রকৃত তথ্যের অনুসন্ধানে জানা যায়—বস্তুতঃ পক্ষে তাহারা কোন দাসত্বকেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল না। বরং প্রত্যেক দেশের জাগ্রত জাগরণ স্ব স্ব দেশে সম্পূর্ণ স্বাধীন জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতেই বদ্ধপরিকর ছিল। এই প্রসংগে আমাদের জাপ-আক্রমণের সময়কার সম্পূর্ণ ইতিহাস স্মরণ করা প্রয়োজন।

পূর্ব্ব-এশিয়ায় যখন জাপানী সরকার যুদ্ধ সুরু করে তখন ব্রিটিশ, ডাচ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। কি অস্ত্রবলে, কি সৈন্য-সামন্তের আয়োজনে মিত্রপক্ষ জাপানের অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করিবার মত শক্তি এশিয়ায় সঞ্চয় করে নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিত যদি তাহারা এশিয়ার জনগণের পূর্ণ সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করিতে পারিত। কিন্তু শতাব্দীর উদ্ধত অত্যাচারী, গর্ব্বস্ফীত সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী তাহাদের সাম্রাজ্যের অন্তিম মুহূর্ত্তেও এশিয়াবাসীকে তাহাদের ন্যায্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিতে দেয় নাই। ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতার দাবী অস্বীকৃত হইল। ভারতবর্ষে ক্রীপস্ মিশন আসিল—কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার কোন দাবীই স্বীকার করা হইল না। মালয়, জাভা, ইন্দোচীন সর্ব্বত্রই এশিয়াবাসীর স্বাধীনতার দাবীকে পদদলিত করিয়া সাম্রাজ্যবাদী শোষকগণ স্বহস্তে নিজেদের সমাধি রচনা করিল!

এদিকে যুদ্ধের সংকট দিনের পর দিন তীব্র হইয়া উঠিতেছে। প্রতিদিনের সংবাদপত্রেই মিত্রপক্ষের শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ ভাসিয়া আসিতেছে। সকলেই বুঝিল, যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কোনদিন সূর্য্য অস্ত যাইত না, সেই সাম্রাজ্যেও আর সূর্য্যোদয় হইবে কিনা

সন্দেহ। তাহারা ইহাও বুঝিল, স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যদি কিছু করিতে হয় ত তাহার উপযুক্ত সময় ইহাই। মিত্রপক্ষের নিকট বারংবার জাপ-বিরোধী সংগ্রামে যোগদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াও ভারতের ভাগ্যে স্বাধীনতার কিছুই মিলিল না। এসিয়াবাসী সাম্রাজ্যবাদকে চেনে—ভারতের দারিদ্র্যনিপীড়িত কৃষক, বর্মার তৈলখনির শ্রমিক, মালয়ের রবার বাগানের শ্রমিক, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ার কিযাণেরা সাম্রাজ্যবাদী কূটচক্রের সহিত বিশেষরূপেই পরিচিত। বহু শতাব্দী ধরিয়া তাহারা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের ছত্রচ্ছায়ায় বসবাস করিয়াছে—নিজের শেষ রক্তবিন্দুটি দিয়া ইউরোপের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছে—সাম্রাজ্যবাদকে পুষ্ট করিয়াছে। বিনিময়ে তাহারা পাইয়াছে অনাহার, বুভুক্ষা, নির্যাতন ও জাতীয় অপমান—দারিদ্র্য, অশিক্ষা, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মবিদ্বেষ—সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মোহকর ছলনা। আবেদন ও নিবেদন, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সকলই রক্তস্রোতে ভাসাইয়া দিয়া সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ অব্যাহত ও নিরঙ্কুশভাবে চলিয়াছে। কঠোর ও তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া তাহারা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদকে চিনিয়াছিল। তাই যখন সম্রাজ্যের অন্তিম মুহূর্তেও সাম্রাজ্যবাবীদের দম্ভ গেল না তখন শ্বেতকায় জাতির প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা—সাম্রাজ্যবাদীদের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিবার অদম্য বাসনা সেই সকল অঞ্চলের জনসাধারণের মনকে অধিকার করিল।

এই অবস্থাকে আরও অসহনীয় করিয়া তুলিল পাশ্চাদপসরণে রত সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রুর নীতি। একদিকে তাহারা দেখিতেছে, যে সকল শাসকশক্তি এতদিন একরূপ অপরাজেয় বলিয়াই গণ্য হইত জাপানীদের প্রবল আক্রমণে পর্যুদস্ত হওয়ায় তাহাদের সাম্রাজ্য তাসের ঘরের ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; অপরদিকে, তাহারা লক্ষ্য করিল পলায়নপর হয়োরোপীয়দের নৃশংস ব্যবহার—পশ্চাদপসরণকালে কৃষ্ণকায় ও শ্বেতাঙ্গ-

দের মধ্যে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা। পশ্চাদপসরণের প্রথম সুযোগ পাইল শ্বেতাঙ্গগণ, এমন কি ফিরিঙ্গিদিগকেও ফেলিয়া আসা হইল। এশিয়াবাসী চিরতরে জানিয়া লইল এই সকল সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট ন্যায়বিচার যাচ্‌ঞা করিয়া কোন ফল হইবে না। সুতরাং, জাপান যখন বর্মার দুয়ারে আঘাত হানিতেছে তখন এশিয়াবাসীর মনে স্বভাবতঃই প্রতীচ্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ ও ঘৃণা পুঞ্জীভূত হইল এবং স্বাধীনতা-লাভের আকাঙ্ক্ষাও অদম্য হইয়া উঠিল। সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও পদ্ধতিতে অভ্যস্ত জাপান বিক্ষুব্ধ এশিয়াবাসীদের এই মানসিক অবস্থার কথা ভালভাবেই বুঝিতে পারিল ও এই পরিস্থিতিকে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিজেদের অনুকূলে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিল। জাপান শ্বেতাঙ্গবিরোধী মনোভাবে ইন্ধন যোগাইল। 'এশিয়া এশিয়াবাসীর' 'বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়ার উন্নতি' প্রভৃতি মুখরোচক বুলি প্রচার করিয়া সাম্রাজ্যবাদে দীক্ষিত এশিয়ার এই নব্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিটি এশিয়াবাসীর চিত্তজয় করিতে প্রয়াসী হইল।

কিন্তু, এই সকল দেশের স্বাধীনতাকামী যোদ্ধারা সাম্রাজ্যবাদী জাপানকেও ভালরূপেই চিনিত। চীনে জাপানীদের অত্যাচার ও বর্ব্বরতার পরে জাপানকে বিশ্বাস করিবার কোন কারণ ছিল না এবং কার্য্যতঃ তাহারা কখনই জাপানকে বিশ্বাস করে নাই। জাপানও এই সকল দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস পূর্ব্বেই জানিত। তাই সে বুঝিয়াছিল যে, পূর্ব্ব-এশিয়ায় তাহার তাঁবেদার রাষ্ট্র গঠন করিবার সুবিধা হইবে না। তথাপি কি করিয়া বিভিন্নদেশে স্বাধীনতার আন্দোলন গড়িয়া উঠিল? জাপান তাহাদের সাহায্য করিল কেন? তাহারাই বা কেন জাপানের সাহায্য গ্রহণ করিতে রাজী হইল?

জাপানের পক্ষ হইতে এই সকল স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য করিবার বিশেষ সামরিক কারণ ছিল। মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে বহুদিনব্যাপী

যুদ্ধ চালাইবার মত সৈন্যবল ও সমরসম্ভার তাহাদের ছিল না। কাজেই, তাহাদের রণকৌশলের মূলনীতি ছিল—অতর্কিত তড়িৎ আক্রমণ, শত্রুদলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ও উপযুক্ত রণসম্ভার লইয়া আসার পূর্ব্বেই শত্রুর প্রধান ঘাঁটিগুলি দখল করা। এই উদ্দেশ্যেই জাপান বিনাঘোষণায় অতর্কিতে যুদ্ধ সুরু করে—একই সময়ে পাঁচ-সাতটি করিয়া ঘাঁটি আক্রমণ করে—পার্লহারবারে নোঙ্গরবদ্ধ অবস্থায় মাকিণ নৌবহর ঘায়েল করে। জাপানের এই ঝটিকা আক্রমণের নীতি বিশেষ সফল হইয়াছিল। কিন্তু ইহার সহিত সে এই ভরসাও করিয়াছিল যে, বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাহায্যদানের ফলে ঐ ঐ দেশবাসী শত্রুর পশ্চাদ্দেশে বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিবে এবং তাহাদের সাহায্যেই দেশগুলিকে মিত্রপক্ষের সেনাদলের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে ; কেননা, এই অধিকৃত বিরাট অঞ্চলে যুদ্ধ করিবার মত বিপুল সমরায়োজন তাহাদের ছিল না।

অপরদিকে এই সকল দেশের দেশপ্রেমিকগণ জাপানের সাহায্য গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয় প্রধানতঃ তিনটি কারণে—(ক) বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার ও দাম্ভিকতায় তাহাদের বিতৃষ্ণার সীমা ছিল না। সুতরাং বিদেশী শাসনের কবল হইতে মুক্ত হইবার এই সুযোগ তাহারা ছাড়িতে চাহে নাই। (খ) জাপানের যুদ্ধে জয়লাভ সে সময়ে একরূপ নিশ্চিতই ছিল। কাজেই জাপান যতটুকু সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে তাহা অগ্রাহ্য করা নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ হইত। (গ) এই সকল দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃবর্গ জানিত তাহাদের দেশের শাসনকার্য্য চালাইবার জন্য জাপানকে তাহাদের উপরেই নির্ভর করিতে হইবে। সুতরাং একবার হাতে অস্ত্রশস্ত্র আসিবার পর জাপানীদের বিতাড়িত করাও খুব কষ্টসাধ্য হইবে না। এই অবস্থার মধ্যেই জাভায় ডাঃ সোয়েকার্ণোর গভর্ণমেণ্ট গঠিত হয়—ব্রহ্মদেশের বা ম' ও আউঙ্গ সানের নেতৃত্বে স্বাধীন

ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্ট গঠিত হয়। এই সকল গভর্ণমেণ্ট যে জাপ-বিরোধী ছিল তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এমনকি সামরিক কর্তৃপক্ষকেও তাহা স্বীকার করিতে হইয়াছে। স্বাধীন ব্রহ্মবাহিনী জাপানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এবং মান্দালয়, প্রোম, পেগু, রেঙ্গুন প্রভৃতি অঞ্চল তাহারাই দখল করে। ডাঃ সোয়েকার্ণোর গভর্ণমেণ্টও সক্রিয়ভাবে জাপানীদের বিরুদ্ধাচরণ করে। এইভাবে জাপ-অধিকারের সময়ে স্বাধীন জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া এই সকল দেশের মুক্তি-সংগ্রামের নায়কগণ যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছে সে কথা এখন বিদেশীরাও স্বীকার করিতেছে। জাভা সম্পর্কে জনৈক মার্কিণ সংবাদপত্র প্রতিনিধি বলিয়াছেন যে, গত দুই শতাব্দীতে জাভা যতটা উন্নতি না করিয়াছে মাত্র তিন বৎসরেই তাহার অনেকগুণ অধিক উন্নতি করিয়াছে। তাহা ছাড়া, যুদ্ধ সমাপ্তির পরে ব্রহ্ম, মালয়, জাভা এবং ভারতবর্ষে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে তাহা হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, এই সকল গভর্ণমেণ্টের গঠন ও প্রতিষ্ঠালাভ সমগ্র এশিয়ার পরাধীন জাতিগুলির স্বাধীনতালাভের আন্দোলনকে যথেষ্ট শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। ব্রিটিশ ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদের সম্মিলিত অভিযান ব্যর্থ করিয়া ইন্দোনেশীয়গণ তাহাদের রক্তের স্বাক্ষরে যে গৌরবময় ইতিহাস রচনা করিয়া বিশ্বের স্বাধীনতাকামী জনগণের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে ও তাহাদের আদর্শ-স্থানীয় হইয়াছে তাহা বহুলাংশে এই সকল আন্দোলনেরই ফল। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে অস্থায়ী আজাদ-হিন্দ্ গভর্ণমেণ্ট ও ফৌজের গঠন ইতিহাসকেও এই পটভূমিকায় দেখিতে হইবে।

১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ইংরাজদের দুর্ভেদ্য দুর্গ সিঙ্গাপুর জাপানীদের বিদ্যুৎ আক্রমণে ব্রিটিশের হস্তচ্যুত হয়। ঐ সময়ে পনর সহস্র ব্রিটিশ সৈন্য, তের সহস্র অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্য ও বত্রিশ সহস্র ভারতীয় সৈন্য জাপানীদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। ভারতীয় সৈন্যদের জাপানীদের

নিকট "আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠানে" জাপানী অফিসার মেজর ফুজিয়ারা বক্তৃতায় বলেন—"আমি আপনাদিগকে ক্যাপ্টেন মোহন সিং'এর হস্তে সমর্পণ করিতেছি। তিনিই আপনাদের সর্বাধিনায়ক (Supreme Commander) হইবেন। আপনারা তাঁহারই আদেশ পালন করিবেন।" ইহার পরে ক্যাপ্টেন মোহন সিং বক্তৃতায় বলেন—"Now is the time for the Indians to fight for their independence. So far India has been lacking an armed force of its own but here is a chance of raising an armed force to fight for India's liberation. The British Government have handed you over to the Japanese. The Japanse are not prepared to keep you as prisoners as they are short of rations. We are forming an Indian National Army which will fight to free India."

মোহন সিং কর্তৃক ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠন করিবার ঘোষণা সকলেই অতিশয় উল্লাসের সহিত সমর্থন করে। কিন্তু ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠন সমস্যায় একটা বিপদও ছিল। ফারার পার্কে আত্মসমর্পণের ব্যাপার হইতে অনেক উচ্চপদস্থ ভারতীয় অফিসারের এই আশঙ্কা হয় যে, জাপানীরা নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই ভারতীয় সৈন্যদিগকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিবে। এই কারণে, এই সঙ্কটক্ষণে ভারতীয় সৈন্যদের ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য ক্যাপ্টেন মোহন সিং প্রমুখ উচ্চপদস্থ অফিসারগণ মালয় ও ব্রহ্মবাসী ভারতীয়গণের সহিত একটি পরামর্শ-বৈঠকের আয়োজন করেন। ১৯৪২ সালের ৯ই ও ১০ই মার্চ এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে জাপান-প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী শ্রীরাসবিহারী বসু উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার আহ্বানে টোকিতে ২৮শে হইতে ৩০শে মার্চ (১৯৪২) পর্য্যন্ত এক সম্মেলন হয়। ঐ সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ

পূর্ব-এশিয়ায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্য "ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ" গঠনের সিদ্ধান্ত করেন। Indian Independence League এর উদ্দেশ্য হিসাবে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় :—"Independence complete and free from foreign domination, interference and control of whatever nature shall be the object of the movement" এই সম্মেলনে গৃহীত অন্য একটি প্রস্তাব—"Military action against India will be taken only by the Indian National Army and under the command of Indians, and that the framing of the future constitution of India will be left entirely to the representatives of the people of India." ব্যাঙ্ককে ১৫ই জুন হইতে ৯ দিন ব্যাপী যে বৃহৎ সম্মেলন হয়, তাহাতেও 'ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জন'ই লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করা হয়। সম্মেলনে ভারতবর্ষ ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রতি জাপগভর্ণমেণ্টের নীতি কি হইবে তাহা সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করিবার জন্য জাপগভর্ণমেণ্টের নিকট দাবী জ্ঞাপন করা হয়। এই সম্পর্কে Rebel Daughter's Diary (বিদ্রোহী তনয়ার ডায়েরী)তে লিখিত হইয়াছে :—"The conference decided to organise the Azad Hind Fauz under the direct Control of the Council of Action of the League, The Fauz must be accorded the powers and status of a Free National Army of Independent India on a footing of equality with the army of Japan. It is laid down in clear terms that the Fauz shall be used only for operations against foreigners in India for the purpose of securing and safeguarding Indian National Independence and for no other purpose." (June, 1942)

ডাঃ সোয়েকার্ণোর স্বাধীন ইন্দোনেশীয় গভর্ণমেণ্ট বা আউঙ্গ সানের স্বাধীন ব্রহ্মফৌজ যে জাপবিরোধী ছিল, এ বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ। বহু বিদেশী সাংবাদিক ও নেতা তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ইন্দোনেশিয়ায় বা ব্রহ্মদেশে গঠিত জাতীয় গভর্ণমেণ্টকে যদি জাপ ক্রীড়নক বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ না থাকে, তবে Indian Independence League, Indian National Army বা আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্ট ও ফৌজকেও জাপ তাঁবেদার মনে করিবার কোন হেতু নাই। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ তাহার স্বাধীন সত্তা ও মর্য্যাদা সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিতে পারিয়াছিল।

আজাদ হিন্দ্ আন্দোলনের নেতৃবর্গ পূর্ব হইতেই আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, জাপানীরা প্রতি পদক্ষেপে এই আন্দোলনের স্বাধীন অগ্রগতির প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিবে এবং ইহাকে তাহাদের তাঁবেদার আন্দোলনে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবে। এইজন্য প্রথম হইতেই আজাদ হিন্দ আন্দোলনের নায়কগণ এই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকেন ও আন্দোলনকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও জাপানী সংস্রবশূন্য করিয়া তুলিতে তৎপর হন। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্য সংগ্রহকালে শাহ নাওয়াজ ও ধীলন প্রমুখ নেতৃবর্গ কেবল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের কথাই বলিতেন না, প্রয়োজন হইলে, জাপানীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের কথাও বলিতেন। শাহ্‌নাওয়াজ এক বক্তৃতায় বলেন—"I. N. A. has been formed for the liberation of India and it would fight not only British Imperialism but also that who will put obstacles in the way of India's freedom or any other party which wishes to subjugate us."

আজাদ হিন্দ্ আন্দোলন সুরু হইবার পর হইতেই জাপানীদের সহিত এই আন্দোলনের নায়কদের বিরোধ চলিতে থাকে। প্রতিদিনই জাপানীদের সহিত বিবাদ ও বিরোধ বাঁধিত। Rebel

Daughter's Diary হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি হইতে এই বিষয় সুস্পষ্ট হইবে।

(ক) ১লা অক্টোবর, ১৯৪২। একটি উৎকৃষ্ট ভারতীয় বাহিনী গঠনকল্পে আমাদের Council of Action (সংগ্রাম পরিষদ) জাপানীদের সহিত বুঝাপড়া করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু নির্বিঘ্নে কাজ হইবার যেরূপ আশা করা গিয়াছিল, তাহা হইতেছে না। ব্যাঙ্কক সম্মেলনের প্রস্তাবগুলির উত্তর জাপানীদের নিকট হইতে আজও পাওয়া যায় নাই।

(খ) ৩রা নভেম্বর ১৯৪২। কিকাণ (জাপ সামরিক সংযোগ রক্ষা দপ্তর) যদিও জানাইতে চাহে না, তথাপি গোলযোগের কারণ স্পষ্ট। জাপান কর্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণের কাজে ভারতীয়দের আন্দোলনকে কিকান ব্যবহার করিতে চায়। কাউন্সিল অব্ এ্যাকসন ইহার বিরুদ্ধে লড়িতেছে।

(গ) নভেম্বর ১৫, ১৯৪২। শ্রীরা—প্রকাশ্যভাবে জাপানীদের ঔদ্ধত্যের (স্বরাজ বিদ্যালয় হইতে ছাত্রদের গোপনে ধরিয়া লইয়া ভারতে প্রেরণের) নিন্দা করিয়াছেন। তিনি কিকানকে জানান যে, তাঁহার বিদ্যালয় জাপানীদের জন্য গুপ্তচর প্রস্তুত করিবার কারখানা নহে। কোন ভারতবাসীকেই তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জাপ-বাহিনীর জন্য কাজ করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে না।

(ঘ) ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৪২। কাউন্সিল বর্মায় ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের প্রতিবাদ জানাইয়াছে এবং কোন ভারতীয়কে প্রেরণ করিতে অস্বীকার করিয়াছে।

(ঙ) ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৪২। সৈন্যবাহী জাহাজটি শূন্য অবস্থায় ফিরিয়া যায়। আমি শুনিয়াছি যে, Independence Leagueএর নেতৃবর্গের এই ব্যবস্থার ফলে জাপানীদের চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশ আক্রমণের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। (Rebel Daughter's Diary ১৫৮-২৫ পৃঃ)

এই ঘটনার পরে জাতীয় বাহিনীর কমাণ্ডিং অফিসার মোহন সিং গ্রেফ্‌তার হন। মোহন সিং সম্পূর্ণ জাপ-বিরোধী ছিলেন। তিনি আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজকে কোন ক্রমেই জাপানের তাঁবেদার বাহিনীতে পরিণত হইতে দেন নাই।

অতঃপর, ১৯৪৩ সালের ৪ঠা জুলাই সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। পরে ১৯৪৩ সালের ২১ শে অক্টোবর নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট বা আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়া তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন—"জাতীয় বাহিনীর গঠন পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতার আন্দোলনকে একটা বাস্তবরূপ দান করিয়াছে—ইহাতে আমাদের আন্দোলন অভূতপূর্ব গুরুত্বলাভ করিয়াছে—এই ফৌজ গঠিত না হইলে পূর্ব-এশিয়ায় এই স্বাধীনতা লীগ কেবল একটি প্রচারকার্য্যমূলক প্রতিষ্ঠান হইয়াই থাকিত। জাতীয় বাহিনী গঠনের দ্বারাই অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট স্থাপন সম্ভব হইয়াছে। এই গভর্ণমেণ্ট ভারতের স্বাধীনতার জন্য চূড়ান্ত সংগ্রাম আরম্ভ ও পরিচালনা করিবে।"

সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ্‌ বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন—"আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজই ভারতের একমাত্র প্রতিনিধিত্ব-মূলক জাতীয় বাহিনী। জাপানীদের সহিত এই বাহিনীর কোন সংশ্রব নাই। ইহার নীতি, কার্য্যকলাপ ও নেতৃত্ব ভারতীয় দেশপ্রেমিক নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হইবে। জাপানীদের ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার কোন অধিকার নাই। কোনরূপ বৈদেশিক কর্তৃত্ব এমন কি একজন বিদেশী সৈন্যকেও ভারতবর্ষ স্বীকার করিবে না। জাপানীরা যদি বলে যে, তাহারা ব্রিটিশের কবল হইতে মুক্ত করিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দান করিতেছে, তথাপি আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ তাহাদিগকে অন্যায় আক্রমণকারী বলিয়াই গণ্য করিবে। একমাত্র ভারতের নিজস্ব বাহিনীই ব্রিটিশের কবল হইতে

ভারতবর্ষকে মুক্ত করিতে পারে। জাপানীদের সামরিক কৌশলও নীতিদ্বারা এই ভারতীয় বাহিনী কখনই চালিত হইতে পারে না। জাপানীদের নীতির সহিত ইহার কোনওরূপ সংশ্রব থাকিলে ইহা পঞ্চম-বাহিনী বলিয়াই ইতিহাসে নিন্দিত হইবে।”

১৯৪২ সালের ২৬শে এপ্রিল সুভাষচন্দ্র বার্লিন হইতে বেতার বক্তৃতায় বলেন, “ত্রিশক্তির পক্ষে ওকালতি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার কর্ত্তব্য ভারতবর্ষ সম্পর্কে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হইলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারিবে। পক্ষান্তরে কোনওক্রমে যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই যুদ্ধে টিকিয়া যায় ভারতবাসীর দাসত্বের মেয়াদ তাহা হইলে সুদীর্ঘ-কালের জন্য বৃদ্ধি পাইবে। স্বাধীনতা ও দাসত্ব এই দুইটির মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে হইবে। বৃটেনের ভাড়াটিয়া প্রচারকগণ আমাকে শত্রুর চর বলিয়া অভিহিত করিতেছে, ভারতবাসীর নিকট নূতন করিয়া আত্ম-পরিচয় দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। আমার গোটা জীবনের ইতিহাসই আমার উদ্দেশ্যের সততার সাক্ষ্য দিবে। আমার সমগ্র জীবনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরবিচ্ছিন্ন এবং আপোষহীন সংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাস। চিরকাল আমি ভারতবর্ষের সেবক থাকিব। আমার মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি ভারতবর্ষের সেবকই থাকিব। পৃথিবীর যে অংশেই আমি বাস করি না কেন একমাত্র ভারতবর্ষের প্রতিই আমার আনুগত্য ও অনুরাগ আছে এবং চিরকাল থাকিবে।”

১৯৪৩ সালের ২০শে জুন সুভাষচন্দ্র সাবমেরিণ যোগে টোকিও পৌছেন। ২৯শে জুন পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি তিনি যে আবেদন প্রচার করেন তাহাতে প্রথমেই তিনি বলেন—“ভারতবর্ষকে মুক্ত করিবার দায়িত্ব আমাদেরই—আর কাহারও নহে। আমরা এই দায়িত্ব অপর কাহারও উপর চাপাইতে চাহি না। কারণ, এইরূপ করিলে তাহা জাতীয় মর্য্যাদার অবমাননাকর হইবে।” আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টের কর্ণধাররূপে
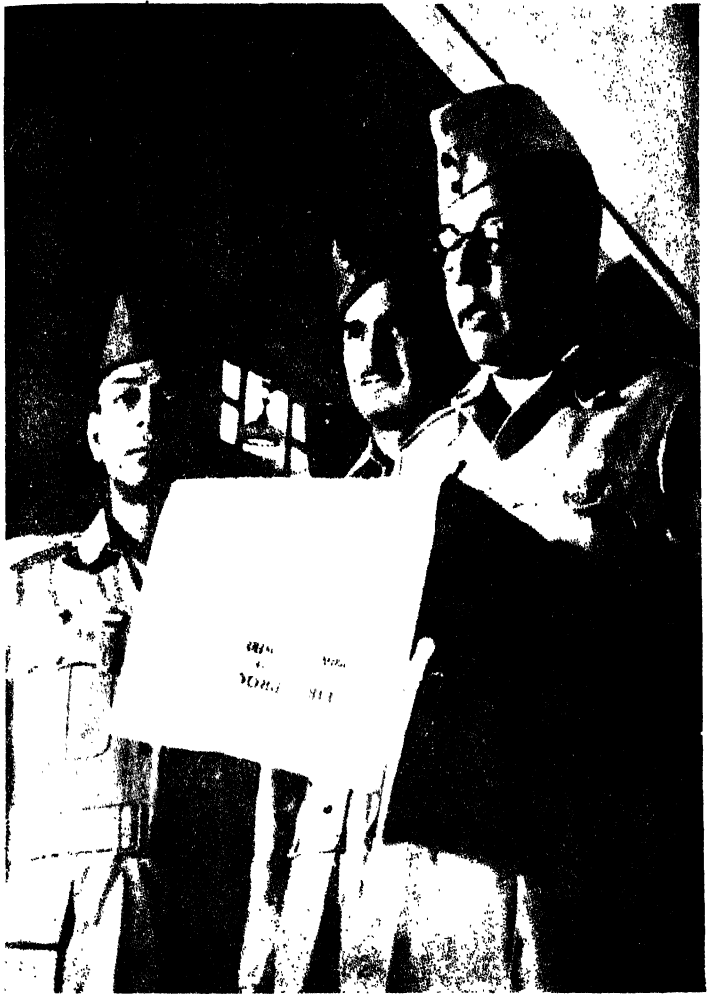
বামে মেঃ জেঃ এ, সি, চ্যাটাৰ্জ্জী, মধ্যে মেঃ জেঃ কিয়াণী
ও দক্ষিণে নেতাজী সুভাষচন্দ্র

সুভাষচন্দ্র অপর এক ঘোষণায় বলেন—"When the Azad Hind Fauz launches its fight, it will do so under the leadership of its Government and when it marches into India, the administration of liberated tracts will automatically come into the hands of the Provisional Government. India's liberation shall be achieved by Indian effort and sacrifice through our own Fauz."

সুভাষচন্দ্র জানিতেন যে কূটনীতি এবং রাষ্ট্রনীতির দ্বারা জাপানীদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করা সম্ভব হইলেও নিজেদের দুর্বলতার ফলেই জাপানীরা হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ পাইবে। সেই সকল দুর্বলতা যাহাতে দেখা দিতে না পারে সেজন্য সুভাষচন্দ্র সর্বদাই জাগ্রত দৃষ্টি রাখিতেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের শিক্ষার ব্যাপারে তিনি কোন জাপানী শিক্ষাদাতা নিয়োজিত হইতে দেন নাই। আজাদ হিন্দ ফৌজের সহিত কোন জাপানী অফিসারও সংশ্লিষ্ট ছিল না। শিক্ষায় এবং রণক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ ফৌজ পরিপূর্ণভাবে ভারতীয়ের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত ছিল। লেঃ নাগ তাঁহার সাক্ষ্যে স্বীকার করিয়াছেন—"The whole of the Indian National Army was trained by Indian officers and not by Japanese officers. It was entirely and throughout officered by Indian officers and not by Japanese officers. The colours of the Indian National Army were the Indian National Congress colours i.e. saffron white and green. Their badges were distinct from the Japanese badges. The chocolate coloured star with red centre on the arm band with Congress flags marked I. N. A. was resented by the personnel of the I. N. A. as it might be mistaken for

the rising sun of Japan. Its use was discontinued in the 2nd. I. N. A."

আর্থিক ব্যাপারেও যাহাতে পরমুখোপেক্ষী হইতে না হয় সে দিকে সুভাষচন্দ্রের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। আজাদহিন্দ আন্দোলনের সমুদয় ব্যয়ভার প্রবাসী ভারতীয়েরাই বহন করিত। দরিদ্রতম শ্রমিক হইতে শ্রেষ্ঠতম ধনী সকলেই আজাদহিন্দ আন্দোলনে তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব দান করেন। একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে আজাদহিন্দ আন্দোলনের জন্য কোন বিদেশী গভর্ণমেণ্টের আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করা হয় নাই। ১৯৪৪ সালের ১লা জুলাই শ্রীমতী ম'-লিখিত "বিদ্রোহী তনয়ার ডায়েরী"তে লিখিত হইয়াছে— "আর্থিক কৃচ্ছ্রতাসত্ত্বেও আমরা জাপ সরকার বা অন্যকোন গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ধার লইতে অস্বীকার করিয়াছি। আমরা জানি আজ যদি কর্জ লই, কাল আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে বিপন্ন করিব। কাজেই মিত্রদের নিকট হইতেও ধার গ্রহণ করিনা। আমরা ধার লইতে অসম্মতি জানাইয়াছি। আমাদের অর্থ সংগ্রহের মূলনীতি—ভারতবাসীরা তাহাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াইবে। এই নীতির ফলেই জাপানীদের সহিত ব্যবহারে আমরা অনেকখানি স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছি। ইহা আমাদের জঘন্যতম শত্রু ও কুৎসারটনাকারীদের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। আমাদের সমস্ত কর্মপন্থার মধ্যে এমন একটি বিষয় নাই যাহা লক্ষ্য করিয়া তাহারা বলিতে পারিবে যে আমরা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করিয়াছি।"

আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন রাষ্ট্রহিসাবে স্বীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত আজাদহিন্দ ফৌজ যুদ্ধ সুরু করে নাই। একথা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা প্রয়োজন; কেননা, তাঁবেদার বাহিনী হইলে তাহারা বহুপূর্বেই জাপানীগণ কর্তৃ ব্যবহৃত হইতে পারিত। পররাষ্ট্রনীতিতেও আজাদী গভর্ণমেণ্ট তাহার স্বতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছিল। বৃটেন ও

আমেরিকা ভিন্ন অপর কোনও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাহারা যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই। রাশিয়ার প্রতি আজাদহিন্দ সরকারের কোনরূপ বিদ্বেষ ভাব ছিল না। ব্রিটিশ ব্রড্কাষ্টিং কর্পোরেশন পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছে যে, সুভাষচন্দ্র কোনদিন সোভিয়েট বিরোধী কোন বক্তৃতা বা মন্তব্য করেন নাই। জাপানীরা যে, কোন দিক দিয়াই আজাদহিন্দ সরকারের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে নাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যখন আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের নিকট জাপ রাজদূত উপস্থিত হইয়াও স্বীকৃতিলাভ করেন নাই; কেননা, উপযুক্ত নিয়োগপত্র তিনি আনিতে পারেন নাই। জাপরাজদূত মিঃ হাচিয়ার সহিত সুভাষচন্দ্র সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করেন।

১৯৪৪ সালে ব্রহ্মদেশে সামরিক অভিযান সুরু হইলে জাপানীরা স্থির করে যে একজন জাপ সামরিক কর্মচারীর অধিনায়কত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং জাপবাহিনীর একটি সম্মিলিত কমিটি গঠিত হইবে। কিন্তু জাপানী অধিনায়কের নিয়োগের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের আপত্তি থাকায় উহা অগ্রাহ্য হয়। এভিন্ন মণিপুর অভিযান সুরু হইবার পূর্বেই আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে জাপ সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিবলে সমগ্র অধিকৃত অঞ্চল আজাদহিন্দ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃত শাসিত হইবে এবং সেখানে কোন প্রকার জাপানী ব্যবসা-বাণিজ্য চলিতে পারিবে না এরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে অধিকৃত রণসম্ভারও আজাদহিন্দ গভর্ণমেণ্টের হইবে এইরূপ কথা হয়।

জাপানীরা আজাদ হিন্দ ফৌজের এই আত্ম-নির্ভরশীলতার কর্মপন্থাকে সুনজরে দেখেন নাই। সুতরাং মিত্ররাষ্ট্রহিসাবে তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে আজাদী ফৌজকে কোন সাহায্য করে নাই। সংবাদ যোগাযোগের জন্য আজাদী ফৌজের কোন বেতার যন্ত্র ছিল না; ফলে, ট্রেনে করিয়া পত্রবাহকের সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ করিতে হইত। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচারের জন্য কোন

মাইক্রোফোন তাহাদের দেওয়া হয় নাই, এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রে ঔষধ ও খাদ্য সম্পর্কেও জাপানীরা আজাদী সৈনিকদের প্রতি নিদারুণ দুর্ব্যবহার করে। কোনপ্রকার সাহায্য করিতেই তাহারা প্রস্তুত ছিলনা। একথা নিশ্চয়ই গর্বের বিষয় যে আজাদহিন্দ্ ফৌজ শত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াও স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছিল, সামান্য সুবিধার জন্য জাপানীদের দাসত্ব স্বীকার করে নাই।

"কবে ভারত বুঝিবে যে নেতাজী নিঃশব্দে স্বদেশের জন্য কী মহৎ কাজ করিয়াছেন—কি ভাবে তিনি কলিকাতা, জামসেদপুর, মাদ্রাজ ও অন্যান্য জনবহুল সহরগুলিকে জাপানী আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। শ্রী রা—আমাকে বলিয়াছে যে আজাদ হিন্দ্ সরকার জাপানীদের হাত বাঁধিয়া রাখিয়াছে। জাপানকে জানাইয়া দিয়াছে যে, আমরা ভারতবর্ষ ধ্বংসসাধনের সহায়ক হইতে পারি না। ভারত সুপক্ক আপেল ফলের ন্যায় আমাদের হাতে আসিয়া পড়িবে।" (বিদ্রোহী তনয়ার ডায়েরী)

পূর্ব এশিয়ার আজাদ হিন্দ অন্দোলনের সহিত কংগ্রেসের আন্দোলনের আদর্শগত কোন পার্থক্য ছিলনা। পূর্ব এশিয়ার ভারতবাসী চিরকাল ভারতের জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক কংগ্রেসকে আপনার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিত। যখন স্বাধীনতা লীগের প্রতিষ্ঠা হয় তখনও ইহা কংগ্রেসের আদর্শে অনুপ্রাণিত কংগ্রেস আন্দোলনেরই একটি শাখা হিসাবে গঠিত হয়। ব্যাঙ্কক সম্মেলনে আজাদ হিন্দ লীগের মূলনীতি নির্দ্ধারিত হয়—এই সংঘ কংগ্রেসের আদর্শে গঠিত হইবে, ভারতীয় জাতায় কংগ্রেসের আদর্শ অনুসরণ করিয়া আজাদ হিন্দ সংঘের আদর্শ, কর্ম্মপদ্ধতি ও ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের সকল পরিকল্পনা গঠিত হইবে। আজাদ হিন্দ সংঘ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া চলিবে এবং কংগ্রেস আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে সহায়তা করিবে। সুভাষচন্দ্র যখন ড্রেসডেনে

ছিলেন তখনকার কথা বলিতে গিয়া মিঃ সামন্ত তাঁহার বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—"একদিন নেতাজী আমাদের বলিলেন যদি তোমরা মনে করিয়া থাক আমি নিজের স্বার্থের জন্য স্বদেশ ছাড়িয়া আসিয়াছি তাহা হইলে তোমরা আমাকে ভুল বুঝিবে। যদি তোমরা মনে করিয়া থাক যে আমি কংগ্রেস এবং গান্ধীজীর সঙ্গে বিরোধিতা করিয়া বহির্জগতে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে ও সুনাম অর্জন করিতে আসিয়াছি তাহা হইলেও তোমরা ভুল করিবে। আমি এখানে নিজের স্বার্থের জন্য পরিশ্রম ও কষ্টভোগ করিতে আসি নাই। আমি আসিয়াছি ভারতকে বৃটিশের প্রভুত্ব হইতে মুক্ত করিতে। যখন আমার এই প্রচেষ্টা সফল হইবে তখন আমি স্বাধীন ভারতকে সঙ্গে লইয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করিব এবং মহাত্মা গান্ধীর চরণে নিবেদন করিয়া বলিব 'আপনার স্বাধীন ভারতের ভার আপনি স্বহস্তে গ্রহণ করুন।'"

ভারতবর্ষে কংগ্রেসের প্রত্যেকটি কর্ম্মপন্থা পূর্ব এশিয়ার ভারবাসীর আন্দোলনকে প্রভাবিত করে। ১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্ট কংগ্রেস যখন 'ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ কর' দাবী উত্থাপন করিয়া 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' আহ্বানে দেশবাসীকে প্রস্তুত হইতে বলিল তখন পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতা লীগ উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়। আগষ্ট আন্দোলন যখন ভারতে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করিল তখন স্বাধীনতা সংঘ সেই আন্দোলনে সাহায্য করিবার জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম করে। পূর্ব-এশিয়াবাসী জানিত যে, আগষ্ট প্রস্তাবে ফ্যাসিস্ত শক্তিদের সমর্থন করা হয় নাই। চীন ও রাশিয়ার গৌরবময় সংগ্রামে সহানুভূতি জানান হইয়াছে। সুতরাং তাহারা সর্বদাই সজাগ ছিল যাহাতে জাপানের প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া তাহারা কংগ্রেসের আদর্শকে লাঞ্ছিত না করে। সুভাষচন্দ্র পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করিবার পর এই আদর্শ-গত ঐক্য আরও বৃদ্ধি পায়। সুভাষচন্দ্র আজীবন কাল কংগ্রেসের সেবক।

তিনি উপর্যুপরি দুইবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। সুতরাং কংগ্রেসের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবার কোন সম্ভাবনাই তাঁহার ছিল না। সুভাষচন্দ্র জানিতেন যে ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক 'প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস। ভারতবাসী তাহাকে সম্মান করে, শ্রদ্ধাকরে এবং তাহারই ভিতর তাঁহাদের জাতীয় জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার আদর্শ ও সমস্যার সমাধান দেখিতে পায়। ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশ শাসন অপসারিত করিবার বৃহত্তম অস্ত্র কংগ্রেস—ভারতবর্ষে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র গঠনের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস। সুতরাং কংগ্রেসকে বাদ দিয়া বা তাহার আদর্শকে পরিত্যাগ করিয়া কোন আন্দোলন হইলে সে আন্দোলন ভারতবাসীর সমর্থন লাভ করিবেনা। পূর্ব এশিয়ায় গঠিত ফৌজ এবং গভর্ণমেণ্টকে যদি চিরতরে ভারতবর্ষে কায়েম করিবার চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে ভারতের জনগণ তাহা গ্রহণ করিবে না। সেই জন্যই সুভাষচন্দ্র গঠন করিলেন অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট যে গভর্ণমেণ্ট পরে ভারতবর্ষে ভারতবাসীর ইচ্ছানুযায়ী গঠিত স্থায়ী গভর্ণমেণ্টে পরিণত হইবে।

১৯৪৩ সালের ২৩ শে অক্টোবর সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের ঘোষণায় বলেন,—"অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ত্তব্য হইল ব্রিটিশ ও তাহার মিত্রদের ভারতভূমি হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করা। ইহার পর অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য জনগণের ইচ্ছানুসারে এবং তাহাদের বিশ্বাসভাজন স্থায়ী জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা। ব্রিটিশ এবং তাহার মিত্রবর্গ বিতাড়িত হইবার পর যতদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হইবে ততদিন অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট জনগণের পরিপূর্ণ আস্থাভাজন হইয়া সাময়িক ভাবে দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করিবে।"

"অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক ভারতীয়ের আনুগত্য ও বিশ্বাস লাভ করিবার যোগ্য। এই গভর্ণমেণ্ট ধর্ম্মগত স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিতেছে,

এবং সমস্ত অধিবাসীর সমান অধিকার ও সমান সুযোগ-সুবিধার দাবী স্বীকার করে। এই গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিতেছে, বিদেশী-সরকার-সৃষ্ট দুরভিসন্ধিপ্রসূত সর্বপ্রকার বিভেদ ও বৈষম্য অতিক্রম করিয়া ইহা দেশের সকল সন্তানদের সমানভাবে পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং ইহা দেশের সকল সম্প্রদায়ের সুখ-সমৃদ্ধি বিধানের পথে সর্বতোভাবে অগ্রসর হইতে কৃতসংকল্প।"

১৯৪৪ সালের ৫ই জুলাই নেতাজী সপ্তাহের দ্বিতীয় দিবসে সুভাষচন্দ্র ফৌজের উদ্দেশ্যে বলেন—"অস্থায়ী আজাদহিন্দ গভর্ণমেণ্টের সামরিক মুখপত্র হইল এই আজাদ হিন্দ ফৌজ। অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট ও তাহার সেনাদল ভারতমাতার সেবক। তাহাদের কর্ত্তব্য যুদ্ধ করিয়া ভারতবাসীকে মুক্ত করা। স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইলে ভারতবর্ষে কোন্ ধরণের গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইবে ভারতের জনসাধারণই তাহা স্থির করিবে। স্বাধীনভারতে এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট সেদিন ভারতবাসীর ইচ্ছানুযায়ী গঠিত স্থায়ী গভর্ণমেণ্টের জন্য আসন ছাড়িয়া দিবে। আমরা সেই গৌরবময় দিনের প্রতীক্ষা করিয়া আছি। আজ তাহার জন্যই আমরা সংগ্রাম করিতেছি।"

৬ই জুলাই সুভাষচন্দ্র মহাত্মাগান্ধীর উদ্দেশ্যে প্রচারিত এক বেতার বক্তৃতায় বলেন—"এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের লক্ষ্য সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা ভারতবর্ষকে বৃটিশের কবল হইতে মুক্ত করা। ভারতবর্ষ হইতে আমাদের শত্রুগণ বিতাড়িত হইলে এবং শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপিত হইলে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের কাজ নিঃশেষিত হইবে। আমাদের চেষ্টা, আমাদের উদ্যম, আমাদের ত্যাগ ও দুঃখ স্বীকারের জন্য আমরা একটি মাত্র পুরস্কার পাইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইতেছে আমাদের মাতৃভূমির শৃঙ্খল-মোচন। আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাহারা একবার ভারত স্বাধীন হইলে রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। যদি কোনক্রমে আমাদের স্বদেশবাসিগণ ভারতবর্ষে থাকিয়াই

নিজেদের চেষ্টা ও কার্য্যের দ্বারা নিজেদের মুক্ত করিতে পারিত অথবা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারত ত্যাগের প্রস্তাব মানিয়া লইয়া এই প্রস্তাব অনুসারে কাজ করিত তাহা হইলে আমাদের অপেক্ষা কেহই বেশী সুখী হইত না ।”

১৯৪৪ সালের ১লা আগষ্ট তিলক-জয়ন্তী উপলক্ষে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট-কর্মিগণের সহভোজন উৎসব হয়। সুভাষচন্দ্রকে কোন একজন প্রশ্ন করেন, গান্ধীজী ও তাঁহার মধ্যে যে মত বিরোধ রহিয়াছে তাহা কিরূপে মিটিতে পারে। সুভাষচন্দ্র বলেন, “আমরা পূর্ব প্রাচ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা স্থির করিয়াছি। এই পরিকল্পনা ভালই হউক কি মন্দই হোক যতক্ষণ অন্য পরিকল্পনা না পাইতেছি ততক্ষণ এই পরিকল্পনা অনুযায়ীই কাজ চলিবে। অপর যে একটি মাত্র পরিকল্পনা মহাত্মাগান্ধী কর্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহা হইতেছে—কংগ্রেসের ‘ভারত ত্যাগ কর’ প্রস্তাব। যদি ঐ পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হয় আমাদের পরিকল্পনা ও কার্য্যক্রম অনাবশ্যক বলিয়া পরিগণিত হইবে। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে আমি নিজেই সকলের চেয়ে বেশী সুখী হইতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গান্ধীজীর সেই পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এখন ভারতের স্বাধীনতা লাভের সমস্ত আশা আমাদের পরিকল্পনার কৃতকার্য্যতার উপরই নির্ভর করিতেছে। গান্ধীজীর পরিকল্পনা আমাদের পরিকল্পনা অপেক্ষা সহজপথ নির্দিষ্ট করিয়াছে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সে পরিকল্পনাকে আমল দেন নাই। এমতাবস্থায় গান্ধিজীর পরিকল্পনাকে কার্য্যেরূপ দিতে হইলে ব্রিটিশকে বাধ্য করিবার জন্যই আমাদের পরিকল্পনা জয়যুক্ত হওয়া অবশ্যপ্রয়োজন।”

“একটি মাত্র পথ আছে যাহাতে ব্রিটিশ আমাদের পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে। তাহা সম্ভব হইবে যদি ব্রিটিশ ‘ভারত ত্যাগ কর’ প্রস্তাবের ভিত্তিতে গান্ধিজী ও কংগ্রেসের সহিত রফা করে। যদি বিটিশ

ভারতবর্ষ ত্যাগ করে তবে আমি এই মুহূর্তে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভাঙ্গিয়া দিতে আপনাদিগকে অনুরোধ করিব।' পূর্ব এশিয়ায় সুভাষচন্দ্র তাঁহার প্রতিটি বক্তৃতায় ঘোষণা করিতেন যে, তিনি কংগ্রেসের এবং ভারতবাসীর সেবক মাত্র।

কংগ্রেসের অহিংসা নীতির সহিত আজাদ হিন্দ বাহিনীর আপাত-দৃষ্টিতে বিরোধিতা দেখা যায় সত্য কিন্তু একথা সর্বজনবিদিত যে কংগ্রেস ভারতবাসীর বর্তমান নিরস্ত্র অবস্থা দেখিয়াই প্রথমে অহিংসানীতি গ্রহণ করে। ১৯২১ সালের আন্দোলনের পূর্বে নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজী ঘোষণা করেন, "আজ যদি ভারতের তরবারি থাকিত তবে সে তরবারি লইয়াই সংগ্রাম করিত।" ভারতবাসীর তরবারি নাই তাই অহিংস সংগ্রামের নীতি গৃহীত হয়। অধিকন্তু, কংগ্রেসের বহু প্রবীণ নেতাও অহিংস নীতিতে সম্পূর্ণ আস্থাবান থাকিতে পারেন নাই। কংগ্রেস কোন দল নহে, ইহা সর্বদলের সম্মিলিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান—সকল ভারতীয়ের এক মহাসম্মেলন। এখানে চিরকালই বহুমতবিশিষ্ট ব্যক্তি বা দল থাকিবে। সুতরাং, কংগ্রেসের ইতিহাসের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে এবং পূর্ব এশিয়ার বিশেষ অবস্থার কথা স্মরণ করিলে এই বিরোধের তেমন গুরুত্ব নাই। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে কংগ্রেসে 'অহিংসা' নীতি যুদ্ধকৌশল (technique) হিসাবেই গৃহীত হইয়াছে। ১৯৪২ সালের ৭ই-৮ই আগষ্ট A. I. C. C.'র সভায় Quit India প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া গান্ধীজী বলিয়াছিলেন, "I ask you to accept it (non-violence) as a matter of policy."

আজাদ-হিন্দ-আন্দোলনের উদ্দেশ্য একনায়কত্ব স্থাপন করা ছিল না। সুভাষচন্দ্র পূর্ব এশিয়াবাসীর হৃদয়ে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাহারা তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার নিকট শপথ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া কত সৈনিক নিশ্চিত পরাজয়ের মুখেও

পশ্চাদপসরণে রাজী হয় নাই, সহাস্যবদনে মৃত্যু বরণ করিয়াছে। কিন্তু, সুভাষচন্দ্র জানিতেন, ভারতেও বহু নেতা আছেন যাঁহারা আত্মত্যাগের দ্বারা দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন। দেশবাসী তাঁহাদেরও জাতীয় নেতৃত্বের পুরোভাগে দেখিতে চায়। তাই সুভাষচন্দ্র কোন দিন তাঁহাকে লইয়া বীরপূজা করিতে উৎসাহ দেন নাই। তিনি প্রায়ই বলিতেন "বর্ত্তমানযুগে আমরা মানুষকে দেবতা বানাইয়া পূজা করি না। আমরা সকলের শ্রদ্ধা একজনের উপরই বর্ষণ করি না। আমাদের মনে রাখা উচিত যে ব্যক্তিবিশেষের অপেক্ষা আন্দোলন বড়। আমাদের এখানে কোন ব্যক্তিবিশেষের একনায়কত্ব নাই। আমরা সকলেই সহকর্মী ও যোদ্ধা" (বিদ্রোহিণী তনয়ার ডায়েরী—পৃঃ ৫২)।

৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৩—কুয়ালালামপুরে এক জনসভায় বক্তৃতা করিতে যাইবার সময় ষ্টেশনে তাঁহাকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করা হইলে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে সুভাষচন্দ্র বলেন: "আপনারা এই ধরণের বীরপূজা বরদাস্ত করিবেন না। ইহা আমাদের আন্দোলনের উপর চরম অভিশাপ ডাকিয়া আনিবে। উদ্দেশ্য ও আদর্শের জন্য আত্মোৎসর্গের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে ও স্বীকার করিয়া লইতে জনসাধারণকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কেবল এই পথেই তাহাদের উদ্যম পরিচালিত হওয়া উচিত। নেতারা সাময়িক। তাহারা আসেন এবং চলিয়া যান। কিন্তু আন্দোলন সব সময়েই চলিতে থাকিবে (ঐ পৃঃ ৫৬)।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর সম্মুখে বক্তৃতাদানকালে জেনারেল তোজো একবার ঘোষণা করেন যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে সুভাষচন্দ্র হইবেন তাহার প্রথম প্রেসিডেণ্ট। ইহাতে সুভাষচন্দ্র অসন্তুষ্ট হইয়া বলেন, "ভারতবর্ষে কে প্রেসিডেণ্ট হইবে সে কথা চিন্তা করিবার অধিকার জেনারেল তোজোর নাই। উহা ভারতবাসীর দায়িত্ব।" এইভাবে জাপানী ফ্যাসিষ্ট ডিক্টেটরদিগের পঙ্কিলতার ভিতরও সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের গনতান্ত্রিক আদর্শকে

অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্র অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ, নিষ্ঠা, অবিচলিত দেশপ্রেম ও মনোহর ব্যক্তিত্ববলে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন; কিন্তু কোনদিন তিনি গনতান্ত্রিকনীতির অবমাননা করেন নাই কিংবা একচ্ছত্র শাসন প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন নাই। নেতাজীর আদর্শ—All Power to the Indian masses

আজাদ হিন্দ ফৌজ দেশবাসীকে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দিয়াছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট নিজেদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রথম সামরিক বিচার সভায় আজাদ হিন্দ আন্দোলনের এক অপূর্ব বাণীর প্রচার করিয়া দেন। তাহারা তিনজন অফিসারকে বিচারের জন্য আনয়ন করেন, মেজর জেনারেল শাহ্‌নওয়াজ, কর্ণেল সেহগল ও কর্ণেল ধীলন—একজন মুসলমান, একজন হিন্দু ও একজন শিখ। তাঁহাদের একত্র উপস্থিতির ভিতর দিয়াই আজাদ হিন্দের অন্যতম আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই আদর্শ সর্বভারতের ঐক্য, সর্বজাতির ঐক্য। আজাদ হিন্দ ফৌজ সকল ধর্মাবলম্বী এবং সকল প্রদেশের অধিবাসী লইয়া গঠিত হইয়াছে। যে বৃটিশগভর্ণমেণ্ট চিরকাল প্রচার করিয়া আসিতেছে যে তাহারা চলিয়া গেলে ভারতবর্ষ বিভিন্ন ধর্ম্ম ও জাতির আত্ম-কলহেই ধ্বংস হইবে, তাহাদের সম্মুখেই প্রমাণিত হইল যে রণক্ষেত্রে এবং জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভারতবাসীর ঐক্য সম্ভবপর। তাহারা প্রমাণ করিয়াছে যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের উপস্থিতিই ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদ ও কলহের মূলে। আজাদাবাহিনীর সর্বোচ্চ নেতা ছিলেন বাঙ্গালী—এই বাহিনীতে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হইতে আসাম পর্য্যন্ত এবং হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত সকল স্থানের ভারতবাসীই ছিল। যে গুর্খারা ভারতে বৃটিশ রাজত্বের শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ বলিয়া ঘৃণিত হয় তাহারাও দলে দলে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেয়। সকল ধর্ম্ম ও জাতির সমন্বয়ে গঠিত এই ফৌজে কোনদিন গোলযোগ বা বিভেদের সৃষ্টি

হয় নাই। বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম্ম বা জাতির উপস্থিতিতে ফৌজের আভ্যন্তরীন শৃঙ্খলা নষ্ট হয় নাই। বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীতেও যে সকল গোলযোগের কথা শুনা যায় এখানে তাহার কিছুই শুনা যায় নাই। ইহা যে কতবড় কৃতিত্বের কথা তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। বৃটিশ শাসনের কৃপায় এবং বহু যুগের দাসত্বের ফলে আমাদের দেশে বহু অন্ধসংস্কার শিকড় গাড়িয়াছে। বহু শিক্ষিত ও উন্নত সম্প্রদায়ও এই সকল কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা এখনও দেশের মধ্যে প্রবল। এই সকল বিভিন্ন মতাবলম্বীদের এক ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করা যে কতবড় সাংগঠনিক কৃতিত্বের পরিচয় তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। এই ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাহারা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। শিক্ষা, মিটিং ও বক্তৃতাদ্বারা ফৌজের সৈনিকদের বোঝান হইত। এভিন্ন ফৌজের ভিতর সহ-ভোজন প্রথা প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রান্নার ব্যবস্থা না করিয়া সকলেরই খাদ্য একস্থানে প্রস্তুত করা হইত। সকলে একত্র বসিয়া আহার করিত। কেবল আমিষ ও নিরামিষাশীর পার্থক্য বজায় রাখা হইত। এইভাবে ফৌজের ভিতর হইতে ঘৃণা, ছুৎমার্গ প্রভৃতি কুসংস্কার অবলুপ্ত হইয়া যায়।

ফৌজের ভিতর শিক্ষা এত উন্নত ধরণের ছিল যে, সেখানে কোন প্রকার ইতরজনোচিত আলোচনা হইত না। অথবা মদ্যপায়ী দেখিতে পাওয়া যাইত না। সকলেই এক মহান আদর্শে আত্মবলিদান করিয়াছিলেন।

শ্রীমতী ম' লিখিত বিদ্রোহিনী তনয়ার ডায়েরীতে নিম্নলিখিত মন্তব্যটি রহিয়াছে—

"স্বাধীনতালাভের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে সাম্প্রদায়িকতার সমাধি রচিত হইবে। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলনের সময় হিন্দুরা কি মুসলমানদের মসজিদে ও মুসলমানগণ কি

হিন্দুদের দেবালয়ে নিমন্ত্রিত হয় নাই? সাম্প্রদায়িকতা কেবল সেই সব দাস মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যেই বিস্তার লাভ করিতে পারে—যাহাদের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই, স্বাধীনতালাভের স্পৃহা নাই। সাম্প্রদায়িকতা আলস্যপরায়ণ ধনীর দুলালদেরই শোভা পায়—তাহারা দেশের শত্রু।"

১৯৪২ সালের ১২ই জুলাই শত্রুর প্রচারকার্য্য সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র এক বক্তৃতায় বলেন—"আমাদের শত্রুরা এক নূতন ধূয়া তুলিয়াছে যে এখানে ইসলাম লাঞ্ছিত হইতেছে—আমরা ইসলাম-বিরোধী। আপনারা জানেন এই অভিযোগ কিরূপ ভিত্তিহীন। আমাদের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট ও জাতীয় বাহিনীতে অনেক মুসলমান নিযুক্ত হইয়াছেন। ফৌজে যে সকল মুসলমান অফিসার আছেন তাহারা কেউ নগণ্য নন। তাহারা সকলেই অভিজাত মুসলমান বংশের সন্তান এবং তাহারা সকলেই দেরাদুন সমর বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। আমাদের শত্রুরা যাহাই কেন না বলুক তাহাদের এই মিথ্যা প্রচারে আমাদের কিছুই আসে যায় না। জগৎ তাহাদের এই মিথ্যায় কদাপি বিশ্বাস স্থাপন করিবে না।"

তেত্রিশ

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব।

"দেবতার দীপ্ত হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে। বন্ধনশৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা"

—রবীন্দ্রনাথ

"তুমি তো আমাদের মত সোজা মানুষ নও; তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ;......তাই তো দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ। দুর্গম পাহাড় পর্ব্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয়; কোন্ বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য তো প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল। কারাগার শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্ম্মিত হইয়াছিল—সেই তো তোমার গৌরব! তোমাকে অবহেলা করিবে সাধ্য কার? এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, সে তো কেবল তোমারই জন্য! দুঃখের দুঃসহ গুরুভার তুমি বহিতে পার বলিয়াই তো ভগবান এত বড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন! মুক্তিপথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের যে রাজ-বিদ্রোহী! তোমাকে শত কোটি নমস্কার!"

—শরৎচন্দ্র (পথের দাবী)

মণ্ডুকধর্মী আমরা উটপক্ষীর দৃষ্টিসহায়ে সফলতার গজকাঠি দিয়া মানুষকে বিচার করি। হ্যামলেটের ন্যায় নিষ্ক্রিয়তার পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া অসারযুক্তি ও অতিনৈতিকতার বেড়াজালে আমাদের কর্মশক্তি পঙ্গু হইয়াছে। ন্যায়-অন্যায় হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন আমাদের দৃষ্টিকে ঘোলাটে

করিয়া ফেলিয়াছে—রাজনৈতিক আলোচনায় অনাস্তর নৈতিক আদর্শ-প্রবণতা সহজ সত্য ও মীমাংসার পথ আচ্ছন্ন করিয়াছে। তাই, একপ্রকার শৌখিন নীতিবোধ সার্থকতা ও সাফল্যের বাটখারা দিয়া মানুষের ব্যক্তিত্ব ও কার্য্য কলাপকে তৌল করিয়া লইতেই আমরা অভ্যস্ত। রাজদ্রোহী জর্জ্জ ওয়াশিংটন সাফল্য লাভ করিয়া শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিকরূপে বিশ্বপূজিত হইয়াছেন; আর সুভাষচন্দ্রের আপাতব্যর্থতা তাঁহাকে কুইস্‌লিং ও দেশদ্রোহী অপবাদ দিয়াছে! এই আত্মাদরস্ফীত যুক্তি-বিলাসীদের বালভাষিত বহুদর্শী প্রজ্ঞাবানদের হাসির খোরাক যোগায়। স্থূল পাণ্ডিত্যদম্ভ ও স্বার্থদুষ্ট সংস্কারের মোহবন্ধন উদার উন্মুক্ত বিচারের কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। তাই, মুক্তিসাধনের দুর্জ্জয় সঙ্কল্প ও ত্যাগমাহাত্ম্যের চেয়ে মনুষ্যত্ব বিচারে সফলতার সহজবোধ্য যুক্তিই অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইংরেজদের কুৎসিৎ অপপ্রচার ও মিথ্যাভাষণ, বিদেশীর কপোলকল্পিত ইতিবৃত্ত সুভাষচন্দ্রের অনিন্দ্য দেশপ্রেমকে যতই ব্যঙ্গ করুক না কেন সত্য কখনই প্রচ্ছন্ন থাকিবে না। ইংরাজের রাজদণ্ড সত্য ও ন্যায়ের কণ্ঠরোধ করিতে পারিবে না। সুভাষচন্দ্রের অলৌকিক প্রতিভা ও অসামান্য ব্যক্তিত্ব-গৌরব মিথ্যা ইতিহাসের অনুশাসনকে বিদ্রূপ করিয়া স্বকীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

"বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি করে পরিহাস
অট্টহাস্যরবে,—
তব পুণ্য চেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস—
এই জানে সবে॥"

"অয়ি ইতিবৃত্ত কথা, ক্ষান্ত করো মুখর ভাষণ।
ওগো মিথ্যাময়ী,
তোমার লিখন-'পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী।

যাহা মরিবার নহে তাহারে কেমনে চাপা দিবে
তব ব্যঙ্গবাণী।
যে তপস্যা সত্য তারে কেহ বাধা দিবে না ত্রিদিবে,
নিশ্চয় সে জানি॥"

এই পৃথিবীতে এমন দুই-একজন মানুষ দেখিতে পাই যাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের অভ্যস্ত বিচার-বুদ্ধি খাটে না—আমাদের মাপকাঠি দিয়া মাপিলে কিংবা আমাদের নিক্তিতে ওজন করিলে যাহাদের মনুষ্যত্বের ঠিক ঠিক পরিমাপ হয় না। আমাদের দৃষ্টি ক্ষুদ্র, আদর্শ ছোট, আমাদের জীবনের পরিধি সংকীর্ণ; কাজেই, আমাদের আদর্শ দিয়া তাঁহাদের বুঝিতে যাওয়া ভুল। হয়ত ইহাতে তাঁহাদের প্রাপ্য মর্য্যাদা দেওয়া হইবে না—আমাদের অকৃতজ্ঞতার মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইবে। অতীতে অনেক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে যাঁহারা মানুষের হাতে কেবল লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতনই সহিয়াছেন। তাঁহাদের অসাধারণত্বই বুঝি এই দুর্ভোগের জন্য দায়ী! কিন্তু তাঁহারা আত্মত্যাগের দ্বারাই আপনার প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছেন—নিঃশব্দে লাঞ্ছনা ও নির্যাতন সহ্য করিয়াই লোকের মনে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। কেবল তাহাই নয়, যুগে যুগে তাঁহারাই আমাদের নীতি ও আদর্শবোধকে উন্নত করিয়া দেন—বিচারবুদ্ধিকে জাগ্রত ও সংস্কার-মুক্ত করিয়া দেন। ইহাতেই তাঁহাদের জীবনের সার্থকতা—দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগের চরম পুরস্কার ইহাই। নিজেদের জীবনের বিনিময়ে তাঁহারা উচ্চতর আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়—অনাগত কালের যাত্রাপথে পথ-নির্দেশ দিয়া যায়—জগতের সভ্যতা ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে অক্ষয় অবদান রাখিয়া যায়। সুভাষচন্দ্র এই শ্রেণীর মানুষ। ভারতের অভ্যন্তরে তাঁহার রাজনৈতিক জীবন আপাত-দৃষ্টিতে ব্যর্থ হইয়াছে—বহির্দ্দেশে আজাদ হিন্দ আন্দোলন জয়যুক্ত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার অভ্রান্ত দূরদৃষ্টি, অপরিমেয় সাহস, প্রখর ব্যক্তিত্ব, তীক্ষ্ণ বিচারক্ষমতা ও অনন্ত-

লঃ কঃ সেগল

মেঃ জেঃ শা-নওয়

সুলভ রাজনীতিজ্ঞান ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছে—তাঁহার মহনীয় আত্মত্যাগ মুক্তি সংগ্রামের সৈনিকদের সম্মুখে এক অত্যুজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করিয়াছে। সুভাষচন্দ্রের আপাত-ব্যর্থতা ও পরাজয় বিদ্যুদ্গর্ভ মেঘের ন্যায় অন্তর্গূঢ় সাফল্যের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়াছে।

সুভাষচন্দ্রের কর্ম ও সাধনা দেশবাসীর আত্মচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া—আত্মশক্তিকে জাগ্রত করিয়া এক বিরাট ও অভূতপূর্ব্ব জাতীয় জাগরণ ও দেশপ্রেমের উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছে। জাতীয় মুক্তি-ব্রতে দীক্ষিত স্বাধীনতার সৈনিকেরা নেতাজীর জীবনবেদ হইতে নিষ্কাম স্বার্থ-কলুষহীন দেশসেবার পাঠ শিখিয়া লইবে—শিখিয়া লইবে অকপট ক্ষুরধার স্পষ্টভাষণ, অনির্বাণ আপোষহীন সংগ্রামশীলতা, শৃঙ্খলা ও সংযমসাধনা, সংগঠননৈপুণ্য ও বিপ্লবমূলক কর্মতৎপরতা গণ-সংযোগ-ও-সংগঠন-মূলক শৃঙ্খলানুগ কর্মানুরাগ। কর্মযোগী নেতাজীর জীবনাদর্শ আমাদের মুক্তিসাধনায় মহাজাতি-সদন গঠনের কাজে উৎসাহ দিবে—জীবন চর্চ্চায় ও চরিত্রগঠনে শক্তি ও প্রেরণা যোগাইবে। আসমুদ্রহিমাচল ভারতের কোটি কোটি নর-নারী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আজ সুভাষচন্দ্রের নাম জপ করিতেছে। তাহাদের অন্তরের রাজসিংহাসনে সুভাষচন্দ্রের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেছে—কালের অমোঘ শাসন তাঁহাকে টলাইতে পারিবে না

"হে রাজতপস্বী বীর, তোমার সে উদার ভাবনা
বিধির ভাণ্ডারে
সঞ্চিত হইয়া গেছে, কাল কভু তার এক কণা
পারে হরিবারে ?
তোমার সে প্রাণোৎসর্গ, স্বদেশলক্ষ্মীর পূজাঘরে
সে সত্যসাধন,
কে জানিত হয়ে গেছে চিরযুগযুগান্তর-তরে
ভারতের ধন।"

সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিয়া ও ভারতের বাহিরে জাতির মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনা করিয়া কংগ্রেস ও জনসাধারণের মধ্যে বিপুল শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক অখণ্ড স্বাধীন রাষ্ট্রের বন্ধনে বাঁধিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন মহাবিপ্লবী নেতাজী। এখানে ন্যায়-অন্যায়, হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন তুলিলে আমাদের বিচার-বুদ্ধিকে অযথা ভারাক্রান্ত, কুয়াসাচ্ছন্ন ও কার্পণ্যদুষ্ট করা হইবে। এই প্রশ্ন তুলিলে ভারতবর্ষের মহামানব রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, আকবর, শিবাজী প্রমুখ রাষ্ট্র নায়কদের কীর্ত্তিও ম্লান হইয়া যাইবে। জীবনের ব্যাপক ও বিস্তৃত পরিধিতে পূর্ণাবয়ব মনুষ্যত্ব সাধনার ভিত্তিতে মানবসেবা, মানবমুক্তি ও মাতৃভূমির মুক্তিসাধনায় চরম আত্মদানের মূল্য স্বীকার করিলে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের স্থান গ্রীকবীর লিওনিডাস, ইটালীর গ্যারিবল্ডী—ম্যাজিনি, ওয়াশিংটন, লেনিন, সান্-ইয়াৎ-সেন্, মাইকেল কলিন্স, ডি. ভ্যালেরা, কামাল আতাতুর্ক, জগলুল পাশা প্রমুখ প্রখ্যাতনামা আত্মত্যাগী রাষ্ট্রবীরদের পার্শ্বে সগৌরবে চিরকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেশবন্ধুর সম্বন্ধে তাঁহার একটি রচনায় লিখিয়াছিলেন, "পারাধীন দেশের সব চেয়ে বড় অভিশাপ এই যে, মুক্তি-সংগ্রামে বিদেশীদের অপেক্ষা দেশের লোকদের সঙ্গেই মানুষকে লড়াই করিতে হয় বেশী।" এই উক্তি সুভাষচন্দ্রের সম্বন্ধেই সমধিক প্রযোজ্য। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন কংগ্রেসী উপরওয়ালাদের "সারমেয় রাজনীতি"র বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ ও আপোষহীন সংগ্রামের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের সহিত মতবিরোধ নিদারুণ মর্মপীড়াদায়ক হইলেও সুভাষচন্দ্রের অসমান্য চারিত্রশক্তি ক্ষমতালোলুপ কংগ্রেসনায়কদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কাছে কদাচ পরাজয় স্বীকার করে নাই। কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একক

সংগ্রাম করিয়াছেন তথাপি সুভাষচন্দ্র স্বকীয় আদর্শ ও বিশ্বাসকে বিসর্জ্জন দেন নাই। শিবাদলমাঝে শার্দ্দুলের যে অবস্থা হয় স্বদেশে সুভাষচন্দ্রের অবস্থা কোথাও কোথাও অনুরূপই হইয়াছিল। উপযুক্ত ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র স্বকীয় মহিমায় প্রোজ্জ্বল হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। পরাধীন ভারতে পিঞ্জরাবদ্ধ যে ব্যাঘ্রের অমিতবিক্রম সুপ্ত অবস্থায় ছিল ভারতের বাহিরে তাহাই সহস্রধারায় অপূর্ব ভাস্বরদ্যুতি বিকিরণ করিয়া দিগ্মণ্ডল আলোক-রশ্মিচ্ছটায় উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি অনুকূল আবহাওয়ায় প্রদীপ্ত হইয়াছে। সুভাষচন্দ্রের যে ব্যক্তিত্ব, যে তেজোদৃপ্তরূপ আজ মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডের মত কিরণ জাল বিস্তার করিয়া অবিশ্বাসী, পরশ্রী-কাতর ও দীনাত্মা ব্যঙবিলাসীদের চোখ ঝলসাইয়া দিয়াছে ভারতবর্ষে তাঁহার সহকর্মীরাও পূর্বে তাহার সেই পরিচয় পান নাই। মহাত্মাজী বলিয়াছেন—"But a full knoweldge of his resourcefulness, soldiership and organizing abilities came to me only after his escape from India." কবির ভাষায় বলিতে পারি—

> "অখ্যাত অজ্ঞাত রহি দীর্ঘকাল হে রাজবৈরাগী,
> গিরিদরীতলে
> বর্ষার নির্ঝর যথা শৈল বিদারিয়া উঠে জাগি
> পরিপূর্ণ বলে
> সেই মতো বাহিরিলে,—বিশ্বলোক ভাবিল বিস্ময়ে
> যাহার পতাকা
> অম্বর আচ্ছন্ন করে, এত কাল এতক্ষুদ্র হ'য়ে
> কোথা ছিল ঢাকা।"

পূর্ব এশিয়ায় সংগ্রামরত ভারতসন্তানদের মধ্যে দেশপ্রেমের বিস্ময়কর উন্মাদনা ও কর্মতৎপরতা যাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছে—নেতাজীর পঞ্চাশতম জন্মদিবসে কলিকাতার বুকে জনসমুদ্রের উত্তাল জলধি তরঙ্গ

যাহারা দেখিয়াছে তাহাদের মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হইয়াছে—সুভাষচন্দ্রের এই অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা ও দেবদুর্লভ সম্মানের মূলে কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তি কাজ করিতেছে? কোন্ গুণে সুভাষচন্দ্র ভারত ও ভারতের বাহিরে কোটি কোটি মানবের মন হরণ করিয়া লইয়াছেন? কোন্ সম্মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া ধনী তাহার যথাসর্বস্ব সমর্পণ করিয়া পথের ভিক্ষুক সাজিয়াছে, মাতা প্রাণাধিক পুত্রকে স্বেচ্ছায় নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে, স্ত্রী তাহার প্রিয়তমা স্বামীকে রণসাজে সজ্জিত করিয়া মরণ-মহোৎসবে বিসর্জ্জন দিয়াছে—পুরুষ তাহার সমস্ত জীবনের সঞ্চয় দান করিয়াছে, নারী সর্বাঙ্গের অলংকার খুলিয়া দিয়া নিরাভরণা সাজিয়াছে? কোন্ যাদুমন্ত্রবলে নেতাজী অগণিত নর-নারীর হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছেন? ভারতের বাহিরে নেতাজীর যে দেবোপম চরিত্র, হৃদয়মাধুর্য্য, বীর্য্য ও প্রেমের অনবদ্য সমন্বয়, অনমনীয় ব্যক্তিত্ব অসংখ্য মানবের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল, যে অতুলনীয় সংগঠন প্রতিভা, উদ্ভাবনীশক্তি ও সমরনৈপুণ্য লোকবিশ্রুত আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট ও ফৌজের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে—জগতের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনা করিয়াছে তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করাও আমাদের অনভ্যস্ত ও অপটু লেখনীর অসাধ্য।

১৯৪৩ সালের ২রা জুলাই নেতাজী সিঙ্গাপুরে পৌছেন। ঐ দিনের শ্রীমতী ম' লিখিত "বিদ্রোহিণী তনয়ার ডায়েরী"তে নিম্নোক্ত বিবরণটি রহিয়াছে:—

"সুভাষবাবু আজি আসিলেন। স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সকলেই তাঁহাকে স্বাগত জানাইতে ছুটিল। ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও প্রশংসার সে এক শ্বাস-রোধ-কারী দৃশ্য! ভারতীয়, মালয়বাসী, চীনা ও জাপানীদের এক বিরাট জনসমুদ্র সেই মহাবিপ্লবীকে একবার চোখে দেখিবার জন্য আকুল আগ্রহে হুড়াহুড়ি করিয়া ছুটিল। অপেক্ষমান জনতার সে কী গভীর উৎকণ্ঠা!

ঋজুদৃঢ় ভংগী, গৌরবে অনমনীয় উচ্চ শির এবং মুখে ভুবনভুলানো হৃদয়-রঞ্জন হাসি লইয়া সুভাষবাবু সকলের চিত্ত হরণ করিলেন। মনে মনে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল—এই সেই নেতা যাঁহার উপর আমরা পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারি, যিনি আমাদের বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবেন। ফটোগ্রাফে তাঁহার চমৎকার অঙ্গ-সৌষ্ঠব ও পুরুষোচিত দীর্ঘ গঠন প্রকাশ পায় না। আমাদের চ্যানসারী লেনের অফিসে স্থানীয় কর্মীদের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের সময় আমি তাঁহাকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলাম। তাঁহার হাসির সম্মুখে কোন বিরোধিতাই টিকিতে পারে না।"

১৯৪৩ সালের ৯ই জুলাই বিদ্রোহিণী তনয়ার ডায়েরীতে লিখিত হইয়াছে :

"Netaji stands upright and erect as he speaks into the mike. He has few gestures. He does not indulge in hysterical oratory. In a sober, sedate, yet firm voice, he argues and argues and argues. Every man and woman in the audience feels that he is talking to him or her in particular. He indulges in no theatricals. No water to be sipped, nobody to fan him, not a scrap of notes to help memory, no fuss and no fluster of papers. He stands as if your father was standing in front of you, appealing to you, reasoning with you, emphatically appealing to the better side of your nature. You feel you must be a cad, a selfish brute, an anti-social creature not to co-operate with him, to refuse him the things he asks for. He is a spell-binder alright, but minus the hokus-pokus of a magician."

সার্থক নেতৃত্বের সবগুলি উপাদানই সুভাষ চরিত্রে পূর্ণমাত্রায় ছিল। সুভাষচন্দ্রের বাগ্মিতা সর্বদা শ্রোতৃবৃন্দের অন্তস্তল স্পর্শ করিত। তাঁহার অটল বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিতে কেহই সাহসী হইত না। তাঁহার ব্যক্তিত্বের চৌম্বক-শক্তি প্রভাবে প্রবলতম শত্রু ও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। মানব চরিত্রে তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টি বিরুদ্ধবাদীর দুর্বলস্থানটি দেখিতে পাইত। তাঁহার দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভাব-ভঙ্গিমা, অবিচলিত আত্মপ্রত্যয়, প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞান, সূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা, অকাট্য যুক্তি বিপক্ষীয়দের স্বপক্ষে আনিতে সমর্থ হইত। নেতাজীর বজ্রাদপি কঠোর ব্যক্তিত্বের সম্মুখে কূটচক্রী জাপানী রাষ্ট্রনায়কদের কুটিল চক্রান্ত শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। অনমনীয় দৃঢ়তার সহিত তিনি ভারতবাসীর স্বাজাত্য গৌরব ও আত্মসম্মানবোধকে জাপ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচণ্ডতম প্রতিরোধ ও প্রতিকূলতার মধ্যেও অপরিম্লান অটুট রাখিয়াছেন। নেতাজীর ব্যক্তিত্বের সামান্য পরিচয় তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্য ও সহকর্মী শা'নওয়াজের ভাষায় উদ্ধৃত করিতেছি—"It was Netaji who held aloft the prestige of India and the Indian masses. He raised the prestige of India to its highest pinnacle. He himself was worshipped in Japan and Germany as an incarnation of God. The people of Japan used to wonder and ask us how it was possible that a country which could produce a man like Netaji Subhas chandra Bose did remain in bondage so long."

১৯৪৪ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের 'বিদ্রোহিণী তনয়ার ডায়েরী'তে লিখিত হইয়াছে :

"অদ্য হেড্‌কোয়ার্টার্সে সুভাষবাবুর সংগে আমার দেখা হইল। তিনি

যে সময়ে বাহির হইয়া আসিতেছিলেন ঠিক সে সময়েই আমিও ভিতরে ঢুকিতেছিলাম। তাড়াতাড়ি আমি সৈনিকের ভঙ্গিতে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া 'জয় হিন্দ'. বলিয়া সামরিক কায়দায় অভিবাদন করিলাম··· ··আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'দিল্লী রেডিও আপনাকে স্বপ্নবিলাসী বলিয়া প্রচার করিয়াছে'।

নেতাজী একমিনিটকাল চুপ করিয়া রহিলেন। পরে তিনি উত্তর করিলেন। কথাগুলি অত্যন্ত ধীরভাবে বলিলেন—ক্রোধের ভাব একটুও প্রকাশ পাইল না। মনে হইতেছিল যেন প্রত্যেকটি কথা তিনি অন্তরের গভীর অন্তস্তল হইতে উচ্চারণ করিতেছেন। তিনি কহিলেন, 'ওরা আমাকে স্বপ্নবিলাসী বলে। আমি স্বীকার করি যে আমি স্বপ্নবিলাসী, সমস্ত জীবনই আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি। ছেলেবেলা হইতেই আমি স্বপ্নবিলাসী, কত স্বপ্নই না দেখিতাম! কিন্তু আমার সকল স্বপ্নের সেরা স্বপ্ন—আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় স্বপ্ন—যে স্বপ্ন আমি দেখিতে ভালবাসি তাহা হইতেছে ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন। ওরা মনে করে স্বপ্ন দেখাটা বুঝি একটা মস্ত দোষ। আমি কিন্তু ইহাতে গর্ব অনুভব করি। ওদের কাছে আমার স্বপ্ন ভাল লাগে না—কিন্তু সে ত নতুন কথা কিছু নয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্ন যদি না দেখিতাম তবে ত দাসত্বের শৃঙ্খলকেই শাশ্বত বলিয়া মানিয়া লইতাম। আসল প্রশ্ন হইতেছে, আমার স্বপ্ন সফল হইবে কি না। আমি দেখিতেছি দিনে দিনে আমার স্বপ্ন বাস্তবে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। এই যে ভারতের জন্য মুক্তি ফৌজ গঠিত হইল এ আমার একটি স্বপ্নের বাস্তবরূপ। না, তাহারা যে আমাকে স্বপ্ন বিলাসী বলে ইহাতে আমি কিছুই মনে করি না। আবহমান কাল হইতে স্বপ্নবিলাসীদের স্বপ্নের উপরেই বিশ্বের প্রগতি নির্ভর করিয়া আছে। সে স্বপ্ন অপরকে শোষণ করিবার স্বপ্ন নয়, সাম্রাজ্যবিস্তারের স্বপ্ন নয়, অন্যায়-অবিচারকে চিরস্থায়ী করিবার স্বপ্ন নয়—সে স্বপ্ন প্রগতির স্বপ্ন, বৃহত্তম

জনসংখ্যার প্রভূততম সুখ-সাধনের স্বপ্ন, সকল জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির স্বপ্ন।”

১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্র ম্যানিলায় আসিলে জাপানী সংবাদিক হাগিওয়ারা সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে নিম্নোক্ত সুন্দর বিবৃতিটি প্রদান করেন :

“১৯৪৩ সালে নভেম্বর মাসের ঘটনা। চমৎকার একটি দিন। ম্যানিলার সমুদ্রোপকূলে লুনেটা পার্কে সুভাষচন্দ্র গেলেন জোস রিজলের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করিতে। এই মূর্তিটি খুবই প্রসিদ্ধ, কেননা জোস রিজল ছিলেন ফিলিপাইনের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক এবং মুক্তি সংগ্রামের শহীদ। মূর্তির পাদদেশে শত শত ভারতীয়ের এক বিরাট জনতা সুভাষচন্দ্রকে ঘিরিয়া ধরিল। জনতা উচ্চকণ্ঠে মুহুর্মুহুঃ “জয় হিন্দ” ধ্বনিতে বসুকে জানাইল তাহাদের অভিনন্দন। ফটোগ্রাফাররা ফটো তুলিবে—বসুও দাঁড়াইলেন জনতার সংগে। ফটো লওয়া শেষ হইলে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল তিনি নড়েন না! জনতা নিস্তব্ধ—গম্ভীর নীরবতার মধ্যে মৌন, অচঞ্চল দৃষ্টিতে রিজলের মূর্তির দিকে সুভাষচন্দ্র তাকাইয়া রহিলেন। স্বাধীন ভারতের প্রতীক অঙ্কিত আজাদ হিন্দ পতাকা প্রভাত সমীরণে ইতস্ততঃ আন্দোলিত, বিরাট মূর্তির পাদদেশে সুভাষচন্দ্রের অর্পিত ফুলের রাশি—এক কথায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি উৎসবের রূপ ধারণ করিয়াছিল। সাগ্রহে প্রতীক্ষমান নীরব জনতার সম্মুখে তিনি সতৃষ্ণনয়নে মূর্তির দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

এইরূপ ঘটনায় হয়ত কেহ কেহ সুভাষচন্দ্রকে ভাবপ্রবণ বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু তাঁহার সহিত কখনও যদি কাহারও আলাপ হইয়া থাকে তাহার এই রকম ধারণা হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না। পক্ষান্তরে আমার বহু সহকর্মী আমাকে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা তাঁহার শান্ত-সমাহিত ভাব এবং গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়াছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁহার আচরণ ধীর, স্থির, অথচ অতীব দৃঢ়। তিনি কদাচিৎ হাসিতেন। কিন্তু হাসিলে মৃদু ও মধুর হাসি হাসিতেন। আমার মনে হয়, হৃদয়াবেগ ও ন্যায়যুক্তির মধ্যে তিনি অবিচলিত সাম্য রক্ষা করিয়া চলিতেন।"

হাগিওয়ারার বর্ণনায় সুভাষচন্দ্রের চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব, নিবিষ্ট ও ধ্যানগম্ভীর প্রকৃতি জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুক্তি সংগ্রামের শহিদের বিগ্রহ মুক্তি-পূজারী সুভাষচন্দ্রের অন্তরে এক অনির্ব্বচনীয় অনুভূতি জাগাইয়া দিয়াছে। হৃদয়াবেগ ও দৃঢ়চিত্ততা যুক্ত হইয়া তাঁহাকে দিব্যকান্তি ও অনুপম সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে।

সুভাষচন্দ্রের বিনয়-নম্র, অমায়িক ও মধুর ব্যবহার সকলের চিত্ত জয় করিয়া লইয়াছিল। তাঁহার স্নেহসিক্ত অন্তঃকরণ, ক্ষমাশীল উদার মনোভাব কঠোর ব্যক্তিত্বে কোমলতা ও মাধুর্য্য মাখাইয়া দিয়াছে। ১৯৪৩ সালের ৯ই জুলাই শ্রীমতী ম—তাঁহার "বিদ্রোহিনী তনয়ার ডায়েরী"তে লিখিয়াছেন—There is something very lovable in the way our Netaji behaves with the people. He is very considerate to woman and children. He is never rude, even when the crowd gets out of hand and jostles him in its keenness to see him or touch him. Yesterday Netaji visited our office. An old lady at the gate tried to touch his feet. He lifted her up and made her give him blessings on his bent hed. He called her 'mother'.

টোকিওতে বাল-সেনাদলের (Cadet corps) নিকট এক পত্রে সুভাষচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"I have no sons of my own; you are my sons." (আমার নিজের কোন ছেলে-মেয়ে নাই—তোমরাই

আমার ছেলে-মেয়ে !) নেতাজী তাঁহার প্রিয় বাল-সেনাদলকে কী গভীর স্নেহই না করিতেন !

একদিন সুভাষচন্দ্র এক সামরিক হাসপাতাল পরিদর্শনে আসিয়া দেখেন একটি সাধারণ সৈনিকের গায়ে কোট নাই—সে শীতে নিদারুণ কষ্ট পাইতেছে। নেতাজী তৎক্ষণাৎ নিজের কোটটি খুলিয়া সৈনিকের গায়ে পরাইয়া দিলেন। সৈনিকটি এই অপ্রত্যাশিত মহৎ দান গ্রহণ করিতে প্রথমে ইতঃস্তত: করিতেছিল কিন্তু নেতাজীর দান তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইল। সৈনিকটি শেষে কোটটি খুলিয়া রাখিয়া নেতাজীর কাছে শপথ করিল যে, ভারত স্বাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত নেতাজীর দেওয়া এই কোট সে ব্যবহার করিবে না।

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রিটীশ বিমান বাহিনী রেঙ্গুনের মিয়াং সহরে আজাদ হিন্দ ফৌজের হাসপাতালের উপর বোমা বর্ষণ করে। হাসপাতালের ছাদের উপর 'রেডক্রস' পতাকা উড়িতেছিল তৎসত্ত্বেও শত্রুসৈন্যেরা নিরীহ চলৎশক্তিরহিত আহত সৈনিকদের উপর বোমা ফেলে। এ সংবাদ পাওয়া মাত্রই নেতাজী অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন। 'এ কী নির্মম আক্রমণ রোগীদের উপর !' তিনি তৎক্ষণাৎ ড্রাইভারকে গাড়ী প্রস্তুত করিতে হুকুম দিলেন। তখনও অবিশ্রাম বোমা বৃষ্টি হইতেছে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নেতাজী নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া হাসপাতালে উপস্থিত হইলেন। সেখানে যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। 'এ-সব দুর্বল রোগীদের উপর শত্রুরা কি অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে !'—এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

নেতাজী রুগ্ন-অসুস্থ সৈন্যদের বিছানার পার্শ্বে বসিয়া তাহাদের সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন,—"আমি আর কে ? এরাই ত সব। এরাই ত স্বাধীন ভারতের বীর—দেশের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসাস্থল।"

১৯৪৪ সালের ২১ শে অক্টোবর নেতাজী মিংলাডনে প্রথম পদাতিক বাহিনীর সম্মুখে বক্তৃতা করিতেছিলেন। বক্তৃতা শেষ হইয়া আসিয়াছে ঠিক এমন সময় জাপ জঙ্গী বিমানকে মাথার উপর উড়িতে দেখা গেল। একটু পরেই বিমান আক্রমনের সঙ্কেতধ্বনি হইল। সংগে সংগে শত্রু-পক্ষেরও কতকগুলি বোমারু ও জঙ্গীবিমান আকাশে দেখা দিল। বিমান ঘাঁটি হইতে বিমান বিধ্বংসী কামানগুলি প্রচণ্ডভাবে গোলাবর্ষণ সুরু করিল। বিমানে বিমানে আকাশ ছাইয়া ফেলিল। নেতাজী তখন সৈন্যদলের অভিবাদন গ্রহণ করিতেছিলেন। তাঁহাকে নিরাপদ আশ্রয়ে যাইবার জন্য সকলেই অনেক পীড়াপীড়ি করিল। নেতাজী স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া সৈন্যদলের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া শুধু বলিলেন, "স্বাধীনতা সংগ্রামের এই তিন হাজার সেনা যদি নির্ভীকভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে তবে আমিই বা না পারিব কেন?"

নেতাজী নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। দিবারাত্রি সামান্য সৈনিকের ন্যায় অবিরত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যাইতেন। দিন রাত্রির মধ্যে দুই ঘণ্টা মাত্র নিদ্রা যাইতেন। হিন্দু, মুসলমান, মারাঠা, শিখ, খৃষ্টান সকলের সহিত একস্থানে বসিয়া আহার করিতেন। সকলে যে খাদ্য গ্রহণ করিত তিনিও তাহাই গ্রহণ করিতেন। সামরিক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের সদস্যদের সংগে পিস্তল ও তরবারি লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন ও সৈন্যদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। দিনের পর দিন তাহাদের সংগে থাকিয়া সমান দুঃখকষ্ট সহ্য করিতেন। রণক্ষেত্রে আসিবার সময় তিনি সাধারণ সৈনিকের মত মাত্র দশ দিনের খাদ্য-সামগ্রী পৃষ্ঠে বহিয়া আনিতেন।

স্বদেশে সুভাষচন্দ্র সাম্রাজ্যবাদী পেষণযন্ত্রে সতত নিষ্পিষ্ট হইয়া-ছিলেন—কারাগৃহের কঠোর শাসনে দুঃখভোগ ও কৃচ্ছ্রসাধনের অসাধারণ ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন; তাই, পূর্ব এশিয়ায় মুক্তি-সংগ্রামের সর্বাধি-

নায়কের পদে সমাসীন হইয়া সৈনিক জীবনের কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা ও দুঃখ-কষ্টকে তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে মানিয়া লইয়াছেন। সহকর্মীদের সুখ ও আরামের দিকে চাহিয়া নিজের সমস্ত সুখ-সম্ভোগ পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই কেহ তাঁহার জন্য চরম আত্মত্যাগেও কুণ্ঠিত হইত না। সুভাষচন্দ্রের অনিন্দ্য দেশপ্রেম তাহাদিগকে পবিত্র স্বদেশ-মন্ত্রে উজ্জীবিত করিয়াছিল—ত্যাগ ও সংগ্রামের মহান ব্রতে দীক্ষা দিয়াছিল।

১৯৪৪ সালের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র রেঙ্গুনের এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করেন। সভার প্রারম্ভে নেতাজীকে মাল্য ভূষিত করা হয়। বক্তৃতা করিবার সময় তিনি ফুলের মালাটি হাতে জড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। নেতাজীর বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে শ্রোতৃবর্গের উৎসাহ ও উদ্দীপনা চরমে উঠিল। হঠাৎ তিনি এক মতলব ফাঁদিলেন। সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহ তাঁহার মালাটি কিনিতে প্রস্তুত আছে কিনা। এই মালার বিক্রয়লব্ধ অর্থ ফৌজের ধনভাণ্ডারে যাইবে—ইহাও তিনি জানাইলেন।

সংগে সংগে দর উঠিতে লাগিল। প্রথম ডাক হইল ১ লক্ষ টাকার। এক লাখ—দেড় লাখ—তিন লাখ—চার—সোওয়া চার—ছয়, সাত—ক্রমেই দর চড়িতে লাগিল। এক ধনী পাঞ্জাবী যুবক সর্বপ্রথম দর হাঁকে। যত দর উঠিতে থাকে সেও দর বাড়াইতে থাকে। যখন সাত লাখ টাকা ডাক হইল যুবকটি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। কিন্তু নেতাজীর গলার মালাটি তাহার চাই-ই। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। সুভাষ-চন্দ্রের মঞ্চেরদিকে ছুটিয়া গিয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"নেতাজী, আমি আপনার মালার জন্য সর্বস্ব দিতে চাই—আমার শেষ কপর্দক পর্য্যন্ত।" বলিতে বলিতে উত্তেজনায় :যুবকটি কাঁপিতে লাগিল। সুভাষচন্দ্র দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া: কহিলেন : "তোমার

স্বদেশপ্রেম অতুলনীয়। এ মালা তোমারই। তোমার ন্যায় দেশপ্রেমিকই এই গৌরব মুকুটটির যোগ্য অধিকারী।" এ সব কথা কিছুই যুবকের কানে গেল না। সে তখন পরম তৃপ্তি ও শ্রদ্ধার সহিত নেতাজীর মালাটি বুকে চাপিয়া ধরিয়াছে। কম্পিতকণ্ঠে সে বলিল: "নেতাজী, আজ আমি জাগতিক সম্পদের মোহপাশ কাটাইয়াছি। আজ হইতে আমি ফৌজের সভ্য হইতে চাই। আমার দেশের স্বাধীনতার বেদীমূলে আমি জীবন উৎসর্গ করিলাম। আপনি আমাকে গ্রহণ করুন, নেতাজী।"

নেতাজীকে যে তাহারা কতখানি গৌরবের আসনে বসাইয়াছিল এই ঘটনা হইতে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে। নেতাজীর কণ্ঠের মাল্যটি লাভ করা তাহারা মনুষ্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল।

১৯৪৪ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর আজাদ হিন্দ সৈন্যগণ কর্তৃক যতীনদাসের স্মৃতিদিবস ও শহীদ দিবস প্রতিপালিত হয়। রেঙ্গুনের জুবিলী হলে এক মহতী জনসভায় লক্ষ লক্ষ নর-নারী সমবেত হইয়াছিল। সুভাষচন্দ্র আবেগময়ী ভাষায় এক ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন। সুভাষচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"আমাদের বন্দিনী জননী জন্মভূমি আজ স্বাধীনতালাভের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। মুক্তি না পাইলে তিনি আর বাঁচিবেন না। কিন্তু স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মত্যাগের প্রয়োজন। মুক্তির জন্য স্বেচ্ছায় তোমাদের সকল বৈভব, সমস্ত শক্তি—যাহা কিছু তোমরা মূল্যবান মনে কর—সকলই ত্যাগ করিতে হইবে। অতীতের বিপ্লবীদের ন্যায় তোমাদের সকল আরাম, সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সকল সম্ভোগ, সকল সম্পদ বলি দিতে হইবে। স্বাধীনতা সংগ্রামে তোমরা তোমাদের পুত্রদের সৈনিক করিয়া পাঠাইয়াছ। কিন্তু মুক্তি-দেবী তাহাতেও তুষ্টা হন নাই। তাঁহার তুষ্টির গোপন রহস্য আমি তোমাদের কাছে উদ্ঘাটন করিব। আজ তিনি ফৌজের জন্য কেবল

সৈনিকই চাহেন না—তিনি চাহেন বিপ্লবী নারী ও বিপ্লবী পুরুষ—বিদ্রোহীদের দল যাহারা আত্মঘাতী বাহিনীতে (Suicide squads) যোগ দিতে প্রস্তুত—যাহাদের কাছে মৃত্যু ধ্রুব। এমন বিদ্রোহী আমি চাই যাহারা নিজেদের শোণিত স্রোতে শত্রুকে নিমজ্জিত করিতে কৃত-সঙ্কল্প। মুক্তি-দেবী এই দাবী লইয়া তোমাদের দ্বারে উপস্থিত—তোমরা আমাকে তোমাদের রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দিব। স্বাধীনতার দাবী ইহাই।" নেতাজীর মর্মস্পর্শী আবেদন সমবেত জনতার মধ্যে আনিয়া দিল আত্মবলিদানের দুর্জ্জয় সঙ্কল্প। সকলে সম্মিলিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—"আমরা প্রস্তুত। আমরা আমাদের রক্ত দিব।" নেতাজী বলিলেন, "ভাবাবেগের বশে তোমরা যে সম্মত হইবে আমি তাহা চাহি না। আমি কেবল সত্যিকারের বিপ্লবীদের অগ্রসর হইয়া এই আত্মঘাতী বাহিনীতে যোগদানের শপথ গ্রহণ করিতে বলি। মনে রাখিও এই বাহিনীতে যোগদানের অর্থ স্বাধীনতাদেবীর নিকট আত্মবলিদানের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করা।" প্রকাণ্ড হলঘরের প্রত্যেকটি কোণ হইতে সমবেত কণ্ঠের উত্তর আসিল—"আমরা স্বাক্ষর করিতে প্রস্তুত।" বজ্র গম্ভীর স্বরে নেতাজী কহিলেন—"নিজের মৃত্যুর পরওয়ানা স্বাক্ষর সাধারণ কালীতে হয় না। তোমাদের নিজেদের রক্তে এই স্বাক্ষর করিতে হইবে।" জনগণের মধ্যে এক অদ্ভুত সাড়া পড়িয়া গেল। প্রত্যেকেই নিজের রক্তে স্বাক্ষর করিয়া আত্মঘাতী বাহিনীর প্রথম শহীদ হইতে চায়। "পড়ি গেল কাড়াকাড়ি,—আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি তাড়াতাড়ি।" তারপর বহুক্ষণ ধরিয়া চলিল নিজেদের রক্তে নিজেদের মৃত্যুর পরওয়ানা স্বাক্ষর।

সকলের মনে নেতাজী যে কী উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছিলেন এই ঘটনায় তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। নেতাজীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে নেতাজীর আহ্বানে মন্ত্রমুগ্ধ প্রবাসী ভারতীয়গণ মরণ-মহোৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছিল।

আজাদ হিন্দ ফৌজের শেষ যুদ্ধে সুভাষচন্দ্র যখন দেখিলেন জয়ের আর কোন আশাই নাই তখন তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে পশ্চাদপসরণের আদেশ দিলেন। অধিনায়কের মারফৎ প্রদত্ত এই আদেশ তাহারা মানিতে চাহিল না। এমনকি তাহারা বিদ্রোহ করিবার উপক্রম করিল। কারণ, তাহারা মনে করিল তাহাদের অধিনায়ক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে বলিতেছেন। তাহারা বলিল —"আমাদের উপর সিপাহশালর নেতাজীর আদেশ, আমাদিগকে দিল্লী পৌঁছিতে হইবে। কোন অবস্থাতেই তিনি আমাদের পশ্চাদপসরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।" অধিনায়ক ও সৈন্যধ্যক্ষগণ অনেক বুঝাইলেন— "আমাদের রণ-সম্ভার নাই, মোটর বা ট্রাঙ্ক নাই, খাদ্য নাই, ঔষধ নাই— ঘাস-পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করিয়া আছি। জাপানীরা তো ইতিমধ্যেই পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। এ অবস্থায় পশ্চাদপসরণ করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই।" কিন্তু সৈন্যগণ তাহাদের সঙ্কল্পে অটল। তাহারা বলিল— "আমরা ঘাস-পাতা খাইয়া এ যাবৎ বাঁচিয়া আছি। শেষদিন পর্য্যন্ত তাহাই করিব। আমাদের ঔষধ-পথ্য ছাড়াই চলিবে। নেতাজীর কাছে মৃত্যুপণ করিয়াছি। নেতাজীর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতে দিব না। হয় যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইব—না হয় রণক্ষেত্রে শেষ শয্যা গ্রহণ করিব।" অবশেষে যখন তাহারা কিছুতেই রাজী হইতে চাহিল না তখন নেতাজীর স্বহস্তলিখিত আদেশনামা দেখান হইল। সৈন্যগণ স্বীকৃত হইল। কিন্তু শোকে অধীর হইয়া শিশুর মত চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। ভারতকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া নেতাজীর হাতে স্বাধীন ভারতকে তুলিয়া দিতে পারিল না বলিয়া আত্মগ্লানি ও ক্ষোভে তাহাদের মন ভরিয়া উঠিল। তাহারা বলিল—"নেতাজী, তোমার কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম হতভাগ্য আমরা তাহা পালন করিতে পারিলাম না।"

নেতাজী সৈন্যদলের মধ্যে আদর্শ-নিষ্ঠা ও আত্মোৎসর্গের মহৎ

প্রেরণা জাগাইয়াছেন—তাহাদের বীর্য্য ও স্বাদেশিকতা উদ্রিক্ত করিয়াছেন। তাঁহার দুর্জ্জয় সাহস, অদম্য সঙ্কল্প ও মহনীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বাধীনতার সৈনিকেরা মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া স্বাধীনতার ধ্রুবলক্ষ্যপথে দুর্দ্দাম বেগে ছুটিয়াছে।

নেতাজীর বজ্রকঠোর ও কুসুম-কোমল ব্যক্তিত্ব শত্রু-মিত্র সকলকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহার চরিত্রবত্তা ও আদর্শপ্রীতি, আত্মত্যাগ ও অপরিমেয় কর্মশক্তি সকলের হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল। এই তেজস্বী ও শক্তিধর পুরুষের কঠোর অনমণীয় পাষাণ-কঠিন ব্যক্তিত্বের আঘাতে শত্রুর প্রতিকূলতা ও বিপক্ষের বিরোধিতা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত; অপরদিকে তাঁহার অতুলনীয় হৃদয়মাধুর্য্য তাঁহার চরিত্রের স্নেহ-স্নিগ্ধ কমনীয়তা প্রচণ্ডতম শত্রুকেও বশে আনিত। নেতাজীর ব্যক্তিত্বের এই চৌম্বকশক্তিই সাম্প্রদায়িকতা, ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সংস্কারের উর্দ্ধে লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল ও একজাতীয়তার সাধনমন্ত্রে সঞ্জীবিত করিয়াছিল। তাঁহার "দিল্লী চলো" ও "জয় হিন্দ" ধ্বনি এই অসাধ্য সাধন করিয়াছে।

রক্তদানের আহ্বান—

আজাদ হিন্দের অভিযান শেষ হইয়া যায় নাই। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের স্বপ্ন আজিও সফল হয় নাই। স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার ভার নেতাজী আমাদের উপর ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। মাতৃমুক্তির দায়িত্ব পালনে সন্তান কি কখনও পরাঙ্মুখ হইবে? "দেখিও, তোমাদের হাতে ভারতবর্ষের জাতীয় মর্য্যাদা যেন ক্ষুন্ন না হয়।" "স্বাধীনতার জন্য শেষ রক্তবিন্দু দিও।"—নেতাজীর এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া স্বদেশমন্ত্রে আজ আবার নূতন করিয়া দীক্ষা লইতে হইবে। নেতাজীর বাণী সর্বদা মনোমধ্যে জাগ্রত রাখিতে হইবে—"ভুলিও না মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়

লেঃ কঃ ধীলন

লেঃ কঃ লক্ষ্মীস্বামীনাথন

অভিশাপ পরাধীন হইয়া থাকা।” “The individual must die so that the nation may live” “ভারত যাহাতে স্বাধীন হইয়া গৌরব অর্জ্জন করিতে পারে সেজন্য আজ আমাকে মরিতে হইবে।” আজ আমাদিগকে নিজেদের বক্ষরক্তে মৃত্যুর ছাড়-পত্র লিখিয়া দিয়া মুক্তিদেবীর কাছে শপথ করিতে হইবে—“হয় স্বাধীনতা—না হয় মৃত্যু।” এই চূড়ান্ত সংগ্রামে পরাভব নাই, পশ্চাদপসরণ নাই। “জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য” করিয়া দুর্জ্জয় সাহসে ভর করিয়া কেবল সম্মুখপানে অগ্রসর হইতে হইবে। “ভগবান যদি চাহেন, আমরা শহীদের ন্যায় মৃত্যুবরণ করিব। যে পথ ধরিয়া আমাদের সেনাবাহিনী দিল্লীতে পৌছিবে, শেষ শয্যা গ্রহণ করিবার সময় আমরা একবার সেই পথ চুম্বন করিয়া লইব। দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ। চলো দিল্লী।” নেতাজীর উক্তি—“In this stıuggle there is no going back, and there can be no faltering. We must march onward and forward till victory is achieved.” ঐ দেখিতেছ না, দিল্লীর লাল কেল্লায় স্বাধীনতা সংগ্রামের পথপ্রদর্শক কারারুদ্ধ সৈনিকেরা মুক্তির আশায় গভীর উৎকণ্ঠাভরে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে? দিল্লীর বড়লাটপ্রাসাদে আজিও ইংরাজের পতাকা জাতির কলঙ্ক ও অক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করিয়া স্পর্দ্ধার সহিত উড্ডীন রহিয়াছে। নেতাজী বলিয়াছেন, “দিল্লীর বড়লাট ভবনের উত্তুঙ্গ শীর্ষে যেদিন আমাদের জাতীয় পতাকা সগৌরবে উড়িতে থাকিবে এবং যেদিন ভারতের মুক্তিফৌজ প্রাচীন লাল-কেল্লার অভ্যন্তরে বিজয় উৎসবে মাতিয়া উঠিবে সেইদিনই কেবল এই অভিযানের শেষ হইবে।” “স্বাধীনতাই জীবন। স্বাধীনতার জন্য জীবনদানে অবিনশ্বর গৌরব। যদি স্বাধীন হইতে না পারি হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিব।” “আমরা পরাধীন দেশে জন্মিয়াছি একথা সত্য, কিন্তু স্বাধীন দেশে মরিব। দেশকে মুক্ত করিয়া মরিব—আসুন আমরা এই প্রতিজ্ঞা করি। আর

যদি বা জীবনে মুক্ত ভারতবর্ষের রূপ দেখিতে নাও পারি তবে যেন ভারতবর্ষকে মুক্ত করিতে জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারি।” চল্লিশ কোটি নর-নারীর সম্মিলিত বাহিনীর প্রতিরোধ করে সাধ্য কার? ‘এ যৌবন জল তরঙ্গ রোধিবে কে? “মনে রাখিও এই বাহিনীতে যোগদানের অর্থ স্বাধীনতাদেবীর নিকট আত্মবলিদানের প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করা।” নেতাজীর উক্তি—“The days of minimum sacrifice are over. The time has come when each and every one of us has to think of the maximum sacrifice, and that sacrifice has to be in human life.” মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াই স্বাধীনতারণে ঝাঁপ দিতে হইবে। “When the blood of freedom-loving Indians begins to flow India will attain her freedom.”

১৯৪৪ সালের ১১ই জুলাই দিল্লীর শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহের স্মৃতি-স্তম্ভের সম্মুখে নেতাজী এক ওজস্বিনী বক্তৃতায় আজাদ হিন্দ সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলেন—“As I study the events of 1857 and think of the atrocities perpetrated by the British after the revolution collapsed—my blood begins to boil. If we are men we will certainly see to it that the heroes of 1857 and after who suffered so much from British terror and brutality are properly avenged. India demands revenge. The British who split the blood of innocent freedom-loving Indians and tortured them in an inhuman manner not only during the war, but after it was over—must pay for their crimes. We Indians do not hate the enemy enough. If you want your countrymen rise to heights of super-human courage and heroism, you must teach

them not only to love their country, but also to hate the enemy.. ...Therefore, I call for blood. It is only the blood of the enemy that can avenge his crimes of the past. But we can take blood only if we are prepared to give blood. Consequently, our programme for the future is to give blood. The blood of our heroes in this war will wash away our sins of the past. The blood of our heroes will be the price of our liberty. The blood of our heroes—their heroism and their bravery—will secure for the Indian people the revenge that they demand of the British tyrants and oppressors."

—'১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনাবলী পড়িতে পড়িতে যখন ইংরাজের জঘন্য ও নৃশংস অত্যাচারের কথা চিন্তাকরি, আমার রক্ত টগবগ করিতে থাকে। যদি আমরা মনুষ্য নামের যোগ্য হইতে চাই তবে যাহারা ব্রিটিশের পৈশাচিক ও অমানুষিক অত্যাচারের কবলে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে তাহাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে হইবে। ভারত আজ প্রতিশোধ চায়। যাহারা নিরপরাধ মুক্তি-প্রেমিক ভারতীয়দের রক্তপাত করিয়াছে তাহাদিগকে স্বকৃত দুষ্কৃতের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আমরা ভারতবাসীরা শত্রুকে যথেষ্ট ঘৃণা করিতে শিখি নাই। যদি তোমরা চাও যে তোমাদের দেশবাসিগণ অলোকসামান্য সাহসিকতা ও তেজস্বীতার উচ্চশিখরে অধিরূঢ় থাকুক তবে কেবল দেশকে ভালবাসিতে শিখিলেই চলিবে না—শত্রুকে আন্তরিক ঘৃণা করিতে শিখিতে হইবে।

আমি রক্ত চাহিতেছি। শত্রুর রক্তপাত করিয়াই কেবল তাহার অতীতের নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ লইতে পারিব। কিন্তু, শত্রুর রক্তপাত করিতে হইলে সর্বাগ্রে নিজেদের রক্ত দান করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে।

কাজেই আমাদের কর্মক্রম হইতেছে আমাদের রক্ত দান করা। এ যুদ্ধে আমাদের বীরের রক্তস্রোতে অতীতের কাপুরুষতা ও অক্ষমতার অপরাধ ক্ষালন করিয়া লইতে হইবে। বীর শহীদগণের রক্তই স্বাধীনতার একমাত্র মূল্য। আমাদের সাহসী সৈনিকের রক্ত দান—অপরিমেয় বীর্য্য ও সাহস ভারতীয় জনগণের উপর ব্রিটিশের অত্যাচার ও শোষণের প্রতিশোধ লইবে।'

সকল দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকেরাই রক্তমূল্য দিয়া স্বাধীনতা কিনিয়াছে। নেতাজীর আশ্বাসবাণী ও আশীর্ব্বাদ আমাদের জন্য রহিয়াছে —"অন্ধকারে ও রৌদ্রালোকে (সুদিনে ও দুর্দ্দিনে), দুঃখে এবং সুখে, চরম দুর্দ্দশায় ও বিজয়ের আনন্দে আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকিব। আপাতত তোমাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যন্ত্রণা, সুদীর্ঘপথ ও মৃত্যু ছাড়া আমার কিছুই দিবার নাই। আমাদের মধ্যে কে বাঁচিয়া থাকিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেখিবে, তাহার বিচার আজ নয়। এইটুকু আশ্বাসই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে এবং ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার জন্য আমরা সর্বস্ব সমর্পণ করিব।"

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। এতাবৎ কেহই এই মৃত্যুসংবাদে আস্থা স্থাপন করে নাই। মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া কোন নেতাই সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সম্পর্কে নিঃসংশয় হন নাই। তাঁহার মৃত্যুর সপক্ষে ও বিপক্ষে প্রচারিত সংবাদ, নানারূপ জল্পনা-কল্পনা ও জনরবগুলি এই মৃত্যুসংবাদকে দুর্ভেদ্য রহস্যজালে আবৃত করিয়াছে। সমগ্র ভারতবাসীর সহিত আমরা নিরন্তর এই কামনা করিতেছি, নেতাজী পুনরায় আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া আমাদের সকল সংশয় ছিন্ন করিবেন; উপযুক্ত মুহূর্ত্তে আত্মপ্রকাশ করিয়া নেতাজী ভারতবর্ষকে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির পথে পরিচালিত করিবেন। ভারতমাতার বন্ধন-শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া তিনি তাঁহার আজীবনের স্বপ্ন সফল করিবেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে।

ভারতের মুক্তিলাভকল্পে নেতাজী যে পথ বাছিয়া লইয়াছেন, সেই পথে মৃত্যুর আনাগোনা অবারিত—প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর সন্মুখীন হইতে হয়। অতএব, মুক্তিসংগ্রাম-প্রচেষ্টায় নিরন্তর বিপদসঙ্কুল জীবনযাত্রার অনিশ্চয়তার মাঝে মহাবিপ্লবী নেতাজী যদি বীরের মৃত্যু বরণ করিয়া থাকেনই, তবে অদৃষ্টের সেই নির্ম্মম বিধানকে স্বীকার করিয়া লইবার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকিতে হইবে। নেতাজী বলিয়াছেন—"If I die what does it matter?" "The leaders are incidental. They can come and go. It is the movement that must flow on for ever." এই মহাপ্রাণ মহামানবের অভ্রান্ত নির্দ্দেশ ও মহাবাণীই আমাদের শোকে সান্ত্বনা দান করিয়া পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর যাত্রাপথে চলিবার প্রেরণা যোগাইবে।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজরূপ বিরাট কীর্ত্তি সাধন করিয়া দেশগৌরব নেতাজী সুভাষচন্দ্র নবতম ও ভাস্বরতম মহিমায় আমাদের নিকট উদ্ভাসিত হইয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাসে তাঁহার সাধনা ও অক্ষয় অবদান স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে। যুগ যুগ ধরিয়া ভাবী ও বর্ত্তমান ভারতের সন্তানগণ তাঁহার অতুলনীয় স্বদেশপ্রেম, ত্যাগ ও আজীবন সাধনা হইতে নব নব প্রেরণা লাভ করিবে। নেতাজীর পূত জীবন ও সাধনার মহত্বের উদ্দেশে কবির ভাষায় বলিতে পারি—

"আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীতরূপে আপনারে করে যাবে দান
দূর কালে। তাহাদের কাছে তুমি নিত্য-গাওয়াগান
মূর্ত্তিহীন।"

বন্দেমাতরম্

জয় হিন্দ্।

পরিশিষ্ট—(ক)

সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উক্তি

দেশনায়ক

সুভাষচন্দ্র,

বাঙ্গালী কবি আমি, বাঙ্গালাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি। গীতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয়, তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক। রাজশাসনের দ্বারা নিষ্পিষ্ট, আত্মবিরোধের দ্বারা বিক্ষিপ্ত-শক্তি বাংলাদেশের অদৃষ্টাকাশে দুর্যোগ আজ ঘনীভূত। নিজেদের মধ্যে দেখা দিয়েছে দুর্ব্বলতা বাইরে একত্র হয়েছে বিরুদ্ধ শক্তি। আমাদের অর্থনীতিতে কর্ম্মনীতিতে শ্রেয়োনীতিতে প্রকাশ পেয়েছে নানা ছিদ্র। আমাদের রাষ্ট্রনীতিতে হালে দাড়ে তালের মিল নেই। দুর্ভাগ্য যাদের বুদ্ধিকে অধিকার করে, জীর্ণ দেহে রোগের মত, তাদের পেয়ে বসে ভেদবুদ্ধি—কাছের লোককে তারা দূরে ফেলে আপনাকে করে পর, শ্রদ্ধেয়কে করে অসম্মান, স্বপক্ষকে পিছন থেকে করতে থাকে বলহীন; যোগ্যতার জন্য সম্মানের বেদী স্থাপন করে যখন স্বজাতিকে বিশ্বের দৃষ্টির সম্মুখে উর্দ্ধে তুলে ধরে মান বাঁচাতে হবে, তখন সেই বেদীর ভিত্তিতে ঈর্ষান্বিতের আত্মঘাতক মূঢ়তা নিন্দার ছিদ্র যখন করতে থাকে, নিজের প্রতি বিদ্বেষ করে শত্রুপক্ষের স্পর্দ্ধাকে প্রবল করে তোলে।

বাহিরের আঘাতে যখন দেহে ক্ষত বিস্তার করতে থাকে তখন নাড়ীর ভিতরকার সমস্ত প্রসুপ্ত বিষ জেগে উঠে সাংঘাতিকতাকে এগিয়ে আনে। অন্তর বাহিরের চক্রান্তে অবসাদগ্রস্ত মন নিজেকে নিরাময় করবার পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করতে পারে না। এই রকম দুঃসময়ে একান্তই চাই

এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ-শক্তিমান পুরুষের দক্ষিণ হস্ত যিনি জয় যাত্রার পথে ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারেন।

সুভাষচন্দ্র তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভ ক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। সেই আলো আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে দ্বিধা অনুভব করেছি, কখনো কখনো দেখেছি তোমার ভ্রম তোমার দুর্ব্বলতা তা নিয়ে মন পীড়িত হয়েছে। আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত, তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্য দিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন। কর্ত্তব্য-ক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তার থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারা-দুঃখে, নির্ব্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে। কিছুতে তোমাকে অভিভূত করেনি। তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূর বিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোন পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে মাননি। তোমার এই চরিত্র শক্তিকেই বাংলাদেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।

নানা কারণে আত্মীয় ও পরের হাতে বাংলাদেশ যতকিছু সুযোগ থেকে বঞ্চিত, ভাগ্যের সেই বিড়ম্বনাকেই সে আপন পৌরুষের আকর্ষণে ভাগ্যের আশীর্ব্বাদে পরিণত করে তুলবে, এই চাই। আপাত পরাভবকে অস্বীকার করায় যে বল জাগ্রত হয় সেই স্পর্দ্ধিত বলই তাকে নিয়ে যাবে জয়ের পথে, আজ চারিদিকেই দেখতে পাই বাংলাদেশের অকরুণ অদৃষ্ট তাকে প্রশ্রয় দিতে বিমুখ। এই বিমুখতাকে অবজ্ঞা করেই সে যদি দৃঢ় চিত্তে বলতে পারে আত্মরক্ষার দুর্গ বানাবার উপকরণ আছে আপন

চরিত্রের মধ্যেই ; বাধ্য হয়ে যদি সেই উপকরণকে রুদ্ধ ভাণ্ডারের তালা ভেঙে সে উদ্ধার করতে পারে তবেই সে বাঁচবে, হিংস্র দুঃসময়ের পিঠের উপরে চড়েই বিভীষিকার পথ উত্তীর্ণ হতে হবে, এই দুঃসাহসিক অভিযানে উৎসাহ দিতে পারবে তুমি, এই আশা করে তোমাকে আমাদের যাত্রানেতার পদে আহ্বান করি।

দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে দুর্গম লক্ষ্যে গিয়া পৌছবই যদি আমরা মিলতে পারি। আমাদের সকলের চেয়ে দুরূহ সমস্যা এইখানেই। কিন্তু কেন বলব 'যদি', কেন প্রকাশ করব সংশয় ? মিলতেই হবে কেন না দেশকে বাঁচতেই হবে। বাঙ্গালী অদৃষ্ট কর্তৃক অপমানিত হয়ে মরবে না এই আশাকে সমস্ত দেশে তুমি জাগিয়ে তোল, সাংঘাতিক মার খেয়েও বাঙ্গালী মারের উপর মাথা তুলবে। তোমার মধ্যে অক্লান্ত তারুণ্য, আসন্ন সঙ্কটের প্রতি মুখে আশাকে অবিচলিত রাখার দুর্নিবার শক্তি আছে তোমার প্রকৃতিতে। সেই দ্বিধাদ্বন্দ্বমুক্ত মৃত্যুঞ্জয় আশার পতাকা বাঙ্গালার জীবনক্ষেত্রে তুমি বহন করে আনবে সেই কামনায় আজ তোমাকে অভ্যর্থনা করি দেশনায়কের পদে। অসন্দিগ্ধ দৃঢ়কণ্ঠে বাঙ্গালী আজ একবাক্যে বলুক, তোমার প্রতিষ্ঠার জন্য তার আসন প্রস্তুত। বাঙ্গালীর পরস্পর বিরোধের সমাধান হোক তোমার মধ্যে, আত্মসংশয়ের নিরসন হোক তোমার মধ্যে, হীনতা লজ্জিত ও দীনতা ধিক্কৃত হোক তোমার আদর্শে ; জয়ে পরাজয়ে আপন আত্মসম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখার দ্বারা তোমার মর্য্যাদা সে রক্ষা করুক।

বাঙ্গালী নৈয়ায়িক, বাঙ্গালী অতি সূক্ষ্ম যুক্তিতে বিতর্ক করে, কর্ম্ম উদ্যোগের আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত বিপরীত পক্ষ নিয়ে বন্ধ্যা বুদ্ধির গর্বে প্রতিবাদ করতে তার অদ্ভুত আনন্দ, সমগ্র দৃষ্টির চেয়ে রন্ধ্র সন্ধানের ভাঙন্ লাগানো দৃষ্টিতে তার ঔৎসুক্য, ভুলে যায় এই তার্কিকতা নিষ্কর্ম্মা বুদ্ধির নিষ্ফল শৌখিনতামাত্র। আজ প্রয়োজন হয়েছে তর্কের নয়,

স্বতঃ উদ্ভূত ইচ্ছার। বাঙ্গালীর সম্মিলিত ইচ্ছা বরণ করুক তোমাকে নেতৃত্ব পদে, সেই ইচ্ছা তোমাকে সৃষ্টি করে তুলুক তোমার মহৎ দায়িত্বে, সেই ইচ্ছাতে তোমার ব্যক্তিস্বরূপকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হোক সমগ্রদেশের আত্মস্বরূপ।

বাঙ্গলাদেশের ইচ্ছায় মুক্তি একদিন প্রত্যক্ষ করেছি বঙ্গভঙ্গরোধের আন্দোলনে। বঙ্গ কলেবর দ্বিখণ্ডিত করবার জন্যে সমুদ্যত খড়্গকে প্রতিহত করেছিল এই ইচ্ছা। যে বহুবলশালী শক্তির প্রতিপক্ষে বাঙ্গালী সেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল সেই রাজশক্তির অভিপ্রায়কে বিপর্য্যস্ত করা সম্ভব কিনা এ নিয়ে সেদিন সে বিজ্ঞের মতো তর্ক করেনি, বিচার করেনি, কেবল সে সমস্ত মন দিয়ে ইচ্ছা করেছিল। তার পরবর্ত্তীকালের প্রজন্মে (generation) ইচ্ছার অগ্নিগর্ভরূপ দেখেছি বাংলায় তরুণদের চিত্তে। দেশে তারা দীপ জ্বালাবার জন্যে আলো নিয়েই জন্মেছিলো, ভুল করে আগুন লাগাল, দগ্ধ করল নিজেদের, পথকে করে দিল বিপথ। কিন্তু সেই দারুণ ভুলের সাংঘাতিক ব্যর্থতার মধ্যে বীর হৃদয়ের যে মহিমা ব্যক্ত হয়েছিল সেদিন ভারতবর্ষের আর কোথাওতো তা দেখিনি। তাদের সেই ত্যাগের পর ত্যাগ, সেই দুঃখের পর দুঃখ, সেই তাদের প্রাণ-নিবেদন, আশু নিষ্ফলতায় ভস্মসাৎ হয়েছে কিন্তু তারা ত নির্ভীক মনে চিরদিনের মত প্রমাণ করে গেছে বাঙ্গালার দুর্জ্জয় ইচ্ছাশক্তিকে। ইতিহাসের এই অধ্যায়ে অসহিষ্ণু তারুণ্যের যে হৃদয়বিদারক প্রমাদ দেখিয়েছিল তার উপরে আইনের লাঞ্ছনা যত মসী লেপন করুক তবু কি কালো করতে পেরেছে তার অন্তর্নিহিত তেজোস্ক্রিয়তাকে?

আমরা দেশের দৌর্বল্যের লক্ষণ অনেক দেখেছি, কিন্তু যেখানে পেয়েছি তার প্রবলতার পরিচয় সেইখানেই আমাদের আশা প্রচ্ছন্ন ভূগর্ভে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করেছে। সেই প্রত্যাশাকে সম্পূর্ণ প্রাণবান ও ফলবান করবার ভার নিতে হবে তোমাকে; বাঙ্গালীর স্বভাবে যা কিছু

শ্রেষ্ঠ তাঁর সরসতা, তার কল্পনাবৃত্তি, তার নূতনকে চিনে নেবার উজ্জ্বল দৃষ্টি, রূপসৃষ্টির নৈপুণ্য, অপরিচিত সংস্কৃতির দানকে গ্রহণ করবার সহজ শক্তি, এই সকল ক্ষমতাকে ভাবের পথ থেকে কাজের পথে প্রবৃত্ত করতে হবে। দেশের পুরাতন জীর্ণতাকে দূর করে তামসিকতার আবরণ থেকে মুক্ত করে নব-বসন্তে তার নতুন প্রাণকে কিশলয়িত করবার সৃষ্টিকর্তৃত্বগ্রহণ করো তুমি।

বলতে পার এত বড় কাজ কোন একজনের পক্ষে সম্ভব হতে পারে না, সে কথা সত্য। বহু লোকের দ্বারা বিচ্ছিন্নভাবেও সাধ্য হবে না। একজনের কেন্দ্রাকর্ষণে দেশের সকল লোকে এক হতে পারলে তবেই হবে অসাধ্য সাধন। যারা দেশের যথার্থ স্বাভাবিক প্রতিনিধি তারা কখনই একলা নন। তারা সর্বজনীন, সর্বকালে তাদের অধিকার। তারা বর্ত্তমানের গিরি-চূড়ায় দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের প্রথম সূর্য্যোদয়ের অরুণাভাসকে প্রথম প্রণতির অর্ঘ্য দান করেন। সেই কথা মনে রেখে আমি আজ তোমাকে বাঙ্গালাদেশের রাষ্ট্রনেতার পদে বরণ করি। সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান করি তোমার পার্শ্বে সমস্ত দেশকে।

এমন ভুল কেউ যেন না করেন যে বাঙ্গলাদেশকে আমি প্রাদেশিকতার অভিমানে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই অথবা সেই মহাত্মার প্রতিযোগী আসন স্থাপন করতে চাই রাষ্ট্রধর্ম্মে যিনি পৃথিবীতে নূতন যুগের উদ্বোধন করেছেন, ভারতবর্ষকে যিনি প্রসিদ্ধ করেছেন সমস্ত পৃথিবীর কাছে। সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে বাংলার সম্মিলন যাতে সম্পূর্ণ হয়, মূল্যবান হয়, পরিপূর্ণ ফলপ্রসূ হয়, যাতে সে রিক্তশক্তি হয়ে পশ্চাতের আসন গ্রহণ না করে তারই জন্য আমার এই আবেদন। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রমিলন যজ্ঞের যে মহদনুষ্ঠান আজ প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক প্রদেশকে তার জন্য উপযুক্ত আহুতির উপকরণ সাজিয়ে আনতে হবে। তোমার সাধনায় বাংলাদেশের সেই আত্মাহুতি ষোড়শোপচারে সত্য হোক, ওজস্বী হোক—তার আপন বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

বহুকাল পূর্ব্বে একদিন আর এক সভায় আমি বাঙ্গালী সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশ্যে বাণীদূত পাঠিয়েছিলুম। তার বহু বৎসর পরে আজ আর এক অবকাশে বাংলাদেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি। দেহে মনে তাঁর সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারব আমার সে সময় আজ গেছে, শক্তিও অবসন্ন। আজ আমার শেষ কর্ত্তব্যরূপে বাংলাদেশের ইচ্ছাকে কেবল আহ্বান করতে পারি। সেই ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণশক্তিতে প্রবুদ্ধ করুক, কেবল এই কামনা জানাতে পারি। তারপরে আশীর্ব্বাদ করে বিদায় নেব এই জেনে যে, দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছ, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন করে।

(১৯৩৯ সালের মে মাসে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে কবিগুরুর এই ভাষণ লিখিত ও মুদ্রিত হয়; কিন্তু উহা তখন প্রচারিত হয় নাই। সম্প্রতি এই রচনাটি দৈনিক আনন্দবাজার ও সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে)।

[২]

[কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৯ সালের ২০ শে মে মংপু হইতে শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তীকে লিখিত এক পত্রে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলন সম্পর্কে তাঁহার সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। এই পত্রখানি ঐ বৎসর জুলাই মাসে "কংগ্রেস" নাম দিয়া 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। নিম্নে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের তৎকালীন মনোভাব সম্বন্ধে কবির অভিমত বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক]।

কংগ্রেস যতদিন আপন পরিণতির আরম্ভ যুগে ছিল, ততদিন ভিতরের দিক থেকে তার আশঙ্কার বিষয় অল্পই ছিল। এখন সে প্রভূত শক্তি ও খ্যাতি সঞ্চয় করেছে, শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকে স্বীকার করে নিয়েছে সমস্ত

পৃথিবী। সে কালের কংগ্রেস যে রাজদরবারের রুদ্ধ দ্বারে বৃথা মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে মরত, আজ সেই দরবারে তার সম্মান অবারিত। এমনকি সেই দরবার কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। কিন্তু মনু বলেছেন সম্মানকে বিষের মত জানবে। পৃথিবীতে যে দেশেই যে কোন বিভাগেই ক্ষমতা অতি প্রভূত হয়ে সঞ্চিত হয়ে উঠে সেখানেই সে ভিতরে ভিতরে নিজের মারণ বিষ উদ্ভাবিত করে। ইম্পিরিয়ালিজম্ বল, ফ্যাসিজম বল, অন্তরে নিজের বিনাশ নিজেই সৃষ্টি করে চলেছে। কংগ্রেসের অন্তর-সঞ্চিত ক্ষমতার তাপ হয়তো তার অস্বাস্থ্যের কারণ হয়ে উঠেছে বলে সন্দেহ করি। যাঁরা এর কেন্দ্রস্থলে এই শক্তিকে বিশিষ্টভাবে অধিকার করে আছেন, সঙ্কটের সময় তাঁদের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়েছে; বিচারবুদ্ধি সোজা পথে চলে নি। পরস্পরের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সৌজন্য, যে বৈধতা রক্ষা করলে যথার্থভাবে কংগ্রেসের বল ও সম্মান রক্ষা হ'ত তার ব্যভিচার ঘটতে দেখা গেছে; এই ব্যবহার-বিকৃতির মূলে আছে শক্তি ও স্পর্ধার প্রভাব। খৃষ্টান শাস্ত্রে বলে স্ফীতকায়া সম্পদের পক্ষে স্বর্গ-রাজ্যের প্রবেশ পথ সঙ্কীর্ণ, কেননা ধনাভিমানী ক্ষমতা আনে তামসিকতা। কংগ্রেস আজ বিপুল সম্মানের ধনে ধনী, এতে তার স্বর্গরাজ্যের পথ করেছে বন্ধুর। মুক্তির সাধনা তপস্যার সাধনা, সেই তপস্যা সাত্ত্বিক—এই জানি মহাত্মার উপদেশ। কিন্তু এই তপঃক্ষেত্রে যাঁরা রক্ষকরূপে একত্র হয়েছেন তাঁদের মন কি উদারভাবে নিরাসক্ত? তাঁরা পরস্পরকে আঘাত করে যে বিচ্ছেদ ঘটান সে কি বিক্ষুব্ধ সত্যেরই জন্য। তাঁর মধ্যে কি সে উত্তাপ একেবারে নেই যে উত্তাপ শক্তিগর্ব্ব ও শক্তিলোপ থেকে উদ্ভূত? ভিতরে ভিতরে কংগ্রেসের মন্দিরে এই যে শক্তি-পূজার বেদী গড়ে উঠেছে তার কি স্পর্ধিত প্রমাণ এবারে পাইনি যখন মহাত্মাজীকে তার ভক্তেরা মুসোলিনী ও হিট্‌লারের মর্ম্মকথা বলে বিশ্বসমক্ষে অসম্মানিত করতে পারলেন?

সত্যের যজ্ঞে যে তপস্বী কংগ্রেসকে গড়ে তুলেছেন, তার বিশুদ্ধতা কি তারা রক্ষা করতে পারবেন শক্তিপূজার নরবলি সংগ্রহের কাপালিক যাঁদের আদর্শ। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করি জহরলালকে, যেখানে ধন বা অন্ধ ধর্ম্ম বা রাষ্ট্রপ্রভাব ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ সীমায় শক্তির ঔদ্ধত্য পুঞ্জীভূত করে তোলে সেখানে তার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান। আমি তাঁকে প্রশ্ন করি কংগ্রেসের দুর্গদ্বারের দ্বারীদের মনে কোথাও কি এই ব্যক্তিগত শক্তিমদের সাংঘাতিক লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করেনি? এতদিন পরে অন্তত আমার মনে সন্দেহ প্রবেশ করেছে।

পরিশিষ্ট—(খ)

আজাদ হিন্দ ফৌজ ও গভর্ণমেণ্টের ইতিহাস

১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরের পতন হয়। বৃটিশ সৈন্যগণ পূর্বাহ্ণেই পলায়ন করে এবং তাহাদের পলায়নের জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা পূর্বেই করা হইয়াছিল, কিন্তু ভারতীয় সৈন্যগণকে তাহাদের অনিশ্চিত ভাগ্যের উপর ফেলিয়া রাখা হয়। ইহার ফলে সিঙ্গাপুরের সমস্ত ভারতীয় সৈন্য বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পন করে। এই সকল সৈন্য ও প্রবাসী ভারতীয়গণের বৃটিশ বিরোধী মনোভাব জাপানীদের কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে (১৭ই ফেব্রুয়ারী) জাপানী হেড কোয়ার্টার্সের মেজর ফুজিয়ারা কতিপয় ভারতীয়কে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, বৃটিশ শক্তি নিতান্ত দুর্বল এবং দিন দিন আরও দুর্বল হইয়া পড়িতেছে এবং পড়িবে। সুতরাং বৃটিশ শক্তিকে আঘাত হানিবার ইহাই সুবর্ণ সুযোগ। তিনি পরামর্শ দেন, ভারতীয়গণ যেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য একটি সমিতি গঠন করেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, জাপানের তরফ হইতে সম্ভাব্য সকলপ্রকার সাহায্য দেওয়া হইবে। মেজর

ফুজিয়ারার উদ্দেশ্য ছিল জাপানের তাঁবেদার হিসাবে একটি ভারতীয় সমিতি খাড়া করা। কিন্তু যে ভারতীয়গণ সুদীর্ঘ বৎসর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসনযন্ত্রের তলায় নিষ্পেষিত হইয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা পরাধীনতার জ্বালা মর্মে মর্মে বুঝিয়াছিলেন। তাঁহারা ফুজিয়ারার এই আবেদনে সাড়া দিতে পারেন নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন—ভারতের স্বাধীনতা ভারতের ভিতরে এবং বাহিরে ভারতীয়গণ কর্ত্তৃকই অর্জন করিতে হইবে। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেম, ভারতীয় স্বাধীন বাহিনীরই মুক্তিদাতা বাহিনী হিসাবে ভারত প্রবেশের অধিকার আছে ; কোন বৈদেশিক শক্তির বা বাহিনীর সে অধিকার নাই। এই দূরদৃষ্টি অনুযায়ী তাঁহারা ফুজিয়ারাকে কোনরূপে এড়াইবার জন্য বলেন যে, এ বিষয়ে তাঁহারা আরো গভীরভাবে চিন্তা করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে পুনর্বার তাঁহার (ফুজিয়ারার) সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

ইহার পর ৯ই এবং ১০ই মার্চ ১৯৪২ সালে মালয়ের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সিঙ্গাপুরে একটি সভা করেন। (ইতিমধ্যে শ্রীরাসবিহারী বসু মালয়ে শ্যামের একটি প্রতিনিধি সম্মেলন আহ্বান করেন) সিঙ্গাপুরের সভায় স্থির হয় যে টোকিওতে একটি শুভেচ্ছা দল পাঠান হউক। এই প্রস্তাব জাপানীদের ঘোষিত ইচ্ছার বিরুদ্ধেই করা হইয়াছিল, কারণ তাহারা চাহিয়াছিল একটি 'অফিসিয়্যাল ডেলিগেশন' পাঠাইতে। তাহা হইলে সেই ডেলিগেশন জাপানীদের মুখপাত্র হিসাবেই গণ্য হইত। কিন্তু ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কোনরূপেই জাপানী তাঁবেদার হিসাবে গণ্য হইতে অস্বীকার করেন।

ইহার পর ১৯৪২ সালের ২৮শে,২৯শে এবং ৩০শে মার্চ শ্রীরাসবিহারীর সভাপতিত্বে টোকিওতে একটি সম্মেলন বসে। এই সম্মেলনে উপরিউক্ত শুভেচ্ছা দলের প্রতিনিধিবৃন্দ ছাড়াও হংকং, সাংহাই ও জাপান প্রবাসী ভারতীয় প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত

হয় যে, পূর্বএশিয়া-প্রবাসী ভারতীয়গণের পক্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট সময়; এই স্বাধীনতা হইবে পূর্ণস্বাধীনতা এবং সকল প্রকার বৈদেশিক শাসন ও নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত; ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান এবং ক্রিয়াকলাপের অধিকারী হইতে পারিবে কেবলমাত্র ভারতীয়গণের নেতৃত্বে এবং ভারতীয় স্বার্থে চালিত স্বাধীন-ভারত বাহিনী বা আজাদ হিন্দ ফৌজ। সকল ক্ষমতা আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ পরিচালিত করিবে; আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের একটি কর্মপরিষদ থাকিবে; এই কর্মপরিষদ সামরিক প্রয়োজনে জাপানের নিকট হইতে নৌবল, বিমানবল প্রভৃতি চাহিতে পারেন, ইত্যাদি। এই সম্মেলন আরও একটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব করেন যে, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনা করিবার অধিকার ভারতভূমিতে স্বয়ং ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উপরই বর্তিবে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসই সেই অধিকারের মালিক। এই সম্মেলনে স্থির হয় যে, আরও ব্যাপক ভিত্তিতে ব্যাংককে একটি প্রতিনিধি সম্মেলন আহ্বান করিতে হইবে এবং তথা হইতেই সরাসরিভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘোষণা করা হইবে।

এই প্রস্তাব অনুসারেই ১৯৪২ সালের ১৫ই হইতে ২৩শে জুন পর্য্যন্ত ব্যাংককে একটি প্রতিনিধি সম্মেলন বসে। জাপান, মাঞ্চুকুও, হংকং, বার্মা, বোর্ণিও, জাভা, মালয় ও শ্যাম হইতে ১০০ জন প্রতিনিধি সমবেত হন। ভারতীয় বাহিনী হইতেও প্রতিনিধি আসেন (ইঁহারা যুদ্ধবন্দী)। এই সম্মেলনে আজাদ হিন্দ আন্দোলনের মূল নীতি নির্ধারিত হয়; যথা—

১। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়গণকে লইয়া একটি আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ গঠন করিতে হইবে।

২। আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের আদর্শ, কার্যক্রম ও সকলপ্রকার পরিকল্পনা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ, কার্যক্রম ও উহার পরিকল্পনা অনুযায়ী

অনুসৃত হইবে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব মানিয়া চলিতে হইবে। কংগ্রেসের আন্দোলনের সহিত যোগসূত্র সাধন করিতে হইবে।

৩। পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় বাহিনী হইতে এবং ভারতীয় বে-সামরিক জনসাধারণের মধ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া একটি আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিতে হইবে।

৪। ভারতবর্ষের প্রতি এবং এই নবগঠিত আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের প্রতি জাপানীদের নীতি কি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করার জন্য জাপানী কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী জানাইতে হইবে।

এইরূপে ব্যাংকক সম্মেলন হইতে গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ গঠিত হইল। ইহার সভাপতি হইলেন শ্রীরাসবিহারী বসু। সিঙ্গাপুর উক্ত সঙ্ঘের প্রধান কর্ম্মস্থল হইল। একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠিত হইল এবং পূর্ব এশিয়ার প্রত্যেক দেশে ইহার শাখা সঙ্ঘ স্থাপিত হইল। এই সময় গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট 'ভারত ত্যাগ কর' প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষ দুইটি মন্ত্রে দীক্ষিত হইল—করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গে। ভারতব্যাপী দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। ভারতবর্ষের সমস্ত কংগ্রেস নেতাকে তড়িৎ আক্রমণ হানিয়া বৃটিশ শক্তি কারারুদ্ধ করিল; সহস্র সহস্র কংগ্রেসকর্মী, জনগণ বৃটিশের গুলীতে প্রাণ বিসর্জন দিতে লাগিলেন, বৃটিশ বিমান হইতে বোমা বর্ষণের ফলে গ্রাম, নগর ধ্বংস হইতে লাগিল। এই সকল সংবাদে পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য এবং অদম্য কর্মোৎসাহ চূড়ান্ত সীমায় ঠেলিয়া উঠিল। এই চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতিতে এইবার সর্বপ্রথম ক্যাপ্টেন মোহন সিংয়ের অধিনায়কত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের গঠনকার্য আরম্ভ হইল। মালয়ে যে সকল ভারতীয় সৈন্য আত্মসমর্পন করিয়াছিল, তাহাদের লইয়াই বাহিনী গঠনের প্রাথমিক কর্মসূচী অনুসৃত হইতে

লাগিল। মালয় প্রবাসী ভারতীয়গণের নিকট আবেদন জানাইলে আশাতিরিক্ত সাড়া পাওয়া যাইতে লাগিল।

এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া জাপান ভড়কাইয়া গেল। ভারতীয়গণের এই স্বাধীন প্রচেষ্টা জাপান কিছুতেই প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে নাই। বরঞ্চ সাম্রাজ্যবাদী জাপানের মনেও ভীতি ও আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং জাপানী কর্তৃপক্ষের সহিত আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্মপরিষদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ বাঁধিয়া উঠিল। প্রধানতঃ দুইটি কারণে তিক্ততা চরম হইয়া পড়িল, যেমন—

১। কর্মপরিষদ দাবী জানাইয়াছিলেন, ভারতবর্ষ, পূর্ব এশিয়া এবং আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের প্রতি জাপানের নীতি কি ইহা জাপান অনতিবিলম্বে ঘোষণা করুক। জাপান উত্তরে জানাইয়াছিল, কতকগুলি মামুলী জবাব। যেমন ভারতকে সাহায্য করিতে জাপান প্রস্তুত, ভারতে রাজ্য বা অধিকার বিস্তারের কোন দুরভিসন্ধি জাপানের নাই, ইত্যাদি। কিন্তু কর্মপরিষদ জাপানী গবর্ণমেণ্টের ঐ মামুলী জবাব সন্তোষজনক বলিয়া গণ্য করিতে পারেন নাই।

২। সম্পূর্ণভাবে জাপানিগণ কর্তৃক পরিচালিত ইয়াকুরো কিকান নামক 'লায়াসন' ডিপার্টমেণ্টের অফিসারগণ আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিতে আসিতেন। সুতরাং ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসেই চরম সঙ্কট ঘনাইয়া উঠিল। মালয়ে গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজকে জাপানী সমরকর্তাদের আদেশ অনুসারে বার্মায় স্থানান্তরিত করিতে কর্মপরিষদ অস্বীকার করিল। জাপানীদের অন্যান্য অনেক দাবীও সরাসরি অগ্রাহ্য করা হইল। কর্মপরিষদকে না জানাইয়া জাপানীরা ৮ই ডিসেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্ণেল এন এস গিলকে গ্রেপ্তার করিলে অবস্থা চরমে গিয়া পৌছে। ইহার প্রতিবাদে পরিষদের সভ্যগণ পদত্যাগ করেন, ইহাতে শ্রীরাসবিহারী অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতে পারেন এবং জানান

তিনি অনতিবিলম্বে জাপান যাইবেন এবং প্রধান প্রধান বিষয়ে জাপানীদের স্পষ্ট নীতি কি তাহা টোকিও গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বাহির করিবেন। ইতিমধ্যে সঙ্ঘের কার্য চলিতে থাকিবে। এই সময় মালয়-শাখা প্রস্তাব করেন যে, শ্রীরাসবিহারী বসুকে এতদ্বারা অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তিনি প্রধান প্রধান বিষয়ে টোকিও গবর্ণমেণ্টের মতামত ও নীতি কি তাহা জানিতে সম্ভাব্য চেষ্টা করুন এবং টোকিও গবর্ণমেণ্টও ঘোষণা, বিবৃতি বা অন্য যে কোন প্রকার উপায়ে তাহা যত শীঘ্র সম্ভব জ্ঞাত করুক। ইতিমধ্যে সঙ্ঘের কাজ পূর্বের মতই চলিতে থাকিবে, কিন্তু টোকিও গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা বা বিবৃতির পরই কেবলমাত্র নূতনভাবে অগ্রসর হওয়া যাইবে।

এই যখন অবস্থা তখন ইয়াকুরো কিকান আজাদ হিন্দ সঙ্ঘকে হীনবল করিবার জন্য একটি প্রতিদ্বন্দ্বী দল গঠন করিল। উহার অফিসারগণ আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের বিরুদ্ধে একটি গুপ্ত যুব আন্দোলন সংগঠন করিতে লাগিলেন এবং নিজেরাও তাঁবেদার অনুচর লইয়া আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য এবং মিথ্যা রটনা সুরু করিলেন। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মালয় শাখা কমিটি তিনদিন মিটিং ও আলোচনার পর শ্রীরাসবিহারীর নিকট একটি স্মারকলিপি পাঠাইতে মনস্থ করেন। এই স্মারকলিপি যথাস্থানে পৌছিবার পূর্বেই জাপানীরা গোপনে তাহা হস্তগত করিয়াছিল। তাহারা মালয় শাখার সভাপতি শ্রী এন্ রাঘবনকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করার জন্য শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসুর উপর চাপ দিতে লাগিল। ফলে শ্রীরাঘবন পদত্যাগ করেন। উক্ত শাখার অন্যান্য সভ্যগণ বুঝিলেন যে, পদত্যাগই জাপানীদের কাম্য, কেননা, তাহা হইলে জাপানের তাঁবেদারগণকে লইয়া সঙ্ঘ পুনর্গঠিত করা যাইবে ও আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ সম্পূর্ণভাবে জাপানীদের 'পুত্তলিকা' হইবে। এই সকল বিবেচনা করিয়া, শ্রীরাঘবনের পরে আর কোন সভ্যই পদত্যাগ করিলেন না।

১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে সিঙ্গাপুরে আর একটি প্রতিনিধ সম্মেলন হয়। ইহাতে পূর্ব এশিয়ার সমস্ত দেশের ভারতীয় প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় শ্রীরাসবিহারী বসু জানান যে, শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু আসিতেছেন এবং আন্দোলনের গুরুদায়িত্বভার তাঁহার ন্যায় একজন যোগ্যতম জন-নেতার উপর অর্পিত হইলে তিনি পদত্যাগ করিবেন।

১৯৪৩ সালের ২রা জুলাই শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সিঙ্গাপুরে পৌছেন এবং ৪ঠা জুলাই আহূত এক প্রতিনিধি সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং সকল আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীরাসবিহারী পদত্যাগ করেন। বাঙ্গলা তথা ভারতের জনপ্রিয় একজন কংগ্রেসনেতাকে লাভ করিয়া আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ এবং তদীয় বাহিনী নবপ্রাণসঞ্চারে চঞ্চল হইয়া উঠিল। ৫ই জুলাই সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্যবিবরণী গৃহীত হয় এবং ঐ তারিখে উক্ত বাহিনীর গঠন সংবাদ প্রকাশ্যভাবে জগতে ঘোষণা করা হয়। শ্রীসুভাষ-চন্দ্রের নেতৃত্ব গ্রহণের পর হইতে ঘটনাবলী দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। নারিগণও দলে দলে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের সভ্যা হইতে থাকেন। তাহাদের মধ্য হইতে স্বেচ্ছাসেবিকা বাছাই করিয়া শ্রীমতী লক্ষ্মীর নেতৃত্বে "রাণী অফ্ ঝান্সী রেজিমেণ্ট" গঠিত হইল। অনেক মহিলা রেড ক্রসের সভ্য হইলেন। ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে সিঙ্গাপুরে এবং পরে রেঙ্গুনেও নারী-দিগকে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য দুইটি সামরিক শিক্ষা বিদ্যালয় স্থাপিত হইল।

১৯৪২ সালে আজাদ হিন্দ্ ফৌজে স্বেচ্ছাসৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য আহ্বান জানান হইয়াছিল। অগণিত লোক সৈন্যদলে নাম লিখাইয়াছিল; কিন্তু জাপানীদের অস্পষ্ট নীতির ফলে সৈন্যদের শিক্ষাদান কার্যে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া যায় নাই। এইবার শ্রীসুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে অবস্থা পরিবর্তিত হইল। তিনি স্পষ্ট ভাষায় এই মতামত ব্যক্ত করিলেন যে,

আজাদ হিন্দ্ ফৌজই ভারতবর্ষের প্রতিনিধিমূলক জাতীয় বাহিনী। জাপানীদের সহিত ইহার কোনরূপ সংস্রব থাকিলে ইহা বিভীষণ বাহিনী বলিয়া কুখ্যাত হইবে। ইহার নীতি, কার্যকলাপ, নেতৃত্ব—ভারতীয় দেশ-প্রেমিকগণ কর্তৃকই চালিত হইবে। জাপানীদের ভারত আক্রমণের অধিকার নাই। কোনরূপ বৈদেশিক কর্তৃত্ব অথবা একজনও বৈদেশিক সৈন্যকে ভারতভূমিতে স্বীকার করা চলিবে না। জাপানিগণ যদি বলেন যে, তাঁহারা ভারতকে বৃটিশ শক্তির কবল হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীনতা দান করিতে যাইতেছেন, তথাপি আজাদ হিন্দ্ ফৌজ তাহাদের অন্যায় আক্রমণকারী হিসাবেই গণ্য করিবে। ভারতবর্ষকে যদি বৃটিশের কবল হইতে মুক্ত করিতে হয়, তবে একমাত্র ভারতের নিজস্ব বাহিনীই তাহা করিতে পারে। জাপানীদের সামরিক কৌশল ও নীতির দ্বারা এই ভারতীয় বাহিনী কখনই চালিত হইতে পারিবে না ; জাপানীদের নীতির সহিত ইহার কোনরূপ সংস্রব থাকিল ইহা পঞ্চম বাহিনী বলিয়া ইতিহাসে কলঙ্কভাগী হইবে। এই নীতিগত সুস্পষ্ট ঘোষণার ফলে আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘ এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজ নবশক্তিতে উজ্জীবিত হইল। দেশপ্রেমিক ভারতীয়গণ এই প্রতিষ্ঠান এবং এই বাহিনীকে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিয়া ইহাকে আরও শক্তিশালী করিবার জন্য সকল শক্তি-সামর্থ্য প্রয়োগ করিলেন। মালয়ে একটি সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইল। ইহাতে একই সময়ে ৭০০০ জনকে লইয়া পালাক্রমে সামরিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ৭০০০ হাজার ব্যক্তি লইয়া একটি দল হইত। এইরূপে দলে দলে স্বেচ্ছাসৈন্য শিক্ষিত হইতে লাগিল। ভারতীয় বাহিনী ও নন্-কমিশণ্ড অফিসারগণের মধ্য হইতে উর্ধ্বতন অফিসার বাছাই করিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কেবলমাত্র ভারতীয়গণের নিকট হইতেই অর্থসংগ্রহ করা হইত। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া ভারতীয়গণ অকাতরে দান করিতে লাগিলেন। অর্থভাণ্ডার, সৈন্যবাহিনী নানাপ্রকার জনহিতকর

কার্যকলাপ প্রভৃতি ব্যাপকতা লাভ করায় একটি গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইল।

সুতরাং শ্রীসুভাষচন্দ্র একটি অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠন করিলেন। ইহার নাম হইল স্বাধীন-ভারত-অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট। তাঁহাকেই রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান অধিনায়ক করা হইল। ইহা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুধ্যমান সকল রাষ্ট্র কর্তৃক গবর্ণমেণ্ট হিসাবে স্বীকৃত হইল। ঐ বৎসর ২৩শে অক্টোবর স্বাধীন-ভারত-অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট যথাযথ নিয়ম ও রীতি অনুযায়ী ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিল। আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘ ও স্বাধীন-ভারত-অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্মস্থল ভারতের নিকটবর্তী কোন স্থানে হওয়া আবশ্যক বিবেচনায় ১৯৪৪ সালের ৭ই জানুয়ারী উহার কর্মস্থল বার্মায় স্থানান্তরিত হয়। বার্মায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর হইতে অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের কার্যকলাপ, আরও ব্যাপক হইয়া উঠে। স্বাধীন ভারত অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট যথাযথভাবে মন্ত্রী নিয়োগ করিয়াই বিভিন্ন রাষ্ট্রিক কার্য চালাইতেন, কাহারও খুসীমত বা নীতিশূন্যভাবে কিছুই ঘটিতে পারিত না। এই সকল মন্ত্রী ছিলেন আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। রেঙ্গুণই ছিল অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের রাজধানী এবং প্রধান কর্মস্থল। এখানে ১৯টি বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্ট ছিল। প্রত্যেকটি ডিপার্টমেণ্টেরই রীতিমতভাবে রেকর্ড-বুকস্ নথিপত্র হিসাব প্রভৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণকেই এই সকল কর্মে নিয়োগ করা হইত। উর্ধ্বতন কর্মচারীর নিকট তাঁহাদের জবাবদিহি করিতে হইত। এক কথায় ইহা আইন অনুসারে নির্বাচিত গবর্ণমেণ্টের মতই ছিল। রেঙ্গুন হেডকোয়ার্টার হওয়ায় নানা দিক দিয়া অনেক সুবিধা হইয়াছিল।

এই সঙ্ঘের রিয়ার হেডকোয়ার্টার্স ছিল সিঙ্গাপুরে। এখান হইতেই মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি অঞ্চলের তদারক করা হইত। আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘের কেবলমাত্র মালয়েই ৭০টি শাখা ছিল, মালয়, শুধু তার

সভ্যসংখ্যা দুই লক্ষের উপর, বার্মায় ছিল ১০০টি শাখা, শ্যামে ছিল ২৪টি। ইহা ছাড়া আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও সেলিবিস দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, চীন মাঞ্চুকুয়ো এবং জাপান প্রভৃতি স্থানেও ইহার অসংখ্য শাখা এবং অভাবনীয় প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের জন্য সৈন্য এবং সিভিল সার্ভিসের জন্য অফিসার সংগ্রহ করা হইত। সামরিক শিক্ষাদানের জন্য ৯টি কেন্দ্র ছিল। সিঙ্গাপুর এবং রেঙ্গুনে অফিসার ট্রেণিংয়ের জন্য দুইটি কেন্দ্র ছিল। কোন কেন্দ্রেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন রকমের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় নাই, শিক্ষার্থিগণই পালাক্রমে সে ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। অফিসার এবং এবং এন-সি-ওগণ হিন্দুস্থানী ভাষায় শিক্ষাদান করিতেন। যুদ্ধে আদেশ-দানের রীতিও ছিল হিন্দুস্থানীতে। কেবলমাত্র মালয়েই প্রায় ২০ হাজার বেসামরিক ব্যক্তিগণকে শিক্ষাদান করিয়া আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল, ইহা ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চল হইতে হাজারে হাজারে শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করিতে আসিয়াছিল, ইহাদের অনেককেই আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘের সমগ্র আন্দোলনে কেবলমাত্র ভারতীয়গণের অর্থই ব্যয় করা হইত। পূর্ব-এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের ভারতীয়গণের নিকট হইতেই অর্থ সংগ্রহ করা হইত। বার্মায় ভারতীয় বাসিন্দাগণের নিকট হইতে কিছু-দিনের মধ্যেই ৮ কোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। ১৯৪৫ সালে জানুয়ারী মাসে 'নব বৎসরের' উপহার হিসাবে মালয় ভারতকে ৪০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজ নিজ প্রয়োজনের জন্য যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ নিজ অর্থ দিয়াই ক্রয় করিত। আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘ ছিল প্রধানতঃ একটি রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং ইহাকে সমাজসেবার গুরুদায়িত্বভারও গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। যুদ্ধপীড়িতদের সাহায্যকল্পে ইহার ভাণ্ডার হইতে অজস্র অর্থ ব্যয় করা হইত। মালয়ের

শ্রমিকগণ চরম দুর্দশায় পড়িয়াছিল, সুতরাং উক্ত সঙ্ঘ মজুরদিগের জন্য চিকিৎসালয়, ডাক্তার, ঔষধ, পথ্য, খাদ্য প্রভৃতি ব্যাপারে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছে। কুয়ালা-লামপুরে ছিল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ 'সাহায্য-কেন্দ্র। এখানে প্রত্যহ এক হাজারের উপর নারী, শিশু ও দুর্গতজনকে নানাবিধ সাহায্য দেওয়া হইত। ইহার মাসিক খরচ ছিল ৭৫ হাজার ডলার। সঙ্ঘ বার্মাতে অনেকগুলি দাতব্য চিকিৎসালয় চালাইত। উক্ত সঙ্ঘ শ্যামে একটি আধুনিক ধরণের উচ্চাঙ্গের হাসপাতাল খুলিয়াছিল। তাছাড়া দুর্গত ভারতীয়গণের বসতি স্থাপনের জন্য উক্ত সঙ্ঘ ভূমি সংগঠনের কার্যসূচী গ্রহণ করিয়াছিল। মালয়ের জঙ্গল অপসারিত করিয়া প্রায় ২০০০ একর জমি বাসোপযোগী করা হইয়াছে। ভারতীয়-গণ এখানে ভূমিকর্ষণের ও বাণিজ্যোপযোগী বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বালক-বালিকাদিগকে শিক্ষাদানের জন্যও আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ সচেষ্ট হইয়াছিল। পূর্ব এশিয়াবাসী ভারতীয়গণের জন্য হিন্দুস্থানী শিক্ষা দিবার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। উক্ত সঙ্ঘ চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। কেবলমাত্র বার্মাতে উক্ত সঙ্ঘের নিয়ন্ত্রণাধীনে ৬৫টি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সংবাদপত্র প্রাপ্ত এই সকল তথ্য অতি সামান্য। ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, খাঁটি অনুসন্ধান করিলে আরও বিশদ তথ্য লাভ করা যাইবে। স্বাধীন ভারতের এই অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট, আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের পিছনে শুধু যে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়-গণের সামগ্রিক সমর্থন ছিল তাহা নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশের, এমন কি তথাকথিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিবাসীদের মধ্যেও সমর্থনের অভাব ছিল না।

আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত প্রবেশের অব্যবহিত পূর্বে বার্মার

পরিস্থিতি খুব আশাপ্রদ ছিল না। শ্রীসুভাষচন্দ্রের সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্ব এই যে, তাঁহারই অনমনীয় নীতির ফলে জাপানীরা ভারত আক্রমণের নীতি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ইহা ছাড়া অর্থনীতিক সাহায্যের দিক দিয়া বিচার করিলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভারত অভিযানের ন্যায় এক বৃহৎ দুরূহ অভিযানের ক্ষমতা তাহাদের ছিল না। এদিকে বার্ম্মা পুনর্দখলের যুদ্ধ সুরু করিবার জন্য বৃটিশ শক্তি বদ্ধপরিকর হইয়াছে। হকোয়াং উপত্যকায় ব্রিটীশের আক্রমণ এবং তাহাদের চিন্দুইন নদী অতিক্রমের সম্ভাবনায় জাপানীরা অধীর হইয়া পড়িল। তাহারা তাড়াহুড়া করিয়া একটা পরিকল্পনা করিয়া ফেলিল। ইম্ফল দখল করিবার জন্য অবিলম্বে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন; কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানী বাহিনীর ভারত আক্রমণের অধিকার কিছুতেই স্বীকার করিবে না। সুতরাং সুস্পষ্টভাবে জাপানীদের নীতি ঘোষণা করিতে হইল যে, উহারা কেবলমাত্র ইম্ফল দখল করিতে চায়; অতঃপর ভারত আক্রমণের সমস্ত সামরিক কার্যকলাপ আজাদ হিন্দ ফৌজের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। আজাদ হিন্দ ফৌজ পরিস্থিতি সম্যক বুঝিতে পারিলেন। তথাপি ইম্ফল দখলের যুদ্ধে তাঁহারাই প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন। ১৯৪৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আজাদ হিন্দ ফৌজ আক্রমণাত্মক কার্য সুরু করে। ১৮ই মার্চ্চ শা'নওয়াজের অধীনস্থ বাহিনী পালেল খণ্ডের মধ্য দিয়া ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতভূমিতে পদার্পণ করে ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। এইরূপে ভারতবর্ষের একটি অংশ শত্রুকবলমুক্ত হয়। মেজর জেনারেল চ্যাটার্জ্জী এই অঞ্চলের প্রথম শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন।

এই বাহিনীতে প্রধানতঃ তিনটি ব্রিগেড্ ছিল,—(১) শা'নওয়াজের নেতৃত্বে ৩২০০ সৈন্য লইয়া গঠিত 'সুভাষ ব্রিগেড'।

(২). কিয়ানির নেতৃত্বে 'গান্ধী ব্রিগেড'। ইহার সৈন্যসংখ্যা ছিল ২৮০০।

(৩) মোহন সিংহের নেতৃত্বে 'আজাদ ব্রিগেড'। ইহাতে দুই নং ব্রিগেডের সমান সংখ্যক সৈন্য ছিল।

ইহা ছাড়া তিনশত বাহাদুর দলের ফৌজ ছিল। সাতশত বে-সামরিক সাহায্যকারীও ইহাদের সঙ্গে ছিলেন। কর্ণেল গুরু বক্স সিং ধীলনের নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্য লইয়া গঠিত নেহরু ব্রিগেড ইহাদের পিছনে ছিল। রাণী ঝান্সি ব্রিগেড ও বালসেনাদলও বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে। বালসেনাদল আত্মঘাতী বাহিণীর কাজ করিত। ইহারা পৃষ্ঠে মাইন বাঁধিয়া শত্রুর ট্যাঙ্কের নীচে পড়িয়া থাকিত ও সুযোগমত ট্যাঙ্ক উড়াইয়া দিত এবং নিজেরা মৃত্যুবরণ করিত। তাঁহারা মোরাই, কোহিমা ও অন্যান্য অনেক জনপদ দখল করিয়া ইম্ফলে উপনীত হয় এবং উহা অবরোধ করে। ২৭শে মার্চ্চ হইতে ৮ই মে পর্য্যন্ত ইম্ফল-কোহিমা-টিড্ডিম এলাকায় ও মণিপুর রোডের উপর সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতম যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে আজাদী সৈন্যেরা অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করে। এই যুদ্ধে কোনরূপ বিমান সাহায্য দেওয়া সম্ভব হয় নাই এবং নিদারুণ বর্ষায় সরবরাহ পথ ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তখন এই বাহিনী পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। অতঃপর আজাদ হিন্দ ফৌজ আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। যখন বৃটিশ শক্তি বার্ম্মা আক্রমণ করিল, তখন এই বাহিনীর অনেক 'ষ্টাফ অফিসার' বৃটিশ পক্ষে যোগ দেন, কিন্তু অধিকাংশই আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখিয়া অবিচলিত ছিলেন। বৃটিশের হস্তে 'মিক্তিলার' পতন হইলে যখন পরিষ্কার বোঝা গেল জাপানীরা বৃটিশ অগ্রসরকে ঠেকাইতে পারিবে না, তখন রেঙ্গুন পরিত্যাগের পরিকল্পনা করা হইল।

১৯৪৫ সালের ২৩শে এপ্রিল জাপানী প্রধান সেনাপতি এবং বার্ম্মা গবর্ণমেণ্ট রেঙ্গুন ত্যাগ করিল। তাহাদের সহিত একত্রে রেঙ্গুন ত্যাগ করিতে শ্রীসুভাষচন্দ্রের অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট অস্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা ২৪শে এপ্রিল উক্ত সহর ত্যাগ করিয়া আসেন। কিন্তু ভারতীয়-

গণের ধন প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য মেজর জেনারেল লোকনাথনের অধিনায়কত্বে ছয় হাজার আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্য রাখিয়া এবং সঙ্ঘের সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত জে, এন, ভাদুড়ীর উপর সঙ্ঘের সকল দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া চলিয়া আসা হইয়াছিল। রেঙ্গুন ত্যাগের পূর্ব্বেই স্বাধীন ভারত অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের সকল দেনাপাওনা পরিশোধ করা হইয়াছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজ রেঙ্গুণের সকল কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। জাপানীদের পশ্চাদপসরণ ও বৃটিশ কর্তৃক পুনরধিকারের সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে রেঙ্গুণে একটিও রাহাজানি বা অন্য কোনরূপ অরাজক বিশৃঙ্খল অবস্থা ঘটে নাই। ইহার সহিত তুলনায় ১৯৪২ সালের কথা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। যখন বৃটিশেরা বার্ম্মা ত্যাগ করিয়া আসে, তখন সমগ্র দেশে অভাবনীয় অরাজকতা, লুঠতরাজ, খুনজখম, দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটিয়াই চলিয়াছিল। সেদিনের কথা মনে করিলে আজিও ভারতীয়গণ আতঙ্কে শিহরিয়া ওঠেন।

১৯৪৪ সালের এপ্রিলে আজাদ হিন্দ্ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ১৯৪৫এর মে মাস পর্যন্ত এই ব্যাঙ্ক যাবতীয় কাজকর্ম্ম চালাইতেছিল। ১৯শে মে বৃটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ হঠাৎ উহা অধিকার করিয়া বসে। ফিল্ড সিকিউরিটি সার্ভিসের কর্তৃপক্ষ ২৮শে মে হঠাৎ শ্রীযুক্ত ভাদুড়ীকে গ্রেপ্তার করে এবং তখন হইতে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের কার্যকলাপ বন্ধ হইয়া যায়। তখন হইতেই আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের কর্মিগণ ও তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে দলে দলে গ্রেপ্তার করা হইতে থাকে।

পরিশিষ্ট—(গ)

আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের ঘোষণা

(শোনান, ২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩ সাল)

১৭৫৭ সালে বাঙ্গালা দেশে বৃটিশের হাতে প্রথম পরাজয়ের পর ভারতীয় জনগণ একশত বৎসর ধরিয়া অবিশ্রান্তভাবে প্রচণ্ড সংগ্রাম করিয়াছে। এই সময়কার ইতিহাস অতুলনীয় বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের বহু দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সিরাজদ্দৌলা, বাঙ্গলার মোহনলাল, হায়দর-আলী, টিপু সুলতান দক্ষিণ ভারতের ভেলুতাম্পি, আপ্পা সাহেব ভোঁস্‌লা, মহারাষ্ট্রের পেশোয়া বাজীরাও, অযোধ্যার বেগম, পাঞ্জাবের সর্দ্দার শ্যাম সিংহ আতিরিওয়ালা, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া টোপি, দুমরাওনের মহারাজ কুনোয়ার সিং, নানা সাহেব আরও বহু বীরের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের পিতৃপুরুষগণ প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই যে, বৃটিশ সমগ্র ভারত গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। কাজেই তাঁহারা সম্মিলিতভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন্ নাই। পরিশেষে যখন ভারতীয় জনগণ অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতে পারিল তখন তাহারা সম্মিলিত হইল। ১৮৫৭ সালে বাহাদুর সাহের অধিনায়কত্বে তাহারা স্বাধীন জাতি হিসাবে শেষ সংগ্রাম করিল। যুদ্ধের প্রথমভাগে কয়েকটি জয়লাভ সত্ত্বেও দূর্ভাগ্য এবং ভ্রান্ত নেতৃত্ব ধীরে ধীরে তাহাদের চরম পরাজয় ও পরাধীনতা আনিয়া দিল। তথাপি ঝাঁসির রাণী, তাঁতিয়া টোপি, কুনোয়ার সিং এবং নানা সাহেব জাতির গগনে চিরন্তন নক্ষত্রের ন্যায় জ্যোতিষ্মান থাকিয়া আমাদিগকে আরও আত্মত্যাগ এবং সাহসিকতার প্রেরণা দিবে।

১৮৫৭ সালের পর বৃটিশরা সবলে ভারতীয়দের নিরস্ত্র করিয়া দেয় এবং আতঙ্ক ও পাশবিকতার রাজত্ব সৃষ্টি করে। ইহার পর কিছুদিন ভারতবাসী হতমান এবং হতবাক হইয়াছিল। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের

জন্মের পর ভারতের নব জাগরণ হইল। ১৮৮৫ সাল হইতে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত ভারতীয় জনগণ তাহাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলন, প্রচারকার্য্য, বৃটিশ দ্রব্য বর্জ্জন, সন্ত্রাসবাদ, ধ্বংসাত্মক আন্দোলন প্রভৃতি সর্ব্ব উপায় এবং অবশেষে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু সবই সাময়িকভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অবশেষে ১৯২০ সালে ব্যর্থতার গ্লানিতে আচ্ছন্ন হইয়া ভারতবাসী যখন নূতন পন্থার সন্ধান করিতেছিল, তখন মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলনের নূতন অস্ত্র লইয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন।

ইহার পর ২০ বৎসরকাল ভারতীয়গণ নানা প্রকার দেশপ্রেমমূলক কার্য করে। মুক্তির বার্ত্তা ভারতের ঘরে ঘরে গিয়া পৌঁছায়। ভারতবাসী স্বাধীনতার জন্য নির্যাতন বরণ করিতে শিখিল, আত্মত্যাগ করিতে শিখিল এবং মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে শিখিল। কেন্দ্র হইতে সুদূরবর্ত্তী গ্রাম পর্যন্ত জনগণ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে সমবেত হইল। এইভাবে ভারত শুধু রাজনৈতিক চেতনাই লাভ করিল না, তাহারা আবার একটি অখণ্ড রাজনৈতিক সত্তায় পরিণত হইল। ইহার পর তাহারা একস্বরে কথা বলিতে পারিল এবং এক সাধারণ লক্ষ্যের জন্য এক মনে একপ্রাণে সংগ্রাম করিতে পারিল। ১৯৩৭ হইতে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত আটটি প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রিমণ্ডলের কাজের দ্বারা ভারতীয় জনগণ প্রমাণ দিল যে, তাহারা প্রস্তুত, তাহাদের নিজেদের শাসন-ব্যবস্থা নিজেদের করিবার ক্ষমতা তাহারা অর্জ্জন করিয়াছে।

এইভাবে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতের মুক্তির শেষ সংগ্রামের ভূমি প্রস্তুত হইল। এই যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণী তাহার মিত্রদের সহায়তায় ইউরোপে আমাদের শত্রুদের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। এদিকে জাপান তাহার মিত্রদের সহায়তায় পূর্ব্ব এশিয়ায় আমাদের শত্রুর উপর

প্রবল আঘাত করে। বিভিন্ন অবস্থার সমন্বয়ে ভারতীয় জনগণ তাঁহাদের জাতীয় মুক্তি অর্জ্জনের অভূতপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়াছে।

বিদেশে ভারতীয়গণ রাজনৈতিক চেতনালাভ করিয়াছে এবং একটি প্রতিষ্ঠানে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। ভারতের ইতিহাসে ইহা নূতন ঘটনা; তাহারা শুধু স্বদেশে তাহাদের দেশবাসীর সহিত সমানভাবে চিন্তা করিতেছে না, স্বাধীনতার পথ ধরিয়া তাহারা তাহাদের সহিত একতালে চলিতেছে। পূর্ব্ব এশিয়ায় আজ ২০ লক্ষাধিক ভারতীয় এক সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে সংগঠিত হইয়াছে। তাহারা 'পূর্ণ সমরায়োজন' ধ্বনিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছে। তাহাদের সম্মুখে রহিয়াছে ভারতের আজাদী ফৌজ, তাঁহাদের মুখে এক কথা 'দিল্লী চলো'।

ভণ্ডামির দ্বারা ভারতীয়দের হতাশাচ্ছন্ন করিয়া দিয়া, লুটতরাজ করিয়া তাহাদিগকে অনাহার ও মৃত্যুর পথে ঠেলিয়া দিয়া ব্রিটিশ শাসকগণ ভারতীয়দের শুভেচ্ছা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদের অবস্থা বিশেষ সঙ্কটজনক। সেই অস্বস্তিকর শাসনের শেষ চিহ্নটির মূলোৎপাটন করিবার জন্য একটিমাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গের প্রয়োজন হইবে। সেই স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করিবার ভার আজাদী ফৌজের উপর। স্বদেশে অসামরিক জনগণেরও ব্রিটিশ সরকার গঠিত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বহু লোকের সমর্থনে ও আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া ভারতীয় আজাদী ফৌজ তাহাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা সাফল্যের সহিত অভিনয় করিবে বলিয়া বিশ্বাস করে।

পূর্ব্ব এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ এক্ষণে আজাদ হিন্দের অস্থায়ী গবর্ণমেন্ট গঠন করিয়াছেন। এখন আমরা আমাদের পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞান লইয়া কর্ত্তব্যে অবতীর্ণ হইতেছি। ভগবানের নিকট আমাদের প্রার্থনা, তিনি আমাদের কার্য এবং মাতৃভূমির মুক্তির জন্য আমাদের সংগ্রাম তাঁহার আশীর্ব্বাদমণ্ডিত করুন। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য, মঙ্গলের জন্য

এবং বিশ্বের দরবারে তাঁহাকে উন্নীত করিবার জন্য আমরা আমাদের এবং সঙ্গী ও সহকর্মীদের জীবন পণ করিতেছি।

অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ত্তব্য হইল ভারতভূমি হইতে ব্রিটিশ ও তাহার মিত্রদের বিতাড়িত করিবার জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করা। ইহার পর অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, জনগণের ইচ্ছা অনুসারে এবং তাহাদের বিশ্বাসভাজন স্থায়ী জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা। ব্রিটিশ এবং তাহার মিত্রবর্গ বিতাড়িত হইবার পর যতদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত না হইবে ততদিন অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট জনগণের পরিপূর্ণ বিশ্বাসভাজন হইয়া দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করিবে।

অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক ভারতীয়ের আনুগত্য দাবী করে এবং আনুগত্য লাভ করিবার সম্পূর্ণ যোগ্য। এই গভর্ণমেণ্ট ধর্মগত স্বাধীনতা এবং সমস্ত অধিবাসীর জন্য সমান অধিকার ও সমান সুযোগ সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিতেছে। এই গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিতেছে যে, দেশের সমস্ত সন্তানকে সমানভাবে পোষণ করিয়া এবং বিদেশী গবর্ণমেণ্ট সৃষ্ট সর্বপ্রকার বিভেদ অতিক্রম করিয়া ইহা সমগ্র দেশের এবং সমস্ত অংশের সুখসমৃদ্ধি বিধানের পথে চলিতে দৃঢ়সঙ্কল্প।

ভগবানের নামে, অতীতে যাঁহারা ভারতীয় জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া গেছেন তাঁহাদের নামে, এবং পরলোকগত যে সকল শহীদ বীরত্ব ও আত্মত্যাগের দ্বারা আমাদের সম্মুখে মহান্ আদর্শ স্থাপন করিয়া গেছেন তাহাদের নামে আমরা ভারতীয় জনগণকে আমাদের গর্বোন্নত পতাকাতলে সমবেত হইতে এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য অস্ত্র ধারণ করিতে আহ্বান জানাইতেছি। ব্রিটীশ এবং তাহার সমস্ত মিত্রদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম আরম্ভ করিবার জন্য আমরা তাহাদের আহ্বান করিতেছি। যতদিন পর্য্যন্ত না শত্রু ভারতভূমি হইতে চিরতরে বহিষ্কৃত হয় এবং যতদিন না ভারতবাসী আবার স্বাধীন হয় ততদিন পর্য্যন্ত এই সংগ্রাম অনমনীয় সাহস, অবিচলিত অধ্যবসায় ও পরিপূর্ণ জয়লাভের প্রত্যয় নিয়া চলিতে থাকিবে।

আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু—রাষ্ট্রাধিনায়ক, প্রধান মন্ত্রী, পররাষ্ট্র ও যুদ্ধ মন্ত্রী।

২। ক্যাপ্টেন্ মিস্ লক্ষ্মী—নারী সংগঠন।

৩। মিঃ এস্ এ আয়েঙ্গার—প্রচার।

৪। লেঃ কঃ এ সি চ্যাটার্জ্জি—অর্থ।

৫। লেঃ কঃ আজিজ্ আমেদ, ৬। লেঃ কঃ এন্ এস্ ভগৎ, ৭। লেঃ কঃ জে কে ভোঁস্লে, ৮। লেঃ কঃ গুলজারা সিং, ৯। লেঃ কঃ এম্ জেড্ কিয়ানী, ১০। লেঃ কঃ এ পি লোকনাথন, ১১। লেঃ কঃ ঈশান কাদির, ১২। লেঃ কঃ শা'নওয়াজ—সেনা বাহিনীর প্রতিনিধি,

১৩। মিঃ এ এম সহায়—সম্পাদক (মন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন),

১৪। শ্রীযুক্ত রাস বিহারী বসু—সর্ব্বোচ্চ পরামর্শদাতা,

১৫। মঃ করিম গণি, ১৬। শ্রীদেবেনাথ দাস, ১৭। মঃ ডি এম্ খান ১৮। মিঃ এ ইয়েলাপ্পা, ১৯। মিঃ আই থিবি, ২০। সর্দ্দার ঈশ্বর সিং—(পরামর্শদাতা),

২১। মিঃ এ এন্ সরকার—আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা।

পরিশিষ্ট—(ঘ)

মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিলাম কেন?

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

[১৯৪৩ সালের ৯ই জুলাই সিঙ্গাপুরে এক জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতা]

আপনারা জানেন, ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিবার পর হইতে আমি স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে কাজ করিতেছি। গত দুই দশকে যে কয়েকবার আইন অমান্য আন্দোলন হইয়াছে, আমি সেই সকল আন্দোলনে ছিলাম। এছাড়া অহিংস হউক বা সহিংস হউক গোপনীয় বিপ্লবী আন্দোলনের সহিত আমার সম্পর্ক আছে এই সন্দেহে আমাকে বার বার বিনা বিচারেও আটক রাখা হইয়াছিল। আমি অতিশয়োক্তি না

করিয়া বলিতে পারি যে, ভারতের কোন জাতীয় নেতা আমার মত এত বহুমুখী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারেন নাই।

এই অভিজ্ঞতা হইতেই আমি বুঝিতেছি যে ভারতে আমরা যে চেষ্টাই করি না কেন ব্রিটিশকে আমাদের দেশ হইতে তাড়ানো শক্তই হইবে। যদি দেশের সংগ্রমের দ্বারা আমাদের জাতির স্বাধীনতা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে করিতাম, তবে এই সঙ্কটময় দুর্গমপথে কথনই আমি পাড়ি দিতাম না। বাহির হইতে স্বদেশের সংগ্রামকে আরও শক্তিশালী করাই আমার স্বদেশ ত্যাগের উদ্দেশ্য। বাহিরের এই সাহায্য ছাড়া ভারতকে স্বাধীন করা অসম্ভব। স্বদেশে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সাহায্য করা প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী এবং সামান্য সাহায্য হইলেই চলিবে। এক্সিস শক্তি কর্ত্তৃক ব্রিটিশের পরাজয়ে ব্রিটিশ শক্তি ও মর্য্যাদা তীব্র আঘাত পাইয়াছে বলিয়া আমাদের কাজ কিছুটা সহজ হইয়া গিয়াছে।

দেশে আমাদের স্বদেশবাসী নৈতিক ও যুদ্ধোপকরণের দ্বারাই সাহায্য চাহেন। প্রথমত তাহাদের জয় সুনিশ্চিত—এই নৈতিক বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে হইবে। নৈতিক বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে হইলে যুদ্ধের পরিস্থিতি বুঝিতে হইবে এবং তাহা হইতেই যুদ্ধের ফলাফল জানা যাইবে। দ্বিতীয় কাজ করিতে হইলে ভারতের বাহিরের ভারতীয়রা তাহাদের স্বদেশবাসী-দিগকে কিভাবে সাহায্য করিতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শত্রুদের কাছ হইতেও কি সাহায্য লাভ সম্ভব, তাহা জানিতে হইবে। সমগ্র বিশ্বে আমার স্বদেশবাসীরা যে যেথানে রহিয়াছেন, তাহারা তাহাদের স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণের জন্য আকুল হইয়াছেন ইহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। এক্সিস শক্তিরাও ভারত স্বাধীনতা লাভ করুক ইহা চাহে এবং যদি ভারতীয় জনগণ আবশ্যক বোধ করে, তবে তাহারা তাহাদের শক্তি অনুযায়ী সাহায্য করিতেও প্রস্তুত আছে, ইহা বুঝিয়াও আমি আনন্দিত হইয়াছি।

বিদেশে ভারতীয় এমন কোন নরনারী নাই যিনি ভারতের স্বাধীনতা চাহেন না এবং জাতির সংগ্রামে সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন—তাঁহাদের এই মনোভাব আমি বুঝিয়াছি।

আমাকে বিশ্বাস করিতে বলি। আমার দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে আমি কিছু করিতে পারি—একথা আমার শত্রুরাও বলিবে না। যদি ব্রিটিশ সরকার আমার নৈতিক শক্তি নষ্ট করিতে না পারিয়া থাকে অথবা আমাকে প্রতারিত বা প্রলুব্ধ না করিতে সমর্থ হয়, তবে পৃথিবীর কোন শক্তি আমাকে প্রতারিত করিতে পারিবে না। সুতরাং আমাকে বিশ্বাস করুন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপনাদের সংগ্রামে যদি বাহিরের সাহায্য আপনারা চাহেন, তবে এক্সিস শক্তির সাহায্য আপনারা পাইবেন! আপনারা সাহায্য চাহেন কিম্বা চাহেন না—আপনারাই তাহা স্থির করিবেন। বলা বাহুল্য যে, যদি বাহিরের সাহায্য ব্যতীতই আপনাদের চলে তবে তাহা ভারতের পক্ষে সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা। আমি একথাও বলিতেছি, প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ সরকার যদি পৃথিবীর সর্ব্বত্র এমন কি দাসত্বশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত দরিদ্র নিপীড়িত ভারতের জনগণের নিকটও ভিক্ষার ঝুলি লইয়া বাহির হইতে পারে, তবে বাহিরের নিকট হইতে সাহায্য লইতে যদি আমরা বাধ্য হই, তবে তাহা অন্যায় হইবে না!

কিভাবে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করিতে চাই বর্ত্তমানে তাহা আমাদের শত্রুসহ সমগ্র পৃথিবীর কাছে প্রকাশ্যে বলিবার সময় হইয়াছে। ভারতের বাহিরে ভারতীয়গণ—বিশেষভাবে পূর্ব্ব এশিয়ার ভারতীয়েরা ভারতে ব্রিটিশসৈন্য বাহিনীকে আক্রমণ করিবার জন্য এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করিতেছে। যখন আমরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিব, তখন আমাদের দেশে জনগণের মধ্যেই শুধু বিপ্লব হইবে না তখন ব্রিটিশ পতাকাতলে সমবেত ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর মধ্যেও বিপ্লবের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। যখন ব্রিটীশ সরকার

এইভাবে দুইদিক অর্থাৎ ভিতর ও বাহির হইতে আক্রান্ত হইবে, তখন উহা ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং ভারতের জনগণ পুনরায় তাহাদের স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবে। ভারত সম্পর্কে এক্সিস শক্তির মনোভাব লইয়া মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি বিদেশে ভারতীয়গণ এবং দেশে জনগণ তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করে, তবে ব্রিটিশকে ভারত হইতে তাড়াইয়া দেওয়া ভারতীয় জনগণের পক্ষে সম্ভব হইবে এবং তাহাদের ৩৮ কোটী ৮০ লক্ষ স্বদেশবাসীকে মুক্ত করা সম্ভব হইবে।

এক জাতীয় জীব আছে, যাহারা বলিবে ৩৮ কোটী ৮০ লক্ষ লোক যদি ব্রিটীশ শক্তিকে ভারত হইতে তাড়াইতে না পারে তবে বিদেশস্থ ত্রিশ লক্ষ ভারতীয় কি ভাবে তাহাদিগকে তাড়াইতে পারিবে? বন্ধুগণ, আয়ার্ল্যাণ্ডের ইতিহাস দেখুন। যদি ত্রিশলক্ষ আইরিস ব্রিটীশের শৃঙ্খলে সামরিক আইনের আওতায় পাঁচ সহস্র সিনফিন স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্যে ১৯২১ সালে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে নতজানু হইতে বাধ্য করিতে পারে, তবে স্বদেশে শক্তিশালী আন্দোলনে সচেতন জাতির সদিচ্ছায় পুষ্ট ত্রিশ লক্ষ ভারতীয় কেন ভারত হইতে বৃটিশকে তাড়াইতে পারিবে না?

বিদেশস্থ ভারতীয়েরা বিশেষভাবে পূর্ব্ব এশিয়ার ভারত সন্তানরা প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠন করা আমার অভিপ্রায়। এই গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় জনগণের শক্তির সমাবেশ করিবেন এবং ভারতের ব্রিটীশ সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিবেন। যখন যুদ্ধে আমরা জয়ী হইব ও ভারত স্বাধীন হইবে—এই অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট তখন স্বাধীন ভারতের স্থায়ী গবর্ণমেণ্টের অনুকূলে সরিয়া দাঁড়াইবে। স্থায়ী গবর্ণমেণ্ট ভারতের জনগণের অভিপ্রায় অনুযায়ীই গঠিত হইবে।

বন্ধুগণ! পূর্ব্ব এশিয়ায় ত্রিশ লক্ষ ভারতীয়ের অর্থ ও জনশক্তি দিয়া

তাহাদের সমুদয় শক্তির সমাবেশ করিবার সময় আসিয়াছে। ভাসা ভাসা ব্যবস্থার দ্বারা কিছুই হইবেনা ; আমি সমুদয় শক্তিরই সমাবেশ চাই। ইহার কমে চলিবে না, কারণ আমাদের শত্রুরাও বলিতেছে যে, ইহা সামগ্রিক যুদ্ধ।

আপনারা আপনাদের সম্মুখে ভারতীয় মুক্তিসেনা—আজাদ হিন্দ ফৌজ বা ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর একটা অংশকে দেখিতেছেন।

সেদিন টাউনহলে এই সৈনিকেরা অনুষ্ঠানিকভাবে কুচকাওয়াজ করিয়াছে। তারপর তাহারা এই সঙ্কল্প করে যে পুরাতন দিল্লীর লাল কেল্লার সামনে বিজয়োৎসবের কুচকাওয়াজ না করা পর্য্যন্ত তাহারা বিশ্রাম গ্রহণ করিবে না। 'দিল্লী চলো' 'দিল্লী চলো'—এই ধ্বনি তাহারা গ্রহণ করিয়াছে। বন্ধুগণ! পূর্ব্ব এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ ভারতীয়ের ধ্বনি হইবে —সামগ্রিক যুদ্ধের জন্য সামগ্রিক সমাবেশ।

এই সামগ্রিক সমাবেশে আমি তিনলক্ষ সৈন্য ও তিন কোটী ডলার চাই। আমি মরণজয়ী বাহিনী গঠনের জন্য সাহসী ভারতীয় নারীদের একটী দল গঠন করিতে চাই। ১৮৫৭ সালে প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে বীর ঝান্সীর রাণী যে প্রকার সংগ্রাম করিয়াছেন এই নারী বাহিনীও সেই প্রকার সংগ্রাম করিবেন।

বন্ধুগণ! আমরা বহুদিন ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের কথা শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু দেশে আমাদের স্বদেশবাসীরা অত্যন্ত বিপদাপন্ন এবং তাহারা দ্বিতীয় রণাঙ্গণের দাবী করিতেছে। পূর্ব্বে ভারতে সামগ্রিক সমাবেশের ব্যবস্থা করুন, আমি দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রতিশ্রুতি দিতেছি—ইহাই ভারতীয় সংগ্রামের প্রকৃত দ্বিতীয় রণাঙ্গন।

পরিশিষ্ট—(ঙ)

মহাত্মা গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বেতার বক্তৃতা

(৯ই জুলাই, ১৯৪৪)

মহাত্মাজি !

ব্রিটীশ কারাগারে শ্রীমতী কস্তুরবার শোচনীয় মৃত্যুর পর আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে দেশবাসীর উদ্বেগ হওয়া স্বাভাবিক।......প্রবাসী ভারতবাসীর পক্ষে মতের পার্থক্য সামান্য ঘরোয়া বিবাদ ছাড়া কিছুই নয়। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে লাহোর কংগ্রেসে আপনি স্বাধীনতার প্রস্তাব আনিবার পর হইতে সমস্ত কংগ্রেসসেবীর সম্মুখে কেবল একটী মাত্র লক্ষ্য—পূর্ণ স্বাধীনতা। প্রবাসী ভারতবাসীরা আপনাকেই ভারতের মহাজাগরণের স্রষ্টা বলিয়া জানে। প্রবাসী ভারতবাসী এবং ভারতের স্বাধীনতার বিদেশী সমর্থকদের দৃষ্টিতে সেইদিন আপনার মর্য্যাদা শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, যেইদিন ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে আপনি অসমসাহসের সহিত "ভারত ত্যাগ কর" প্রস্তাব আনয়ন করেন।

ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট ও ব্রিটীশ জনগণের মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ করা আমাদের পক্ষে মারাত্মক ভুল হইবে। অবশ্য একথা সত্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় বৃটেনেও আদর্শবাদী একদল লোক আছে যাহারা ভারতকে স্বাধীন দেখিতে চায়। ইহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট ও ব্রিটীশ জনসাধারণের মনোভাব আসলে এক এবং অভিন্ন। যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ পরিচালনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও বলিতে পারি, ওয়াশিংটনের বর্ত্তমান শাসকগোষ্ঠী এখন সমগ্র পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতেছেন। এই শাসকগোষ্ঠী এবং তাঁহাদের প্রচারকগণ এক্ষণে 'আমেরিকান শতাব্দী' (American Cantury)র কথা খোলাখুলি ভাবেই বলিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে এমন চরমপন্থীও আছে যাহারা বৃটেনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৯তম রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করিতেছে।

মহাত্মাজি, আপনাকে আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে, এই বাধাবিঘ্ন-পরিকীর্ণ পথে যাত্রা করিবার পূর্বে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহার দোষগুণ, ফলাফল সমস্ত বিচার করিয়া দেখিয়াছি। এতদিন যথাশক্তি দেশবাসীর সেবা করিয়া অবশেষে দেশদ্রোহী সাজিবার বা কেহ আমাকে দেশদ্রোহী বলিতে পারে এইরূপ সুযোগ দিবার বাসনা আমার আদৌ ছিল না। দেশবাসীর ভালবাসা ও উদারতা আমাকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়াছে—এই সম্মান ও মর্য্যাদা যে কোন দেশকর্মীর পক্ষেই অতীব শ্লাঘার বস্তু। উপরন্তু, দেশে আমি এমন একটি দল গঠন করিয়াছি যাহাতে আমি বহু আদর্শনিষ্ঠ ও কর্মকুশল দেশসেবীর অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভ করিয়াছি—যাহারা আমাকে একান্তরূপে বিশ্বাস করিতেন। এই দুর্গম লক্ষ্যপথে যাত্রা করিয়া আমি কেবল নিজের জীবন ও ভবিষ্যৎই বিপন্ন করি নাই আমার পার্টির ভবিষ্যৎও অন্ধকার করিয়াছি। যদি আমার বিন্দুমাত্র আশা থাকিত যে বাহিরের সাহায্য ব্যতিরেকেই ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন করা সম্ভব তাহা হইলে এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে আমি কথনই দেশত্যাগী হইতাম না। যদি এমন আশা থাকিত যে আমাদের জীবৎকালেই বর্ত্তমান যুদ্ধের ন্যায় ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের পক্ষে আর একটি সুযোগ মিলিবে তাহা হইলেও আমি এ সময়ে ভারত ত্যাগ করিতাম না।

চক্রশক্তির সম্বন্ধে আমাকে একটি প্রশ্নের জবাব দিতে হইবে। ইহা কি সম্ভব যে আমি জাপানীদের দ্বারা প্রতারিত হইয়াছি? আমার বিশ্বাস সকলেই স্বীকার করিবেন যে পৃথিবীতে ব্রিটীশ রাজনীতিকগণই (politicians) সর্বাপেক্ষা ধূর্ত্ত ও চতুর। যে ব্যক্তি আজীবন ব্রিটিশ রাজনীতিকদের সংস্পর্শে আসিয়াছে ও তাহাদের সহিত নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাইয়াছে, অন্য কোন দেশের রাজনীতিকদের দ্বারাই সে প্রতারিত হইতে পারে না। ব্রিটীশ রাজনীতিকেরাই যখন আমাকে প্রলুব্ধ করিতে

বা বাধ্য করিতে পারে নাই তখন অপর কোন রাজনীতিকই তাহা পারিবে না। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট দীর্ঘ কারাদণ্ড, নির্য্যাতন ও নিপীড়নের দ্বারাও যখন আমাকে ভগ্নোদ্যম ও দুর্ব্বল করিতে সক্ষম হয় নাই তখন আর কোন শক্তিই তাহা করিতে সমর্থ হইবে না।......স্বদেশের স্বার্থ, মর্য্যাদা ও সম্মান কথঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এমন কোন কাজ আমি কোনদিন করি নাই।

এক সময় ছিল যখন জাপান আমাদের শত্রু ব্রিটিশের সহিত মিত্রতাবদ্ধ ছিল। যতদিন ইঙ্গ-জাপানী চুক্তি বলবৎ ছিল ততদিন আমি জাপানে আসি নাই। এই দুই দেশের মধ্যে যতদিন কূটনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল ততদিন আমি জাপানে আসি নাই। যখন জাপান বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা-রূপ তাহার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল কেবল তখনই আমি স্বেচ্ছায় জাপান পরিদর্শনে আসা স্থির করি; আমার দেশের অনেকের মতই ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে আমার সহানুভূতিও ছিল চুংকিংএর প্রতি। আপনার হয়ত স্মরণ থাকিতে পারে যে, কংগ্রেস সভাপতিরূপে ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে আমিই চুংকিংএ একটি মেডিক্যাল মিশন প্রেরণ করিয়াছিলাম।

মহাত্মাজি! আপনি ভালভাবেই জানেন যে ভারতবাসী মুখের কথায় কতদূর অবিশ্বাসী। জাপানের প্রতিশ্রুতি যদি কেবল অন্তঃসারশূন্য মুখের কথামাত্রই হইত তাহা হইলে আমি কখনই তাহার দ্বারা প্রভাবিত হইতাম না।

মহাত্মাজি, আমরা যে অস্থায়ী সরকার গঠন করিয়াছি তাহার সম্বন্ধে আপনাকে কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। অস্থায়ী সরকারের একটিমাত্র লক্ষ্য—তাহা হইতেছে সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা ভারতবর্ষকে ব্রিটিশের শৃঙ্খলমুক্ত করা। আমাদের শত্রুগণ বিতাড়িত হইলে ও দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিলেই অস্থায়ী সরকারের প্রয়োজন নিঃশেষিত

হইবে। আমাদের প্রচেষ্টা, দুঃখ-বরণ ও স্বার্থ-ত্যাগের পরিবর্ত্তে আমরা একটিমাত্র পুরস্কার চাই—মাতৃভূমির মুক্তি। আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা ভারত স্বাধীন হইলেই প্রত্যক্ষ রাজনীতির সহিত সকল সংশ্রব ত্যাগ করিবেন।

যদি দেশবাসী নিজেদের চেষ্টায় স্বাধীন হইতে পারিত বা কোন কারণে ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট আপনার "ভারত ত্যাগ কর" প্রস্তাব মানিয়া লইয়া সত্যসত্যই ভারত পরিত্যাগ করিয়া যাইত তাহা হইলে কেহই আমাদের চেয়ে বেশী আনন্দিত হইত না। কিন্তু আমরা এই স্থির বিশ্বাসেই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি যে উহার কোনটিই সম্ভব হইবে না এবং সশস্ত্র সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী।

ভারতের স্বাধীনতার শেষযুদ্ধ সুরু হইয়াছে। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যদল ভারতভূমির উপর অসামান্য বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করিতেছে এবং বহু বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ধীরে অথচ অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। এই সশস্ত্র সংগ্রাম চলিতে থাকিবে যতদিন না শেষ ব্রিটীশটি ভারত হইতে বিতাড়িত হয় এবং ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা নয়া দিল্লীর বড়লাট প্রাসাদের শীর্ষে গর্বভরে উড়িতে থাকে।

হে জাতির জনক! ভারতবর্ষের স্বাধীনতার এই পবিত্র যুদ্ধে আমরা আপনার আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

সমাপ্ত